सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক

ভারতের ইতিহাস

ভাগ - ৩

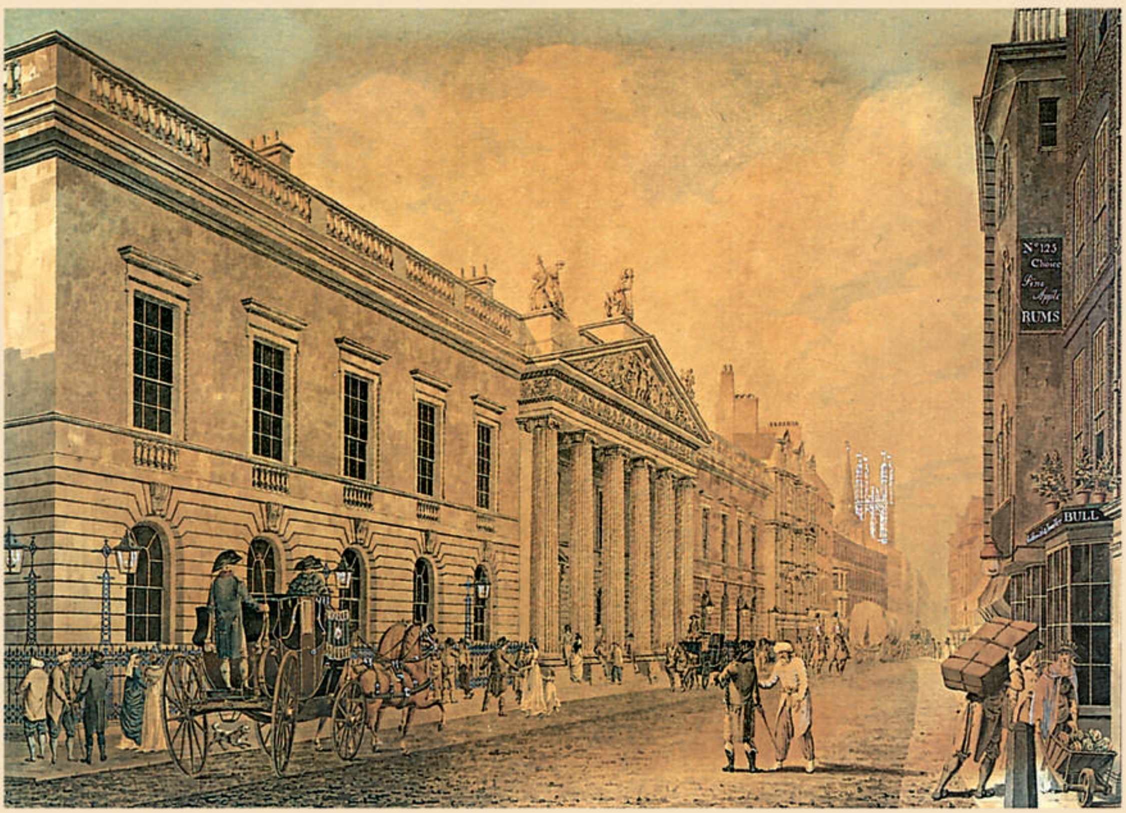

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ভারতের ইতিহাস
ভাগ-৩
দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
(এন সি ই আর টি-র Themes in Indian History (Part III) পাঠ্যবইয়ের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রকাশক : অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ১৩০ টাকা

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
পরিতোষ মজুমদার
উত্তম দেবনাথ
প্রিয়াংকা দেবনাথ

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন :

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী, শিক্ষক

শ্রী শিবু চন্দ্র দাস, শিক্ষক

শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী, শিক্ষক

শ্রীমতি বিপাশা ব্যানার্জী, শিক্ষিকাক

শ্রীমতি সুজাতা পাল, শিক্ষিকা

শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রী অম্লান দেব, শিক্ষক

শ্রী দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শিক্ষক

ভাষা-পরিমার্জনায়

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল

শ্রীমতী এমেলী নাগ

FOREWORD

The *National Curriculum Framework* (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the *National Policy on Education* (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, and the Chief Advisor for this book,

Professor Neeladri Bhattacharya, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

DEFINING THE FOCUS OF STUDY

What defines the focus of this book? What does it seek to do? How is it linked to what has been studied in earlier classes?

In Classes VI to VIII we looked at Indian history from early beginnings to modern times, with a focus on one chronological period in each year. Then in the books for Classes IX and X, the frame of reference changed. We looked at a shorter period of time, focusing specifically on a close study of the contemporary world. We moved beyond territorial boundaries, beyond the limits of nation states, to see how different people in different places have played their part in the making of the modern world. The history of India became connected to a wider inter-linked history. Subsequently in Class XI we studied *Themes in World History*, expanding our chronological focus, looking at the vast span of years from the beginning of human life to the present, but selecting only a set of themes for serious exploration. This year we will study *Themes in Indian History*.

The book begins with Harappa and ends with the framing of the Indian Constitution. What it offers is not a general survey of five millennia, but a close study of select themes. The history books in earlier years have already acquainted you with Indian history. It is time we explored some themes in greater detail.

In choosing the themes we have tried to ensure that we learn about developments in different spheres – economic, cultural, social, political, and religious – even as we attempt to break the boundaries between them. Some themes in the book will introduce you to the politics of the times and the nature of authority and power; others explore the way societies are organised, and the way they function and change; still others tell us about religious life and ritual practices, about the working of economies, and the changes within rural and urban societies.

Each of these themes will also allow you to have a closer look at the historians' craft. To retrieve the past, historians have to find sources that make the past accessible. But sources do not just reveal the past; historians have to grapple with sources, interpret them, and make them speak. This is what makes history exciting. The same sources can tell us new things if we ask new questions, and engage with them in new ways. So we need to see how historians read sources, and how they discover new things in old sources.

But historians do not only re-examine old records. They discover new ones. Sometimes these could be chance discoveries.

Archaeologists may unexpectedly come across seals and mounds that provide clues to the existence of a site of an ancient civilisation. Rummaging through the dusty records of a district collectorate a historian may trip over a bundle of records that contain legal cases of local disputes, and these may open up a new world of village life several centuries back. Yet are such discoveries only accidents? You may bump into a bundle of old records in an archive, open it up and see it, without discovering the significance of the source. The source may mean nothing to you unless you have relevant questions in mind. You have to track the source, read the text, follow the clues, and make the inter-connections before you can reconstruct the past. The physical discovery of a record does not simply open up the past. When Alexander Cunningham first saw a Harappan seal, he could make no sense of it. Only much later was the significance of the seals discovered.

In fact when historians begin to ask new questions, explore new themes, they have to often search for new types of sources. If we wish to know about revolutionaries and rebels, official sources can reveal only a partial picture, one that will be shaped by official censure and prejudice. We need to look for other sources – diaries of rebels, their personal letters, their writings and pronouncements. And these are not always easy to come by. If we have to understand experiences of people who suffered the trauma of partition, then oral sources might reveal more than written sources.

As the vision of history broadens, historians begin tracking new sources, searching for new clues to understand the past. And when that happens, the conception of what constitutes a source itself changes. There was a time when only written records were acknowledged as authentic. What was written could be verified, cited, and cross-checked. Oral evidence was never considered a valid source: who was to guarantee its authenticity and verifiability? This mistrust of oral sources has not yet disappeared, but oral evidence has been innovatively used to uncover experiences that no other record could reveal.

Through the book this year, you will enter the world of historians, accompany them in their search for new clues, and see how they carry on their dialogues with the past. You will witness the way they tease out meaning out of records, read inscriptions, excavate archaeological sites, make sense of beads and bones, interpret the epics, look at the stupas and buildings, examine paintings and photographs, interpret police reports and revenue records, and listen to the voices of the past. Each theme will explore the peculiarities and possibilities of one particular type of source. It will discuss what a source can tell and what it cannot.

This is the last part of *Themes in Indian History.*

Neeladri Bhattacharya
Chief Advisor, History

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRPERSON, ADVISORY COMMITTEE

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

CHIEF ADVISOR

Neeladri Bhattacharya, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

ADVISORS

Kumkum Roy, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Monica Juneja, Guest Professor, Institut Furgeschichte, Viennna, Austria

TEAM MEMBERS

Jaya Menon, *Associate Professor,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 1)

Kumkum Roy (Theme 2)

Kunal Chakrabarti, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 3)

Uma Chakravarti, *Formerly Associate Professor in History,* Miranda House, University of Delhi, Delhi (Theme 4)

Farhat Hassan, *Associate Professor,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 5)

Meenakshi Khanna, *Associate Professor in History,* Indraprastha College, University of Delhi, Delhi (Theme 6)

Vijaya Ramaswamy, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 7)

Rajat Datta, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 8)

Najaf Haider, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University New Delhi (Theme 9)

Neeladri Bhattacharya (Theme 10)

Rudrangshu Mukherjee, *Executive Editor, The Telegraph*, Kolkata (Theme 11)

Partho Dutta, *Associate Professor,* Department of History, Zakir Hussain College (Evening Classes), University of Delhi, Delhi (Theme 12)

Ramachandra Guha, *freelance writer,* anthropologist and historian, Bangalore (Theme 13)

Anil Sethi (Theme 14)

Sumit Sarkar, *Formerly Professor of History,* University of Delhi, Delhi (Theme 15)

Muzaffar Alam, *Professor of South Asian History,* University of Chicago, Chicago, USA

C.N. Subramaniam, *Eklavya,* Kothi Bazar, Hoshangabad

Rashmi Paliwal, *Eklavya,* Kothi Bazar, Hoshangabad

Prabha Singh, *P.G.T. History,* Kendriya Vidyalaya, Old Cantt., Telliarganj, Allahabad, UP

Smita Sahay Bhattacharya, *P.G.T. History,* Blue Bells School, Kailash Colony, New Delhi

Beeba Sobti, *P.G.T. History,* Modern School, Barakhamba Road, New Delhi

MEMBER-COORDINATORS

Anil Sethi, *Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

Seema Shukla Ojha, *Assistant Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

Themes in Indian History, Part III is the result of a collective effort of a large number of educationists, school teachers, historians, editors and designers. Each chapter was discussed and revised over months of intensive discussion. We thank all those who participated in the process.

Several people read the chapters and provided support. We thank in particular the members of the Monitoring Committee, Prof. J. S. Grewal and Shobha Bajpai for their useful comments on earlier drafts. Prof. Narayani Gupta, Prabhu Mohapatra and Tarun Saint offered valuable suggestions. Mahmood Farooqi suggested extracts for Chapter 11. Partha Shil, Akhila Yachuri and Sabyasachi Dasgupta gave research support.

Many institutions and individuals provided visual resources for the book: Victoria Memorial Museum and Library, Kolkata; Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi; Alkazi Foundation for the Arts, New Delhi; The Osian's Archive and Library Collection, Mumbai; CIVIC Archives, New Delhi; Photo Division, Government of India; South Asia Centre, University of Chicago. Chittaranjan Panda, Kaushik Bhowmik, Pratik Chakrabarty, and Rahab Alkazi took personal care in procuring visual material for illustrations. Juta and Jyotindra Jain opened up their vast collection of images with a generosity rare amongst collectors. We thank them all.

Shalini Advani and Shyama Warner did many rounds of editing with care and enthusiasm. Ritu Topa of Arrt Creations designed the book, working tirelessly to meet impossible deadlines. Albinus Tirkey provided technical support.

We have made every effort to acknowledge credits, but we apologise in advance for any omission that may have inadvertently taken place.

সূচীপত্র

ভাগ-৩

বিষয়বস্তু দশম 257
ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল
সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু একাদশ 288
ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা
1857 -এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

বিষয়বস্তু দ্বাদশ 316
ঔপনিবেশিক নগরগুলো
নগরায়ণ, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ 346
মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

বিষয়বস্তু চতুর্দশ 376
বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশবিভাগ
রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

বিষয়বস্তু পঞ্চদশ 405
সংবিধান প্রণয়ন
এক নতুন যুগের সূচনা

ভাগ-১

বিষয়বস্তু এক
ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ
হরপ্পা সভ্যতা

বিষয়বস্তু দুই
রাজা, কৃষক এবং শহর
প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি
(600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ)

বিষয়বস্তু তিন
সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি
প্রারম্ভিক সমাজ
(আনুমানিক 600 খ্রি. পূ. থেকে 600 খ্রীষ্টাব্দে)

বিষয়বস্তু চার
চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারতসমূহ
সাংস্কৃতিক বিকাশ
(আনুমানিক 600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ
থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

ভাগ-২*

বিষয়বস্তু পঞ্চম
পর্যটকদের নজরে
সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি
(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু ষষ্ঠ
ভক্তি ও সুফি পরম্পরা
ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ
(আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু সপ্তম
একটি সাম্রাজের রাজধানী বিজয়নগর
(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু অষ্টম
কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র
কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং মোঘল সাম্রাজ্য
(আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু নবম
সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস
মোগল দরবার
(ষোড়শ - সপ্তদশ শতাব্দী)

How to use this book

This is the last part of *Themes in Indian History.*

- ☑ Each chapter is divided into numbered sections and subsections to facilitate learning.
- ☑ You will also find other material enclosed in boxes.

These contain:

Short meanings

Additional information

More elaborate definitions

These are meant to assist and enrich the learning process, but are ***not intended for evaluation.***

- ☑ Each chapter ends with a set of ***timelines***. This is to be treated as background information, and ***not for evaluation***.
- ☑ There are ***figures, maps*** and ***sources*** numbered sequentially through each chapter.

  (a) **Figures** include illustrations of artefacts such as tools, pottery, seals, coins, ornaments etc. as well as of inscriptions, sculptures, paintings, buildings, archaeological sites, plans and photographs of people and places; visual material that historians use as sources.

  (b) Some chapters have **maps**.

Sources

(c) **Sources** are enclosed within separate boxes: these contain excerpts from a wide variety of texts and inscriptions. Both visual and textual sources will help you acquire a feel for the clues that historians use. You will also see how historians analyse these clues. **The final examination can include excerpts from and/or illustrations of identical/similar material, providing you with an opportunity to handle these.**

☑ There are *two* categories of ***intext questions:***

(a) those within a yellow box, which may be used for practice for ***evaluation***.

(b) those with the caption ➲ Discuss... which are ***not for evaluation***

☑ There are ***four types*** of assignments at the end of each chapter:
These include:

short questions

short essays

map work

projects

Hope you enjoy using this book.

বিষয়বস্তু
দশ

ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল

সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে তোমরা দেখতে পাবে যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থ যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত, তাদের জন্য কী ছিল। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে তোমরা বাংলার জমিদারদের সাথে পরিচিত হতে পারবে। এরপর তোমরা রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে সাঁওতাল এবং পাহাড়ীরা বাস করত, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে তারপর পশ্চিম থেকে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হবে। তোমরা লক্ষ করবে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কীভাবে গ্রামাঞ্চলে তার শাসন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তার রাজস্ব নীতিগুলোকে কীভাবে কার্যকর করেছিল। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির লোকেদের কাছে এই নীতিগুলোর অর্থ কী ছিল এবং এই নীতিগুলো কীভাবে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল।

সরকারের দ্বারা লাগু হওয়া আইন কানুনগুলো জনগণের মধ্যে অনেক প্রভাব ফেলেছিল। এই আইনের পরিণামস্বরূপ, কারা আগের থেকেও অধিক ধনবান এবং কারা গরিব হয়ে যেত, কারা নতুন জায়গাজমি লাভ করত এবং কারা নিজের বসতি জমি হারাতো তা নির্ধারণ করা হত। কৃষকদের যখন অর্থের প্রয়োজন হত, তখন তারা কার কাছে যেত। এছাড়াও মানুষ কিছু আইনকে মান্য করত, আবার কিছু আইনের বিরোধিতাও করত, কারণ সেই আইনগুলো তাদের কাছে অন্যায় পূর্বক বলে মনে হত। এই বিরোধিতা করার সময় লোকেরা, আইনটি কীভাবে লাগু হওয়া দরকার সেটাও নির্ধারণ করার চেষ্টা করত। এইভাবে তারা আইনের পরিণামগুলোর মধ্যে কিছু অদল বদল করত।

তোমরা অবশ্য সেই উৎসগুলো সম্পর্কেও জানতে পারবে, যা আমাদেরকে সেইসব ইতিহাসগুলো এবং ঐতিহাসিকদের সমস্যাগুলো সম্পর্কেও বলে দেয়। তোমরা রাজস্ব নথিপত্র এবং জরিপ বিভাগ, পত্রপত্রিকা তথা সমীক্ষক এবং ভ্রমণকারীদের দ্বারা রেখে যাওয়া বিবরণ এবং তদন্ত কমিশনের দ্বারা প্রস্তুত করা রিপোর্ট সম্পর্কেও অধ্যয়ন করবে।

চিত্র 10.1
গ্রাম থেকে মাণ্ডিতে কার্পাস বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার একটি ছবি। এই চিত্রটি 20 এপ্রিল 1861 সালে 'লন্ডন নিউজ'-এ প্রকাশিত হয়।

1. বাংলা এবং বাংলার জমিদারবর্গ

তোমরা সবাই জান যে, ঔপনিবেশিক শাসন সর্বপ্রথম বাংলাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানেই গ্রামীণ সমাজকে পুনর্গঠিত করা হয় ও ভূমি সম্পর্কিত অধিকারের একটি নতুন ব্যবস্থা তথা একটি নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করা হয়। চলো আমরা দেখি যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রারম্ভিক বৎসরগুলোতে বাংলায় কী কী ঘটেছিল।

1.1 বর্ধমানে নিলামীর একটি ঘটনা

1797 সালে বর্ধমানে একটি নিলামী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটা ছিল একটি বড়ো সার্বজনীন ঘটনা। বর্ধমানের রাজার দখলে থাকা বেশ কিছু মহল তথা ভূসম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছিল। 1793 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোকে কার্যকর করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্ধারিত মূল্যের রাজস্ব ধার্য করেছিল, যা প্রত্যেক জমিদারকে পরিশোধ করতে হত। যেইসব জমিদাররা নির্ধারিত মূল্যের রাজস্বগুলোকে পরিশোধ করতে পারত না, সেইসব রাজস্ব আদায় করার জন্য তাদের ভূসম্পত্তিকে নিলাম করা হত। যেহেতু বর্ধমানের রাজার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব বকেয়া ছিল। তাই উনার সম্পদগুলোকে নিলামের জন্য রাখা হয়।

রাজা শব্দটির প্রয়োগ প্রায়শই প্রভাবশালী তথা শক্তিশালী জমিদারদের জন্য করা হত।

নিলামে দরকষাকষির জন্য অনেক খদ্দের আসত এবং ভূসম্পদ তথা মহল সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হত। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহকারীরা শীঘ্রই এইরকম কাহিনির মধ্যে অদ্ভুত একটি মোড় দেখতে পায়। জমি ক্রয় করা অনেক খদ্দের, রাজার নিজস্ব কর্মচারি তথা প্রতিনিধি ছিল। তারা রাজার সমর্থনেই জমি ক্রয় করত। নিলামীর মধ্যে বিক্রয়কৃত জমির 95 শতাংশের বেশি ছিল জালিয়াত বা ভুয়ো। এমনিতে রাজার ভূসম্পত্তি তথা জমি সর্বসমক্ষে বিক্রয় করা হত। কিন্তু রাজার জমিদারি নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখত।

রাজা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব পরিশোধ করতে পারত কেন? তৎকালীন সময়ের পূর্ব ভারত এবং গ্রামীণ অঞ্চল কী হয়েছিল, সেই সম্পর্কে এই কাহিনিটি আমাদের কী বলে দেয়?

চিত্র 10.2
কোলকাতার ডায়মন্ড হার্বার রোডে স্থিত বর্ধমানের রাজার রাজপ্রাসাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম দিকে বাংলার বহু বিত্তশালী জমিদারেরা নিজেদের পণ্য সুন্দর ও বিশাল স্তম্ভযুক্ত রাজমহল তৈরি করত। যার মধ্যে নৃত্যকক্ষ, বড়ো বড়ো ময়দান এবং বারান্দাযুক্ত সুন্দর প্রবেশদ্বার ছিল।

1.2 অপরিশোধিত রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম বর্ষে শুধুমাত্র বর্ধমান রাজাদের ভূসম্পত্তিই বিক্রয় করা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হওয়ার পর 75 শতাংশেরও বেশি জমিদারদের জমিদারী হস্তান্তরিত করা হয়।

ব্রিটিশ আধিকারিকদের এই রকম বিশ্বাস ছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হলে, বাংলা বিজয়ের সময় থেকে আধিকারিকগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেইসব সমস্যার সমাধান হবে। 1770-এর দশকে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ছিল, কারণ বারংবার দুর্ভিক্ষ তথা অকাল দেখা দিয়েছিল। এছাড়া কৃষির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। আধিকারিক লোকেরা মনে করেছিল যে, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং রাজ্যের রাজস্ব আয়ের সংস্থান এই সবগুলোকে বিকশিত করা যেতে পারে। আর এইরকম তখনই করা যাবে, যখন সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করা হবে এবং

স্থানীয়ভাবে রাজস্ব চাহিদার হার নির্ধারণ করা হবে। যদি রাজ্যের রাজস্বের চাহিদা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করা যায়, তাহলে কোম্পানি নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রাপ্তির আশা করতে পারবে। এছাড়া উদ্যোক্তারাও নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত লাভ অর্জনের প্রত্যাশা রাখতে পারবে। কেননা এর ফলে কোম্পানি তার দাবি বাড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের লাভের পরিমাণ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই প্রক্রিয়ায় আধিকারিকেরা আশা করেছিল যে, ছোটো কৃষক (yeomen) এবং ধনী ভূ-স্বামীদের মধ্যে এমন এক প্রকার শ্রেণির উদ্ভব হবে, যাদের কাছে কৃষির সংস্কার সাধনের জন্য পুঁজি এবং উদ্যোগ তথা উদ্যম দুটিই থাকবে। আধিকারিকদের এটাও আশা ছিল যে, ব্রিটিশ শাসকদের থেকে ভরণপোষণ ও উৎসাহ পেয়ে এই শ্রেণির লোকেরা কোম্পানির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে।

কিন্তু সমস্যাটি ছিল, এমন লোকদের খুঁজে বের করা, যারা কৃষির উন্নতি বিধানের সাথে সাথে রাজ্যের স্থায়ী রাজস্বকে আদায় করার দায়িত্ব নিতে পারবে। কোম্পানির অধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘকালীন পরস্পর আলোচনার পরে, বাংলার রাজা এবং তালুকদারদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। এমতাবস্থায় তাদের জমিদার হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয় এবং এই জমিদারদেরকে সবসময়ের জন্য একটি স্থায়ী রাজস্ব প্রদান করতে হত। এই বর্ণনা অনুসারে বলা যায় যে, জমিদাররা তখন শুধুমাত্র গ্রামের ভুস্বামীই ছিলেন না, বরং তারা রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহকারীও ছিল।

জমিদারদের অধীনে (কোনো কোনো সময়ে 400টি গ্রামও থাকত) অনেক গ্রাম ছিল। কোম্পানির হিসাব অনুযায়ী, একজন জমিদারের অধীনে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি রাজস্ব এলাকা গড়ে উঠত। কোম্পানি সমস্ত এলাকার সম্পত্তির উপর মোট রাজস্ব নির্ধারণ করত। যেসব রাজস্ব প্রদান করতে জমিদাররা চুক্তিবদ্ধ থাকত। পরবর্তীকালে, জমিদার বিভিন্ন গ্রাম থেকে কতটা রাজস্ব আদায় করতে হবে, তা নির্ধারণ করতেন। তারপরে জমিদার গ্রামগুলো থেকে আদায়কৃত রাজস্ব কোম্পানিকে প্রদান করতেন। জমিদার নিয়মিতভাবে কোম্পানিকে রাজস্ব প্রদান করবে বলে আশা করা হয়েছিল এবং যদি জমিদার নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব প্রদান করতে অসমর্থ হত, তবে তার সম্পত্তি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত।

1.3 জমিদাররা কেন রাজস্ব প্রদান করতে ব্যর্থ হতেন

কোম্পানির আধিকারিকরা মনে করত যে, রাজস্বের চাহিদা নির্ধারিত করার ফলে জমিদারদের মধ্যে একটি নিরাপত্তার মনোভাব জেগে উঠবে এবং তারা নিজেদের বিনিয়োগের ওপর লাভের আশায় নিশ্চিত হয়ে, নিজস্ব ভুসম্পত্তিগুলোকে সংস্কার সাধন করার জন্য উৎসাহিত হবে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার প্রারম্ভিক দশকগুলোর দিকে, জমিদাররা নিয়মিতভাবে চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছিল। যার পরিণামস্বরূপ বকেয়া রাজস্ব অপরিশোধিত ছিল।

জমিদারদের এইরকম অসফলতার পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত, প্রাথমিক চাহিদাটা ছিল খুবই বেশি। কারণ মনে করা হয়েছিল, যদি রাজস্বের চাহিদা পরবর্তী দিনগুলোতে সর্বদা এর জন্য নির্ধারিত করা হয়, তবে পরবর্তী মূল্য বৃদ্ধি এবং কৃষির প্রসারের ফলে আয় বৃদ্ধি হলেও কোম্পানি এই বর্ধিত আয়ে নিজের

চিত্র 10.3
1785 সালে থমাস গেইনস্ বোরো এর দ্বারা অঙ্কিত চার্লস কর্ণওয়ালিসের (1738-1805) একটি ছবি।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। এছাড়া 1793 সালে যখন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়, তৎকালীন সময়ে তিনি বাংলার গভর্নর জেনারেল ছিলেন।

তালুকদার শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, এমন এক ব্যক্তি যিনি তালুককে ধরে রাখেন অথবা যোগাযোগ রাখেন। পরবর্তী সময়ে তালুক শব্দটির অর্থ আঞ্চলিক একথা হিসেবে আসে।

অংশ দাবি কখনোই করতে পারবে না। এই প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতিকে কমানোর জন্যই কোম্পানি রাজস্বের চাহিদা বৃদ্ধি করে। এর যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ জমিদারদের উপর থেকে চাপ ক্রমশ হ্রাস পাবে।

রায়ত শব্দটির ব্যবহার ইংরেজদের লেখা বিবরণীতে কৃষকদের জন্য করা হত (অধ্যায় ৪)। বাংলায় রায়তরা সবসময় কৃষিকাজের সাথে সরাসরি যুক্ত হত না। বরং কৃষি জমিগুলোকে রায়তদের কাছে ইজারায় দেওয়া হত।

দ্বিতীয়ত: রাজস্বের এই বর্ধিত চাহিদাকে 1790-এর দশকে যখন কৃষির উৎপাদন মূল্য হ্রাস পায়, তখন লাগু করা হয়। যার ফলে জমিদারদের বকেয়া পরিশোধ করতে রায়তদের সমস্যা হত। যদি জমিদারেরা রাজস্ব সংগ্রহ করতে না পারে, তবে কীভাবে তারা কোম্পানির বকেয়া পরিশোধ করবে? তৃতীয়ত: ফসল উৎপাদন বেশি হোক বা কম, রাজস্ব ঠিক সময়েই পরিশোধ করতে হত। অর্থাৎ রাজস্বের পরিমাণ স্থির থাকত। বস্তুত সূর্যাস্ত আইন অনুসারে, যদি নির্ধারিত তারিখ বা দিনে রাজস্ব পরিশোধ করা না হত, তবে জমিদারের সম্পত্তিকে নিলাম করা হত। চতুর্থত: প্রারম্ভিক পর্বে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে জমিদারদের ক্ষমতা, রায়তদের থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং নিজেদের জমিদারি পরিচালনা করা পর্যন্তই সীমিত ছিল।

কোম্পানি জমিদারদের গুরুত্ব দিতেন ঠিকই,তবে কোম্পানি জমিদারদের ক্ষমতাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল এবং তাদের স্বায়ত্ত শাসনকেও সীমিত করতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ, জমিদারদের সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়। আমদানি রপ্তানির শুল্ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া জমিদারদের কোর্ট কাছারিগুলোকে কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত কালেক্টর তথা সাংগ্রহকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। জমিদাররা স্থানীয় ন্যায়বিচার এবং স্থানীয় পুলিশকে সংগঠিত করার ক্ষমতাকে হারিয়েছিল। কালক্রমে বিকল্প কার্যালয়ের কেন্দ্র হিসেবে কালেক্টরদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এছাড়া জমিদারদের ক্ষমতাকে পুরোপুরিভাবে সীমিত করে দেওয়া হয়। একটি ঘটনায়, রাজা রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, কোম্পানির একজন আধিকারিক খুব দ্রুতভাবে একটি স্পস্ট নির্দেশিকা জমিদারের কাছে পাঠায় এবং তাতে বলা হয় যে, "তিনি যেন রাজার সমস্ত এলাকার দায়িত্বভার নিয়ে নেয় এবং রাজা সহ রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সমস্ত কর্তৃত্ব এবং প্রভাবকে বিলোপ করার জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়।"

রাজস্ব সংগ্রহ করার সময়, জমিদারদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যাকে সাধারণত 'আমলা' বলে জানা যেত, তারা গ্রামের মধ্যে আসত। কিন্তু রাজস্ব আদায় করা ছিল সারা বৎসরব্যাপী একটি সমস্যা। কোনো কোনো সময়ে কম উৎপাদন এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার কারণে রায়তদের রাজস্ব পরিশোধ করতে অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। আবার এইরকমও হত যে, রায়তেরা ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব দেরিতে প্রদান করত। বিত্তশালী রায়ত এবং গ্রামের প্রধান যেমন - জোতদার ও মণ্ডলরা, জমিদারদেরকে সমস্যায় জর্জরিত দেখে তারা খুশি হত। ফলে জমিদাররা খুব সহজেই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। জমিদাররা খেলাপিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত ঠিকই, কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া ছিল খুব লম্বা। 1798 সালে একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই রাজস্ব পরিশোধ সংক্রান্ত মামলা 30,000-এরও বেশি বিচারাধীন ছিল।

1.4 জোতদারদের উদ্ভব

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দিকে, যখন অনেক জমিদার সঙ্কটকালীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, অন্যদিকে তখন গ্রামের ধনী কৃষকদের একটি সম্প্রদায় তাদের অবস্থানকে মজবুত করছিল। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলা নিয়ে ফ্রান্সিস বুকাননের একটি সমীক্ষায়, ধনী কৃষকবর্গ যাদের আমরা 'জোতদার' হিসেবে জানি, তাদের সম্পর্কে আমরা বিশদ বিবরণ জানতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, জোতদাররা বিস্তীর্ণ জমি দখল করত, কখনো কখনো এই অধিগ্রহণের পরিমাণ কয়েক হাজার একরেরও বেশি হত। স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকত, এইভাবে জোতদাররা সেই অঞ্চলের দীন-দরিদ্র কৃষকদের উপর অসীম শক্তির প্রয়োগ করত। জোতদারদের জমির একটা বৃহত্তম অংশ ভাগচাষী (আধিয়ার অথবা বর্গাদার) দের মাধ্যমে চাষ করানো হত, এই ভাগচাষীরা কৃষিকাজে তাদের নিজস্ব লাঙ্গল ব্যবহার করত, জমিতে পরিশ্রম করত এবং ফসল তোলার পর উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক জোতদারদের দেওয়া হত।

গ্রাম বাংলায় জোতদারদের ক্ষমতা, জমিদারদের অপেক্ষায় অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। জমিদাররা যারা প্রায়শই শহরাঞ্চলে বসবাস করতেন, তাদের বিপরীতে জোতদাররা গ্রামে বাস করতেন এবং দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর উপর সরাসরি তারা প্রভাব বিস্তার করত। জমিদাররা গ্রামের জমা (খাজনা) কে বাড়ানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, জোতদাররা তার বিরোধী ছিল। তারা জমিদারী আধিকারিক তথা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্বদায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে বাধা দিতেন। যেসব রায়তেরা জোতদারদের উপর নির্ভরশীল থাকত, জোতদাররা সেইসব রায়তদের নিজেদের কাছে ঐক্যবদ্ধভাবে রাখতেন এবং জমিদারদেরকে রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করতেন। প্রকৃতপক্ষে, জমিদাররা যখন রাজস্ব পরিশোধ করতে অসমর্থ হত, তখন জমিদারদের জমিদারি নিলাম হয়ে যেত। এছাড়া প্রায়শই জোতদাররাই জমিদারদের সেইসব জমিগুলোকে ক্রয় করত।

উত্তরবঙ্গাতে জোতদাররা অনেক প্রভাবশালী ছিল। এমনকি, ধনী কৃষক এবং গ্রামের মোড়লরাও বাংলার অন্যান্য জায়গার পল্লি এলাকাতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। কিছু জায়গাতে তাদের 'হাবিলদার' বলা হত। আবার অন্য কিছু জায়গাতে তাদের ঘন্টিদার (*gantidars*) অথবা মণ্ডল বলেও জানা যেত। তাদের উত্থান, অবশ্যম্ভাবী রূপে জমিদারদের কর্তৃত্বকে দুর্বল করে দেয়।

চিত্র 10.4
1820 সালে জর্জ চিনেরী-এর দ্বারা অঙ্কিত, বাংলার গ্রামের একটি দৃশ্য।
জর্জ চিনেরী ভারতবর্ষে 23 বৎসর পর্যন্ত (1802-25) বসবাস করেছিল। ভারতবর্ষে থাকাকালীন সময়ে তিনি অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন, যেমন - সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কিত চিত্র, প্রাকৃতিক ভূচিত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ছবি প্রভৃতি। নিম্নে দেওয়া চিত্রটিতে গ্রাম বাংলার একটি ঘরের আকৃতিকে ছবি রূপে দেখানো হয়েছে। তৎকালীন সময়ে জোতদার এবং মহাজনেরা এই ধরনের ঘরে থাকত।

উৎস 1

দিনাজপুরের জোতদারগণ

বুকানন বর্ণনা করেছেন যে, উত্তর বাংলার দিনাজপুর জেলার জোতদাররা কীভাবে জমিদারদের অনুশাসনের প্রতিরোধ করত এবং কীভাবে জোতদাররা তাদের ক্ষমতার ভিত্তিগুলোকে দুর্বল করে দিত :

ভূস্বামীরা এই শ্রেণির লোকেদের পছন্দ করত না, তবে এটা স্পষ্ট যে, এই সমস্ত লোকদের খুব প্রয়োজন ছিল। কেননা জমিদারগণ নিজেরাই তাদের অতি দরিদ্র প্রজাদের কাছে অগ্রিম অর্থ প্রদান করত ...

জোতদাররা, যারা জমির বিশাল অংশে চাষ করত, তারা খুব অবাধ্য ও একগুয়ে প্রকৃতির ছিল এবং তারা জানত যে, তাদের উপর জমিদারদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। জোতদাররা জমানো রাজস্বের সামান্য কিছু অর্থই প্রদান করতেন। এছাড়া প্রত্যেক কিস্তিতে কিছু না কিছু অবশিষ্ট রয়েই যেত। তারা চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা প্রাপ্য জমি থেকে অধিক জমির অধিকারী ছিল। জমিদারদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা জমিদারদের পাওনা তথা বকেয়া আদায়ের জন্য জোতদারদের কাছারীতে তলব করত এবং তাদের তীব্র ভর্ৎসনার জন্য কাছারীতে ঘণ্টা দুই ঘণ্টা রেখে দিত। তখন জোতদাররা শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য ফৌজদারী থানা (পুলিশ স্টেশন) অথবা মুন্সিফ-এর (নিম্ন আদালতের বিচারক) কাছারীতে পৌঁছে যেত। থানায় তারা অভিযোগ করত যে, জমিদারদের কর্মচারীরা তাদের তিরস্কার করেছে। এইভাবে রাজস্বের বকেয়া সংক্রান্ত মামলা চলতেই থাকত। এছাড়া জোতদাররা ছোটো ছোটো রায়তদেরকে রাজস্ব পরিশোধ না করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকত ...

➲ জোতদারগণ কীভাবে জমিদারদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করত, তা বর্ণনা করো।

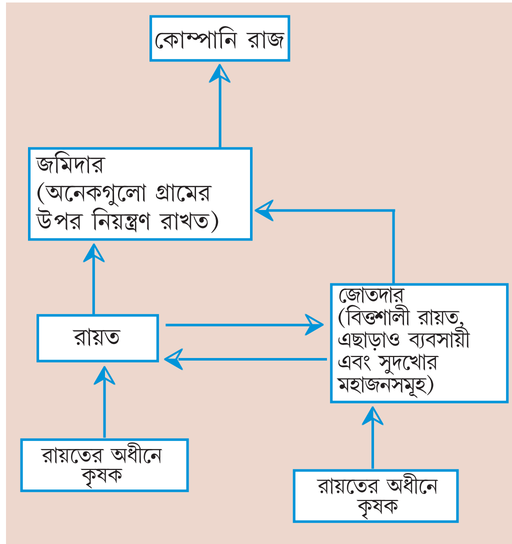

■ জমিদাররা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্যে দায়বদ্ধ ছিল:
(a) কোম্পানির রাজস্ব আদায় করার ক্ষেত্রে
(b) গ্রামে রাজস্ব সম্পর্কিত চাহিদা (জমা) নির্ধারিত করার ক্ষেত্রে।

■ গ্রামের ছোটো অথবা বড়ো প্রত্যেক রায়তদেরই, জমিদারদেরকে খাজনা প্রদান করতে হত।

■ জোতদাররা অন্য রায়তদেরকে ঋণ প্রদান করতেন এবং নিজেদের উৎপাদিত পণ্যগুলোকে বিক্রি করে দিতেন।

■ রায়তের কিছু জমিতে নিজেরা চাষ করত এবং বাকি জমিগুলোকে রায়তেরা, তাদের অধীনে কৃষকদের ভাড়ার বিনিময়ে প্রদান করত।

■ রায়তদের অধীনে কৃষকরা, রায়তদের খাজনা প্রদান করত।

চিত্র 10.5
গ্রামীন বাংলার ক্ষমতা

➲ চিত্র10.5 -এর মধ্যে দেওয়া পাঠ্যাংশটিকে ভালো করে পড়ো এবং তিরচিহ্ন বরাবর উপযুক্ত স্থানগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলোকে বসাও। যেমন - ভাড়া (খাজনা), রাজস্ব, সুদ, ঋণ, উৎপাদিত পণ্য।

1.5 জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ

যদিও গ্রামীণ অঞ্চলের জমিদারদের কর্তৃত্ব ভেঙে পড়েনি। অত্যধিক রাজস্বের চাহিদা এবং নিজেদের সম্পত্তি সমূহের সম্ভাব্য নিলামের সমস্যা থেকে নিরসনের জন্য, বিচলিত জমিদাররা একটি পথ বেছে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নতুন একটি রণকৌশল তৈরি করা হয়েছিল।

এই জাতীয় একটি রণকৌশল ছিল জাল ক্রয় বিক্রয়। এতে অনেক ধরনের রণকৌশলে ব্যবহার করা হত। এইক্ষেত্রে বর্ধমানের রাজা প্রথমে নিজের সম্পত্তির অংশ তাঁর মাকে দিয়ে দেয়। কেননা কোম্পানি এইরকম ফরমান জারি করে রেখেছিল যে, স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যাবে না। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে, বাজার প্রতিনিধি তথা রাজকর্মচারীরা নিলাম প্রক্রিয়াতে কারসাজি করত। কোম্পানির রাজস্ব চাহিদাকে জেনেশুনে আটকিয়ে রাখা হত এবং অপরিশোধিত বকেয়া রাশিগুলো বাড়তে থাকতো। যখন ভূসম্পত্তির কিছু অংশ নিলাম হত, তখন জমিদারদের কর্মচারীরাই অন্য খদ্দেরদের তুলনায় বেশি বেশি দাম দিয়ে ভূসম্পত্তি ক্রয় করে নিত। পরবর্তীকালে তারা জমি ক্রয়ের অর্থপ্রদান করতে অস্বীকার করে, যার ফলে এই ভূসম্পত্তিটিকে পুনরায় বিক্রি করতে হত, ফের একবার জমিদারদের প্রতিনিধিরাই সেই বিক্রয়কৃত জমিগুলো ক্রয় করে নিত এবং আগের মতোই ক্রয় করা জমির অর্থ পরিশোধ করা হত না, ফলে আরো একবার জমির নিলামী করতে হত। বার বার এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। রাজা ও নিলামের অন্য দরদাতারা দর দাম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। অবশেষে জমিদার অতিক্রম মূল্যে পুনরায় জমিগুলোকে ক্রয় করে নিত। জমিদার কখনোই চাহিদা

অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করত না। কোম্পানি খুব কমই জমিদারদের পরিশোধিত বকেয়া অর্থরাশি আদায় করতে পারত।

এই ধরনের কেনাবেচা বিশাল মাত্রায় হত। 1793 থেকে 1801 সালের মধ্যবর্তী সময়ে বর্ধমানের রাজা সহ মোট চারটি বড়ো জমিদার প্রচুর বেনামী বেচাকেনা করে, ফলস্বরূপ এই বেচাকেনাতে সর্বমোট প্রাপ্তি হয় 30 লক্ষ টাকা নিলামের মধ্যে বিক্রয়কৃত সম্পত্তির মোট 15 শতাংশ লেনদেনই ছিল নকল।

আরো অনেক উপায়ে জমিদাররা তাদের জমিদারি সত্ত্বাকে অপসারণের হাত থেকে কোনো মতে রক্ষা করে নিত। যখন বহিরাগত লোকেরা নিলামিতে জমিদারদের ভূসম্পত্তি ক্রয় করত। তখন সবসময় তারা তাদের সম্পত্তির মালিকানা পেত না। কখনো কখনো পুরানো জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী নতুন খদ্দের লোকেদের মারপিট করে তাড়িয়ে দিত। এছাড়া কখনো কখনো এমনও হত যে, রায়তেরা বহিরাগত লোকদের অর্থাৎ নতুন খদ্দেরদের জমির মধ্যে প্রবেশ করতে দিত না। রায়তেরা নিজেদেরকে জমিদারদের ঘনিষ্ট বলে মনে করত এবং তাদের প্রতি রায়তদের আনুগত্যতা থাকত। এছাড়া তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পুরানো জমিদাররা হল তাদের অন্নদাতা এবং তাঁরা হল জমিদারদের প্রজা। জমিদারদের জমিদারি বিক্রয় ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব ও গৌরবে আঘাত লাগত। এইজন্যই জমিদারদের খুব সহজেই উৎপাটিত তথা স্থান চ্যুত করা যেত না।

ঊনবিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে আর্থিক দূর অবস্থার সমাপ্তি ঘটে। এই জন্যই সেইসব জমিদাররা 1790-এর দশকের সংকটকালিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল, সেই সমস্ত জমিদাররা তাদের জমিদারি সত্ত্বাগুলোকে আরো সুদৃঢ় করে তুলতে সক্ষম হয়। রাজস্ব প্রদান সম্পর্কিত নিয়মনীতির মধ্যেও কিছুটা নমনীয়তা আনা হয়। ফলস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের জমিদারী সত্ত্ব আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তবে, 1930-এর দশকে তীব্র মন্দা চলাকালীন অবস্থায় জমিদারদের জমিদারি ভেঙে পড়ে এবং জোতদারেরা পল্লি অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করে তোলে।

1.6 পঞ্চম প্রতিবেদন

আমরা যেসব পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করছি, তার বেশিরভাগ পরিবর্তনেই বিস্তৃত বিবরণ একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল, যা 1813 সালে ব্রিটিশ সংসদে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এটি ছিল ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যকলাপের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের পঞ্চম প্রতিবেদন। প্রায়শই 'পঞ্চম প্রতিবেদন' নামে উল্লেখিত, এই প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল 1002 টি। এই প্রতিবেদনের 800 থেকেও বেশি পৃষ্ঠার মধ্যে জমিদার এবং রায়তদের আর্জিসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। ভিন্ন-ভিন্ন জেলার খাজনা সংগ্রহকারীদের তথ্য ছিল। এছাড়াও রাজস্ব পরিশোধের বিবরণী সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের তালিকা, আধিকারিকদের দ্বারা বাংলা ও মাদ্রাজের (বর্তমানে তামিলনাড়ু) রাজস্ব তথা ন্যায় প্রশাসনের উপর লিখিত মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

1760-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন কোম্পানি বাংলায় নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে, তখন থেকেই ইংল্যান্ডে কোম্পানির কার্যকলাপের উপর

চিত্র 10.6
মহারাজা মেহতার চন্দ (1820-79)
যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে লাগু করা হয়, তখন তেজচন্দ ছিল বর্ধমানের রাজা। পরবর্তী সময়ে যখন মেহতার চন্দ-বর্ধমানের শাসন ক্ষমতায় আসে, তখন জমিদারিতে অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং 1857 সালের মহাবিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে, মেহতার চন্দ ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তা করেছিল।

বেনামি, শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'নামবিহীন'। এই শব্দটিকে হিন্দি তথা কিছু অন্য ভারতীয় ভাষায় এমন কিছু লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হত, যেই লেনদেন আসলে কোনো নকল অথবা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন ব্যক্তির নামে হত। বাস্তবদিকে প্রকৃত স্বত্ত্বভোগীদের নাম দেওয়া হত না অথবা অজানা থাকত।

লাঠিয়াল শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, সেই ব্যক্তি, যার কাছে লাঠি অথবা ছড়ি থাকত। তারা জমিদারদের পক্ষের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করত।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা শুরু হয়। ব্রিটেনে এমন অনেক গোষ্ঠী ছিল, যারা ভারত এবং চিনের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরোধিতা করত। এই গোষ্ঠীর লোকেরা চেয়েছিল যে, কোম্পানিকে দেওয়া রাজকীয় সনদ তথা শাহী ফরমানকে রদ করতে। যেই রাজকীয় সনদের মাধ্যমে কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যারা ভারতবর্ষের বাণিজ্যে অংশ নিতে চেয়েছিল। এছাড়া ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ব্রিটিশ উৎপাদকদের জন্য ভারতবর্ষে বাজার উন্মুক্ত করতে আগ্রহী ছিল। ব্রিটেনের অনেক রাজনৈতিক দলের এই মত ছিল যে, বাংলা জয়ের সুবিধা ভোগ করছিল শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই সম্পূর্ণ ব্রিটিশ জাতি নয়। কোম্পানির কুশাসন ও অগোছালো প্রশাসনের প্রাপ্ত তথ্যে, ব্রিটেনে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয় এবং কোম্পানির আধিকারিকদের লোভ ও দুর্নীতির ঘটনাগুলো যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্রগুলোতে ব্যাপক রূপে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সংসদ ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য, অষ্টাদশ শতকের অন্তিমদিকে বেশ কয়েকটি আইন পাশ করে। কোম্পানিকে বাধ্য করা হয়েছিল, যাতে তারা ভারতবর্ষের প্রশাসন সম্পর্কে নিয়মিতভাবে রিপোর্টে পাঠায়। এছাড়া কোম্পানির কাজকর্মের তদন্তের জন্য অনেক কমিটির নিযুক্ত করা হয়। 'পঞ্চম প্রতিবেদন' এমনই একটি প্রতিবেদন, যা একটি নির্বাচিত কমিটির দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এটি ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রকৃতি নিয়ে তীব্র সংসদীয় বিতর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল।

চিত্র 10.7
আন্দুল রাজপ্রাসাদ
রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষগুলো কোনো একটি যুগের পরিসমাপ্তির দৃশ্যকে চিহ্নিত করছে। জমিদারদের আভিজাত্য জীবনযাত্রার অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত সত্যজিৎ রায়-এর বিখ্যাত ছায়াছবি। জলশাখর-এর শুটিং হয়, এই আন্দুল রাজপ্রাসাদেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমদিকে গ্রাম বাংলায় যা ঘটেছিল, এই ব্যাপারে পঞ্চম প্রতিবেদন প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে আমাদের সেই ধারণাই তৈরি করে আসছে। 'পঞ্চম প্রতিবেদনে' থাকা সাক্ষ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এইরকম সরকারি প্রতিবেদনকে অতি যত্ন সহকারে পাঠ করতে হবে। এই সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, এই প্রতিবেদনগুলোকে কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে লিখেছেন। বাস্তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, 'পঞ্চম প্রতিবেদনে' উল্লেখিত তর্ক এবং সাক্ষ্যগুলোকে কোনো সমালোচনা ব্যতীত স্বীকার করা যাবে না।

গবেষকরা গ্রাম বাংলার ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে লেখার জন্য বাংলার অনেক জমিদারদের নথিপত্র এবং জেলার স্থানীয় সাক্ষ্য প্রমাণগুলোকে ভালো করে নিরীক্ষণ করেছিলেন। এই নিরীক্ষণ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চম প্রতিবেদন লিখিত ব্যক্তিরা, কোম্পানিব কুশাসন সম্পর্কিত আলোচনাকে তুলে ধরার জন্য উৎগ্রীব হয়ে রয়েছিল। এই জন্যই পঞ্চম প্রতিবেদনে পরম্পরাগত জমিদারদের জমিদারি সত্ত্বার পতন সম্পর্কিত বর্ণনাকে অতিরঞ্জিতভাবে করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ জমিদারদের জমিদারি তথা জায়গাজমি হারানোর পরিমাণটিকে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এই রকমটা আমরা দেখেছি, যখন জমিদারদের জায়গাজমি তথা জমিদারি সত্ত্বার নিলামি করা হত, তখনও জমিদারেরা নতুন নতুন কৌশলের প্রয়োগ করে নিজেদের জমিদারি সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখত। এছাড়াও খুব কম জমিদাররাই বাস্তুচ্যুত তথা উৎপাটিত হত।

উৎস 2

পঞ্চম প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত

জমিদারদের অবস্থা এবং জমি নিলামের ব্যাপারে উল্লেখ করে 'পঞ্চম প্রতিবেদনে' বলা হয়েছে :

> রাজস্ব সময়মতো পরিশোধ করা হত না এবং বিশাল মাত্রায় জমিগুলোকে পর্যায়ক্রমে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য রাখা হত। বাংলাবর্ষ 1203-এর অনুরূপ 1796-97 সালে বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপিত জমির নির্ধারিত মূল্য (জুম্মা) 28,70,061 (সিক্কা) টাকা ছিল। বাস্তবে 17,90,416 টাকায় বিক্রি করা হয়। বাংলাবর্ষ 1204-এর মতো ইংরেজি বর্ষ 1797-98 তে 26,66,191 (সিক্কা) টাকায় জমি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। জমির বিক্রয়মূল্য ছিল 22,74,076 (সিক্কা) টাকা এবং এই জমির ক্রয়মূল্য ছিল 21,47,580 (সিক্কা) টাকা। ঋণ খেলাপিদের মধ্যে কিছু লোক দেশের বহু পুরোনো পরিবার থেকে ছিলেন। এঁরা ছিলেন নদীয়া, রাজশাহী, বিশনপুর (বাংলার সমস্তজেলা) ও অন্যান্য রাজ্যের রাজা। পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের জায়গিরদারি ব্যবস্থা ভেঙে পরার কারণে তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে। তাদেরকে দরিদ্রতা এবং ধ্বংসাত্মক হুমকির মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং কিছু কিছু ব্যাপারে সর্বজনীন ধার্যমূল্য যথাযথ রাখার জন্য রাজস্ব আধিকারিকদেরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

➲ যে ভঙ্গিতে সাক্ষ্যটিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তা থেকে প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিবরণের প্রতি লেখকের মনোভাব সম্পর্কে তোমাদের কী অভিমত? প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কী দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে? দুই বছরের এই পরিসংখ্যান থেকে তোমাদের মতে কী যে-কোনো সমস্যার দীর্ঘকালীন নিষ্পত্তি বের হওয়া সম্ভব?

➲ আলোচনা করো...

জমিদারদের অবস্থা সম্পর্কে তোমরা এই অধ্যায়ে সবেমাত্র যা কিছু পড়েছ, অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখিত বিবরণটির সাথে তার তুলনা করো।

2. নিড়ানি ও লাঙ্গল

চলো এখন আমরা নিজের দৃষ্টি বাংলার জলা অঞ্চল থেকে সরিয়ে শুষ্ক অঞ্চলের দিকে নিবদ্ধ করি। স্থায়ী কৃষিক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্থানান্তরিত কৃষি তথা জুমচাষের দিকে নিবন্ধ করি। তোমরা সেই পরিবর্তনসমূহ লক্ষ করবে, যেগুলো কৃষকদের অর্থব্যবস্থার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরের দিকে প্রসারিত ছিল। যার ফলে রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত জঙ্গল এবং তৃণভূমি সেই অর্থব্যবস্থার আওতায় চলে আসে। তোমরা এটাও লক্ষ করবে যে, এই পরিবর্তনের ফলে কীভাবে এইসব অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

2.1 রাজমহলের পাহাড়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে বুকানন রাজমহলের পাহাড় ভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে এই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এটি এমন একটি বিপদ সংকুল অঞ্চল ছিল, যেখানে খুব কম অভিযাত্রীরা যাওয়ার সাহস করত। বুকানন যেখানেই যেতেন, সেখানকার লোকদের ব্যবহারই ছিল শত্রুতাপূর্ণ। সেইসব লোকেরা কোম্পানির আধিকারিকদের প্রতি শঙ্কিত থাকত এবং তাদের সাথে কথা বলতে চাইত না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের বাড়িঘর এবং গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত।

এইসব পাহাড়ি লোক কারা ছিল? তারা বুকাননের সফরের প্রতি কেন এত শঙ্কিত থাকত? বুকাননের দিন পঞ্জিকা থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দিকে পাহাড়ি লোকেদের খুব অসহায় পরিস্থিতির একটি ঝলক পাই। তার পরিদর্শিত জায়গাগুলো সম্পর্কে তিনি একটি ডায়রি লিখেছিলেন। সেখানকার লোকজনদের সাথে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাদের রীতি নীতিগুলোকে প্রত্যক্ষ করেন। এই দিনপঞ্জিকা আমাদের মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু এটি সবসময় আমাদের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে সহায়ক ছিল না। তার ডায়রিটি আমাদের কেবলমাত্র ক্ষণকালের একটি মুহূর্ত সম্পর্কেই জানান দেয়। কিন্তু ডায়রিটি থেকে মানুষ এবং তার বাসস্থানের দীর্ঘতম ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এসব দীর্ঘ ইতিহাস জানার জন্য ঐতিহাসিকদের অন্য নথিপত্রের দিকে ঝুকতে হত।

যদি আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রাজস্ব দলিলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে আমরা জানতে পারব যে, এই অঞ্চলের পাহাড়ি লোকদের "পাহাড়িয়া' হিসাবে জানা যেত। এই পাহাড়ি লোকেরা রাজমহল পাহাড়ের আশেপাশে বসবাস করত। তারা জঙ্গল থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যাদি থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করত এবং জুমচাষ করত। তারা কিছু অংশের ঝোপঝাড় কেটে আগাছা জ্বালিয়ে জমি পরিষ্কার করত। এইসব অঞ্চলের ঝোপঝাড় এবং আগাছাগুলোকে জ্বালানোর ছাই থেকে যে সার উৎপন্ন হত তা থেকে তারা বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং জোয়ার, বাজরার মতো ফসল উৎপাদন করত। পাহাড়িরা নিড়ানি ও কোদালের সাহায্যে আলতোভাবে জমিতে কর্ষণ করত। কয়েক বছর পর্যন্ত তারা সেই পরিষ্কার করা জমির মধ্যে কৃষিকাজ করত। এরপর আবার তারা কয়েক বছরের জন্য সেই জমিটিকে পতিত রেখে নতুন আরেকটি এলাকায় চাষবাসের জন্য যেত। যাতে করে পুরনো জমিটি তার উর্বরতা ফিরে পায়।

বুকানন কে ছিলেন?

ফ্রান্সিস বুকানন একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং (1794 থেকে 1815 পর্যন্ত) বাংলার চিকিৎসা সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কয়েক বছরের জন্য তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল - লর্ড ওয়েলেসলির শল্য চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতায় থাকাকালীন তিনি একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এই চিড়িয়াখানার নাম হয় কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানা। অল্প সময়ের জন্য তিনি কলকাতা বোটানিকেল গার্ডেনেরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। বাংলায় ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতাধীন অঞ্চলগুলোর বিস্তারিত সমীক্ষা চালিয়েছিল। 1815 সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যান। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর বংশের উপাধি "হ্যামিলটন" নামে গ্রহণ করেন। এইজন্য প্রায়শই তাকে বুকানন-হ্যামিলটন নামে অভিহিত করা হত।

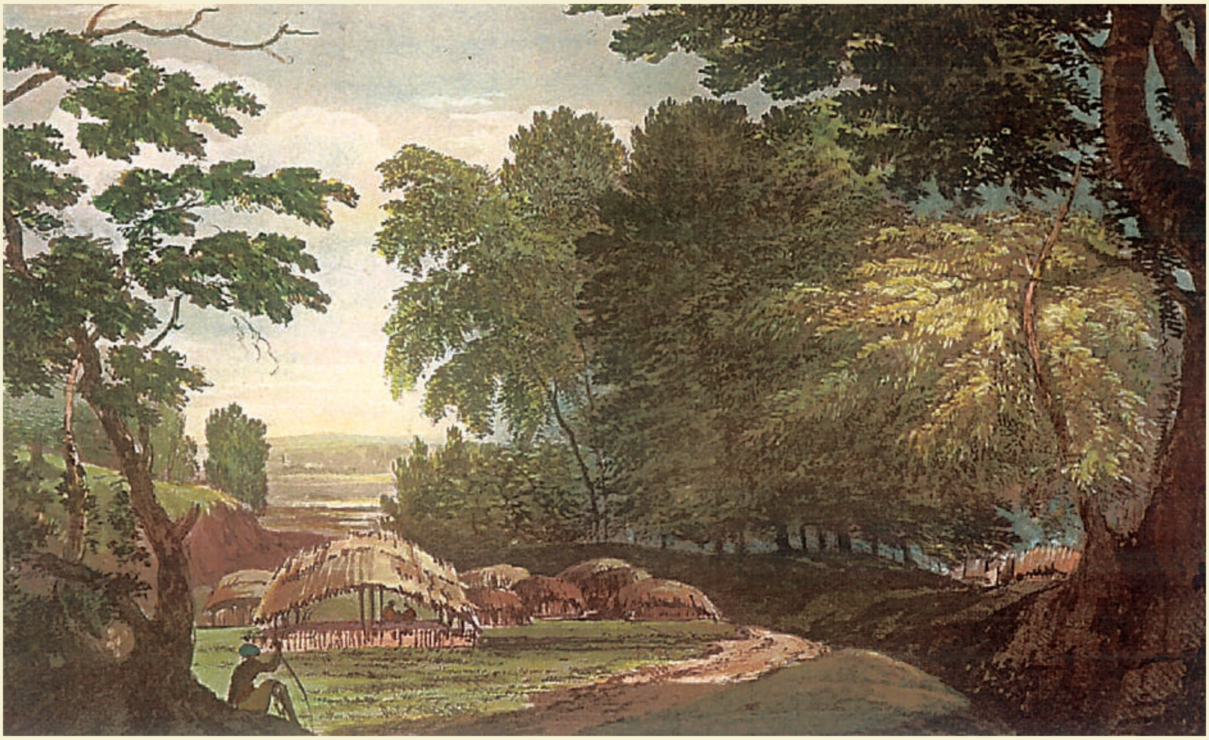

চিত্র 10.8
1782 সালে উইলিয়াম হজেস-এর দ্বারা অঙ্কিত রাজমহলের অন্তর্গত গ্রাম পাহাড়ের একটি দৃশ্য

উইলিয়াম হজেস একজন ব্রিটিশ শিল্পী ছিলেন, যিনি ক্যাপ্টেন কুকের সঙ্গো প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রার জন্য (1772-75) বেরিয়েছিলেন, এরপর তিনি ভারতবর্ষে আসেন। 1781 সালে ভাগলপুরের কালেক্টর অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডের সঙ্গো তাঁর বন্ধুত্ব হয়। 1782 সালে অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ডের আমন্ত্রণে উইলিয়াম হজেস তাঁর সঙ্গো জঙ্গালমহলে ভ্রমণে যান। সেখানে হজেস একসঙ্গো অনেক জলছবি অঙ্কন করেন। ওই সময়ের বহু ব্রিটিশ চিত্রশিল্পীদের সঙ্গো হজেসও মনোরম দৃশ্যের খোঁজ করেছিলেন। সেইসময় মনোরম দৃশ্যের খোঁজ করা চিত্রশিল্পীরা রোমান্টিকতা / আবেগপ্রবণতার (romanticism) বিচারধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। এই বিচারধারার অন্তর্গত প্রকৃতির পূজা করা হত এবং তার মনোরম সৌন্দর্যের এবং শক্তির প্রশংসা করা হত। রোমান্টিক চিত্রশিল্পীরা অনুভব করতেন যে, প্রকৃতির সঙ্গো সংলাপের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য এই রোমান্টিকতার আবশ্যক। কেননা এর ফলে চিত্রশিল্পীরা প্রকৃতি সঙ্গো জড়িয়ে থাকত এবং নিজেদের গ্রাম্যগানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বর্ণনা করত। আধুনিক কৃত্রিমতায় ভরা সভ্যতার মধ্যে তারা কলুষিত হত না। অজানা ভূপ্রকৃতির অনুসন্ধান করত এবং আলো ও ছায়ার অলৌকিক আনন্দের উপলব্ধি করত। প্রকৃতির এরকম অজানা রহস্যের অনুসন্ধানের জন্যই হজেস্ রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চলের ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তার কাছে ভূপ্রকৃতির সমতল জায়গাগুলোকে একঘেয়ে লেগেছে, যেখানে আবার তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ উঁচুনীচু এবং উর্বর খাবর জমিগুলোর মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছেন। ঔপনিবেশিক আধিকারিকরা ভূপ্রকৃতির সেই জায়গাগুলো ভয়ানক এবং অসভ্য, হিংস্র আদিমানবের নিবাসস্থল বলে মনে করতেন। সেই জায়গায় হজেস্-এর চিত্রাঙ্কনে এই দৃশ্যগুলোকে মনোরম এবং অদ্ভুত দেখায়।

➲ উপরে দেওয়া ছবিটির দিকে তাকাও এবং রাজমহল পাহাড়টিকে কেন এতো মনোরম বলে মনে হচ্ছিল তা শনাক্ত কর।

সেই জঙ্গাল থেকে পাহাড়ি লোকেরা খাওয়ার জন্য মহুয়া (এক ধরনের ফুল) সংগ্রহ করত। বিক্রির জন্য রেশম গুটি এবং রঞ্জন সংগ্রহ করত। এছাড়া কাঠকয়লা প্রস্তুত করার জন্য লাকড়ি সংগ্রহ করত। বড়ো বড়ো গাছের নীচে জন্মানো ছোটো ছোটো গুল্ম এবং অনাবাদি জমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা দুর্বা ঘাসের সবুজ চাদরসমূহ

তাম্রপট জলরঙ এমন এক ধরনের ছবি যা তাম্রপত্রের মধ্যে অ্যাসিডের সহায়তায় একটি পরিপূর্ণ ছবি হিসাবে কাটছাঁট করে মুদ্রণ করা হয়।

চিত্র 10.9
উইলিয়াম হজেস-এর দ্বারা অঙ্কিত জঙ্গল অঞ্চলের একটি দৃশ্য।
এখানে তোমরা জঙ্গালের দ্বারা আবৃত নীচু পাহাড় এবং শিলাময় উঁচু উঁচু পর্বত দেখতে পাবে, যা বাস্তবে কোনোভাবেই 2000 ফুট-এর অধিক নয়। হজেস মাঝখানের এই দুরূহ পাহাড়টিকে দেখিয়ে তিনি সেখানকার দুর্গমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

➲ চিত্র 10.8 এবং 10.9 দেখ। এই চিত্রগুলোতে জনজাতি লোক এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে কীভাবে দেখানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।

পশুদের জন্য উপযুক্ত চারণভূমি হয়ে উঠত।

রাজমহলের পাহাড়িদের জীবন-জীবিকা যেমন-শিকারি, জুমচাষি, খাদ্য সংগ্রাহক, কাঠকয়লা প্রস্তুকারী এবং রেশমকীট পালনকারী অধিবাসীরা বন জঙ্গালের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তারা তেঁতুল গাছের মাঝামাঝি, নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের কুঁড়েঘরে বাস করত এবং আমগাছের ছায়ায় তারা বিশ্রাম নিত। তারা সমগ্র অঞ্চলকে নিজেদের জায়গা জমি বলে মনে করত। এই জমিগুলো তাদের পরিচয় বহন করত এবং বেঁচে থাকার একমাত্র ভিত্তি ছিল। তারা বহিরাগত লোকদের অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করত। তাদের সর্দার নিজেদের গোষ্ঠীদের মধ্যে একতা বজায় রাখত এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়ার মীমাংসা করত। এছাড়া অন্য জনজাতি তথা সমতলভূমির লোকদের সাথে লড়াই সংগঠিত হলে তিনি তার গোষ্ঠীদের নেতৃত্ব দিতেন।

পাহাড়গুলোর মধ্যে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে, পাহাড়ি লোকেরা প্রতিনিয়ত সমতল জমিগুলোর উপর আক্রমণ চালাত, যেখানে কৃষকরা স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করত। পাহাড়িদের দ্বারা সংগঠিত এই আক্রমণগুলো বিশেষ করে অভাব অনটনের বছরগুলোতে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে করতে হত। পাশাপাশি সমতল স্থানে বসবাসকারী লোকদের উপর এই সমস্ত আক্রমণ সংগঠিত করার মাধ্যমে পাহাড়ি লোকেরা তাদের ক্ষমতা জাহির করত। এছাড়াও বহিরাগতদের সাথে নিজেদের রাজনৈতিক সম্পর্কস্থাপন করার জন্যও এই সমস্ত আক্রমণ করা হত। সমতলে শান্তি বজায় রাখার জন্য পাহাড়ি সর্দারদেরকে নিয়মিত উপঢৌকন দিতে হত। ঠিক এইভাবে পাহাড়িদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গিরিপথগুলোকে ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়ার জন্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরাও তাদের কিছু উপঢৌকন দিত। একবার উপঢৌকন প্রদান করার পর ব্যবসায়ীরা পাহাড়িদের সর্দার থেকে সমস্ত রকমের সুরক্ষা পেত। এছাড়া ব্যবসায়ীদের তারা আশ্বস্ত করত যে, কেউই তাদের পণ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করবে না।

উপঢৌকনের বিনিময়ে এইরকম শান্তি সন্ধি/চুক্তি বেশিদিনের জন্য স্থায়ী হয়নি। এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকের দিকে ভেঙে পড়ে, যখন স্থায়ী

কৃষিক্ষেত্রের সীমানা আগ্রাসীভাবে পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ব্রিটিশরা পতিত জমি এবং বনাঞ্চলগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। ফলস্বরূপ জোতদারেরা এই সমস্ত পতিত জমি তথা অনাবাদী জমিগুলোকে ধানের ক্ষেত্রে পরিণত করে। ব্রিটিশদের জন্য স্থায়ীভাবে কৃষির বিস্তার অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল : কেননা এর ফলে তারা ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে, রপ্তানির জন্য ফসল উৎপাদন করতে পারবে, এছাড়া একটি স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সমাজ স্থাপন করতে পারবে। তারা জঙ্গালকে জনমানবশূন্য বলে মনে করত এবং বন্য মানুষদের তারা অসভ্য, বর্বর, হিংস্র, বিশৃঙ্খল এবং আদিম মনে করত, যাদেরকে শাসন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এইজন্যই তারা মনে করত যে, বনজঙ্গালগুলোতে পরিষ্কার করে সেখানে স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ চালু করতে হবে এবং বন্যমানুষদের সভ্য করতে হবে ও আয়ত্তে আনতে হবে। এই বন্যমানুষদের পশু শিকার করার অভ্যাস ছাড়িয়ে কৃষিকাজের অভ্যস্ত করাতে হবে। স্থায়ীভাবে কৃষির সম্প্রসারণ হওয়ার সাথে সাথে বনাঞ্চল এবং চারণভূমির সংকোচিত হতে থাকে। এর ফলে পাহাড়ি লোক এবং স্থায়ী কৃষক তথা গৃহস্থীদের মধ্যে তীব্র ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। পাহাড়ি লোকেরা আগের থেকেও বেশি করে স্থায়ীভাবে গ্রামগুলোর উপর হামলা চালাত এছাড়া গ্রামবাসীদের থেকে তারা খাদ্যশস্য এবং গবাদিপশু লুটপাট করে নিয়ে যেত। ঔপনিবেশিক আধিকারিকরা উত্তেজিত হয়ে এই পাহাড়িদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু আধিকারিকদের পক্ষে এই কাজ করাটা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

1770-এর দশকে ব্রিটিশ আধিকারিকেরা এই পাহাড়িদেরকে উৎখাত করার জন্য নৃশংস নীতির আশ্রয় নেয় এবং এই নীতির প্রেক্ষিতে আধিকারিকরা পাহাড়িদের ধরপাকড় ও হত্যা করতে থাকে। তারপর 1780-এর দশকে ভাগলপুরের রাজস্ব সংগ্রাহক অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' নীতির প্রস্তাব করে। পাহাড়ি সর্দারদের বার্ষিক এক ধরনের ভাতা দেওয়া হত, যার প্রতিদানে তারা তাদের লোকদের চালচলন ও আচার ব্যবহার ঠিক রাখার দায়িত্ব নিত। তাদের থেকে এইরকম আশা রাখা হয়েছিল যে, তারা নিজেদের এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং নিজেদের লোকদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অনুশাসনের মধ্যে রাখবে। কিন্তু অনেক পাহাড়ি সর্দারগণ এইরকম বার্ষিক ভাতা নিতে রাজি হয়নি। তাদের মধ্যে যারা যারা এই ভাতা নিতে রাজি হয়েছিল, তাদের অনেকেই নিজেদের সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব থেকে দায়িত্ব চ্যুত হয়েছিল। এই সর্দার বা মুখিয়ারা ঔপনিবেশিক সরকারের বেতনভোগী হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে সরকারে অধস্তন কর্মচারী তথা বেতনভোগী মোড়ল বলে মনে করা হত।

যখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচার তথা অভিযান চলছিল তখনই পাহাড়ি লোকেরা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদল থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এছাড়া বহিরাগত লোকদের সঙ্গো লড়াই চালু রাখার জন্যও তারা পাহাড়ের গভীর অঞ্চলে চলে যেত। এই জন্যই যখন 1810-11 সালের শীতের সময়ে বুকানন এই অঞ্চলের ভ্রমণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন পাহাড়ি লোকেরা বুকাননকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখত। শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচারের অভিজ্ঞতা থেকে এবং নৃশংসতাপূর্ণ দমনের স্মৃতিগুলোর কারণে তাদের মনের মধ্যে এইরকম ধারণা হয়ে রয়েছিল যে, পাহাড়িদের এলাকায় ইংরেজদের অনুপ্রবেশের ফলে কী ঘটতে

পারে। প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ লোকদের প্রতি পাহাড়িদের এইরকম মনোভাব ছিল যে, শ্বেতাঙ্গরা এমন একটি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে, যার ক্ষমতা বলে তারা পাহাড়িদের জীবন-জীবিকা এবং বেঁচে থাকার উৎসগুলোর ক্ষতিসাধন করছে। এছাড়া পাহাড়িরা তাদের নিজস্ব জঙ্গাল এবং জমিজমার উপর থেকে অধিকার হারিয়ে ফেলছে।

বাস্তবে সেই সময়ে এক নতুন বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, আর সেটা ছিল সাঁওতালদের আগমন। সাঁওতালেরা সেখানকার বন জঙ্গালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে থাকে, গাছ কাটতে থাকে, জমিকর্ষণ করে ধান এবং কার্পাস উৎপাদন করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলে সাঁওতালরা বিশাল সংখ্যায় ছুটে আসতে থাকে। যেহেতু নিচু পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে সাঁওতালরা তাদের বসতি স্থাপন করেছিল সেহেতু পাহাড়ি লোকেরা রাজমহলের আরো গভীরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পাহাড়ি লোকেরা তাদের জুমচাষের জন্য নিড়ানি ব্যবহার করত। এইজন্যই পাহাড়িরা নিড়ানিকে তাদের জীবনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে মনে করত। অপরদিকে নতুন বসতি স্থাপনকারী অথবা সাঁওতালরা লাঙলকে শক্তির প্রতীক বলে মনে করত। নিড়ানি এবং লাঙলের মধ্যেকার এই লড়াই-ঝগড়া দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল।

চিত্র 10.10
সাঁওতাল অঞ্চলে অবস্থিত একটি পার্বত্য গ্রামের চিত্র। যেটি 1856 সালের 23 ফেব্রুয়ারিতে "লন্ডন নিউজ" এ প্রকাশিত হয়।
1850 দশকের প্রথমদিকে রাজমহলের নিম্ন পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত এই গ্রামের ছবিটি ওয়ালটার সেরউইল অঙ্কন করেছিলেন। এই গ্রামটি শান্তিপূর্ণ, নিঝুম এবং মনোরম বলে প্রতীত হয়। বর্হিজগতের কোনো প্রভাব এখানে পড়েছে বলে মনে হয় না।

➲ চিত্র 10.12-এর সাথে এই সাঁওতাল গ্রাম্য ছবিটির তুলনা কর।

2.2 সাঁওতাল : অগ্রণী বসতিস্থাপনকারী

1810 সালের অন্তিমদিকে বুকানন গঞ্জুরিয়া পাহাড় অতিক্রম করে, (যেই পাহাড়টা ছিল রাজমহল পর্বতশৃঙ্গোরই একটি অংশবিশেষ) তিনি একটি গ্রামে গিয়ে পৌছায়। এমনিতে এটি ছিল একটি পুরাতন গ্রাম, কিন্তু তার আশেপাশের জমিগুলোকে সম্প্রতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল কৃষিকাজের জন্য। সেখানকার ভূদৃশ্য দেখার পর বুকানন জানতে পারেন যে, 'মানব শ্রমের যথাযথ প্রয়োগের' মাধ্যমেই এই অঞ্চলটির এত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন গঞ্জুরিয়াতে সবেমাত্র

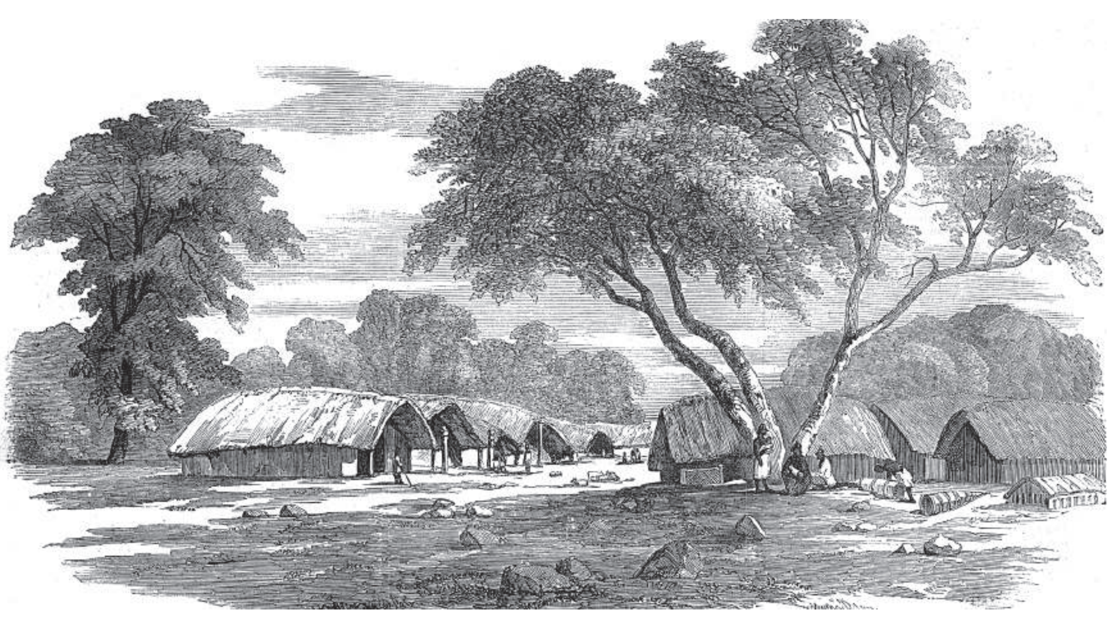

পর্যাপ্ত পরিমাণে চাষ করা হয়েছে, যার থেকে এটা বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলটিকে অনেকটা সুন্দর এলাকা হিসাবে তৈরি করা যায়। আমার মনে হয় এর সৌন্দর্যতা এবং সমৃদ্ধতাকে বিশ্বের প্রায় যে-কোনো অঞ্চলের মতোই বিকশিত করা যায়। বলা যেতে পারে, এখানকার মাটি পাথুরে হলেও কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানের ছিল এবং বুকানন এতো ভালো মানের তামাক ও সরিষা কোনো জায়গাতেই দেখেনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানতে পারেন যে, সেখানে সাঁওতালেরা কৃষিক্ষেত্রের সীমানা অনেক প্রসারিত করেছিল। সাঁওতালেরা এই অঞ্চলে 1800 সালের কাছাকাছি সময়ে এসেছিল। তারা পাহাড়ের নিম্নঢালের দিকে বসবাসকারী পাহাড়ি লোকেদের বিতাড়িত করে দেয় এবং নিজেরা জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানকার জমিগুলোর মধ্যে বসতি স্থাপন করে।

সাঁওতাল লোকেরা কীভাবে রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চলে পৌঁছায়? সাঁওতালরা 1780-এর দশকের কাছাকাছি সময় থেকে বাংলায় আসতে শুরু করে। জমিদার লোকেরা তাদেরকে অনুর্বর জমিচাষের উপযুক্ত করার জন্য এবং কৃষির বিস্তারের জন্য ভাড়া করে আনতেন। এছাড়া ব্রিটিশ আধিকারিকরা তাদেরকে জঙ্গল মহলে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানায়। ব্রিটিশরা যখন পাহাড়ি লোকদের নিজেদের বশে আনতে এবং তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কৃষিকাজ করাতে ব্যর্থ হয়, ঠিক তখনই ব্রিটিশদের নজর সাঁওতালদের উপর পড়ে। পাহাড়ি লোকেরা জঙ্গল কাটতে অস্বীকার করেও লাঙ্গলে হাত লাগানোর বিরোধিতা করে। এছাড়া পাহাড়িরা অনবরত তাদের উচ্ছৃঙ্খলা চালিয়ে যেতে থাকে। এর বিপরীত দিকে, সাঁওতালদের আদর্শ বসতি স্থাপনকারী বলে মনে হয়। কেননা তারা উৎসাহের সহিত জঙ্গালগুলোকে পরিষ্কার করে এবং জমিতে জোর কদমে চাষবাস শুরু করে।

সাঁওতালদেরকে জমি প্রদান করে রাজমহলের পাদদেশে বসতি স্থাপন করার জন্য রাজি করানো হয়। 1832 সালের দিকে, জমির একটি বৃহৎ এলাকাকে দামিন-ই-কোহ এর সীমানা হিসাবে নির্ধারিত করা হয়। এই এলাকাটিকে সাঁওতালদের বলে ঘোষণা করা হয়। সাঁওতালরা এই এলাকার মধ্যেই বাস করত এবং লাঙ্গালের মাধ্যমে কৃষিকাজ করত। এই চাষবাসের মাধ্যমে তারা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়। জমিদারদের অনুদানকৃত জমির অন্তত এক-দশমাংশ এলাকাকে পরিষ্কার করে সাঁওতালদের নির্ধারিত প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে জমিটিকে কৃষির উপযুক্ত করতে হত। এই অঞ্চলটিকে জরিপ করে নক্সা তথা মানচিত্র তৈরি করা হত। জরিপ করার সময়ে খুঁটি গেড়ে এই জঙ্গলের চারিদিকে সীমানা নির্ধারিত করা হত এবং এর সমতল অঞ্চলটিকে স্থায়ী কৃষির জগৎ থেকে এবং পাহাড়ি লোকেদের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আলাদা করা হয়েছিল।

দামিন-ই-কোহ-এর সীমানা নির্ধারণের পর সাঁওতালদের বাসস্থান খুব দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 1838 সালের দিকে সাঁওতালদের গ্রামের সংখ্যা যেখানে 40টি ছিল। 1851 সালে এই গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 1,473টি। ঠিক একই সময়ে সাঁওতালদের জনসংখ্যা মাত্র 3000 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 82,000 হাজারেরও বেশি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষিকাজের প্রসার হওয়ার সাথে সাথে কোম্পানির অর্থভাণ্ডারে রাজস্বের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতালদের কল্পকাহিনি এবং গাথা কবিতার দীর্ঘ ইতিহাসকে

চিত্র 10.11
সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিধু মাঝির।

বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, সাঁওতাল লোকেরা নিজেদের জন্য বসবাসযোগ্য জায়গার খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখানে দামিন-ই-কোহ পর্যন্ত এসে মনে হয়েছিল যে, সাঁওতালদের যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে।

যখন সাঁওতালরা রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে, তখন পাহাড়ি লোকেরা তার প্রতিরোধ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাহাড়িদের পাহাড়ের আরো গভীরে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। তাদের নিচু পাহাড় তথা উপত্যকার নিচের দিকে আসতে বাধা দেওয়া হয় এবং তাদেরকে উঁচু শিলাময় পাহাড় ও অত্যাধিক অনুর্বর অঞ্চলে তথা অভ্যন্তরীণ শুষ্ক অঞ্চল পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। এর ফলে তাদের সামাজিক অবস্থা তথা জীবনযাত্রার উপর গভীরভাবে প্রভাব পড়ে। যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে তারা নিঃস্ব তথা অতি দরিদ্র হয়ে যায়। জুমচাষ নতুন নতুন জমির খোঁজ করতে এবং জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করত। তখন সর্বাধিক উর্বর জমি তাদের জন্য দুঃস্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। কেননা দামিন-ই-কোহ-এর অংশ ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এইজন্যই পাহাড়ি লোকেরা নিজস্ব চাষের পদ্ধতিকে (জুমচাষ) পরবর্তীতে সফলতা পূর্বক ধরে রাখতে পারেনি। যখন এই অঞ্চলের বনজঙ্গল কৃষিকাজের জন্য পরিষ্কার করা

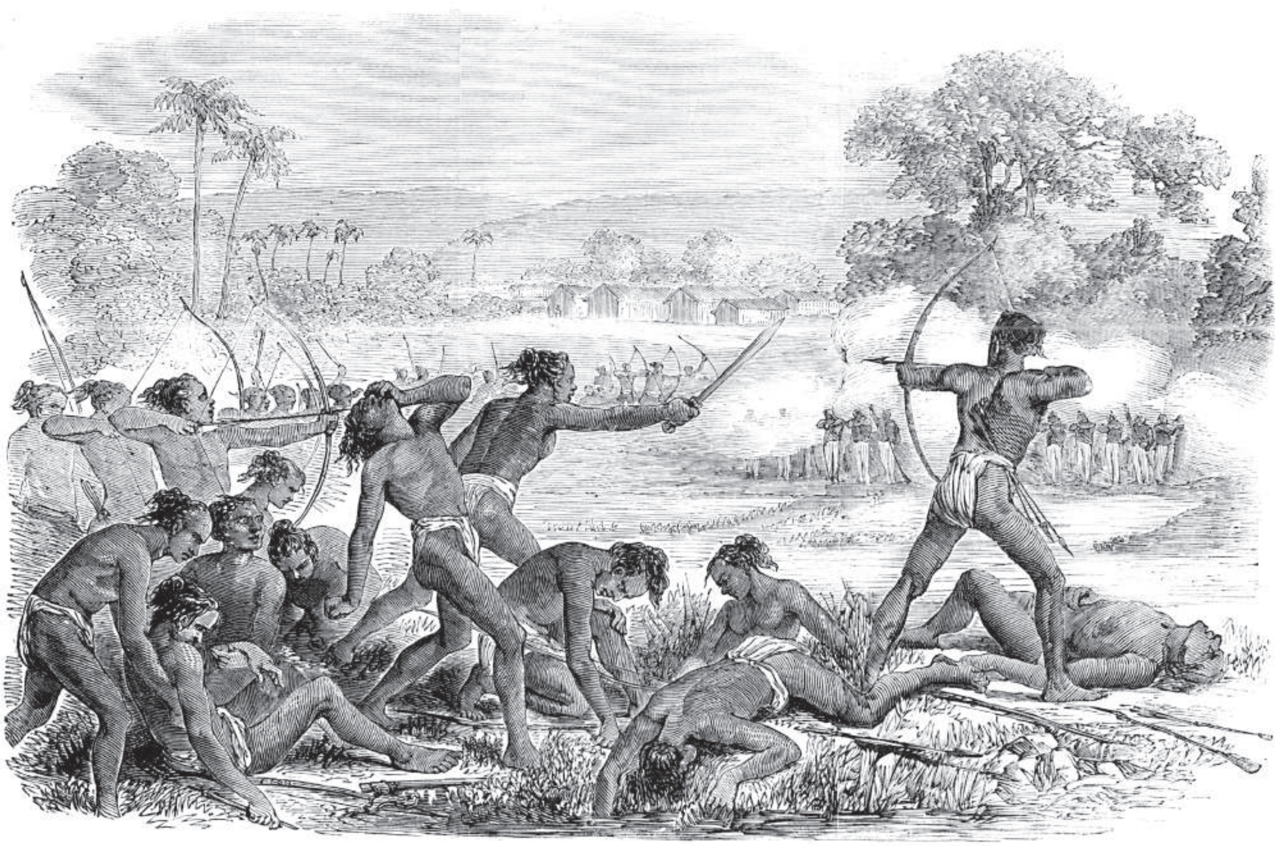

চিত্র 10.12
1856 সালের 23 ফেব্রুয়ারি "ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ"-এ প্রকাশিত ব্রিটিশ রাজের সিপাহীদের সাথে সাঁওতালদের যুদ্ধরত একটি ছবি।
এই বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালদের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব পুরোপুরি বদলে যায়, সেই গ্রামগুলোকে আগে নীরব, শান্ত বলে মনে হত (চিত্র 10.10) এখন সেইগুলো হিংসাত্মক এবং বর্বরতাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

➲ কল্পনা কর যে, তুমি ইলাস্টেটেড লন্ডন নিউজ' এর একজন পাঠক। চিত্র 10.12, 10.13 এবং 10.14-এর মধ্যে বর্ণিত চিত্রগুলো সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে? এই ছবিগুলো থেকে তোমার মনে সাঁওতালদের কোন্ চিত্রটি ফুটে ওঠে?

চিত্র 10.13

1856 সালের 23 ফেব্রুয়ারিতে 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ'-এ প্রকাশিত জ্বলন্ত সাঁওতাল গ্রামের দৃশ্যটি প্রকাশিত হয়।

বিদ্রোহটিকে দমন করার পর এলাকার মধ্যে তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়া সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আটক করা হয় এবং গ্রামগুলোতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। জ্বলন্ত সাঁওতাল গ্রামের ছবিটি ইংল্যান্ডে সাধারণত জনতাদের দেখানো হয়। এটা প্রমাণ করার জন্য যে, ব্রিটিশরা কতটুকু শক্তিশালী এবং তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করারও ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেওয়ার যোগ্যতাকে প্রদর্শন করা হিসাবে।

চিত্র 10.14

সাঁওতাল কারাবাসীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এইরকম একটি ছবি 1856 সালে ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ প্রকাশিত হয়।

লক্ষ কর এইরকম চিত্রগুলো কী ধরনের রাজনৈতিক বার্তা প্রদান করে। তোমরা ছবিটির মাঝখানে দেখতে পাবে যে, ব্রিটিশ আধিকারিকরা বিজয় উল্লাসে মত্ত হয়ে, কীভাবে হাতির ওপর চড়ে আসছে। ঘোড়ার ওপর চড়ে একজন ব্রিটিশ আধিকারিক হুঁকোতে সুখটান দিচ্ছে। এই ছবি এটা নির্দেশ করছে যে, সঙ্কটপূর্ণ সময়ের অবসান হয়েছে এবং বিদ্রোহকে দমন করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের এখন শিকলের মাধ্যমে বেঁধে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিপাহিরা বিদ্রোহীদের চারিপার্শ্বে ঘেরাও করে আছে।

উৎস 3

সাঁওতালদের সম্পর্কে বুকাননের মন্তব্য

বুকানন লিখেছেন :

নতুন জমি পরিষ্কার করার কাজে তারা খুব দক্ষ, কিন্তু জীবনযাত্রা নিম্নমানের তাদের কুঁড়েঘরে চারদিকে কোনো বেড়া নেই এবং ঘরের দেওয়াল ছোটো ছোটো বাঁশ বা কাঠকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে খাড়াভাবে রেখে নির্মাণ করা হয়, যার উপর কাঁদার প্রলেপ দেওয়া হয়। কুঁড়েঘরগুলো খুব ছোটো এবং অপরিচ্ছন্ন, ঘরের চাদ সমতল এবং ঘরগুলোতে খিলান প্রায় নেই বললেই চলে।

উৎস 4

কদুয়ার নিকটবর্তী শিলাস্তূপ

বুকাননের পত্রিকা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যে ভরপুর :

প্রায় এক মাইল অতিক্রম করার পর (আমি) একটি স্তরহীন পাথরের পাদদেশ পৌঁছলাম। এটি একটি ছোটো দানাদার গ্রানাইট ... যাতে রয়েছে রক্তিম ফেল্ডস্পার স্ফটিক এবং কালো অভ্র। ... সেখান থেকে আধ মাইলেরও বেশি দূরে অন্য একটি শিলায় এসে পৌঁছালাম, যা স্তরহীন এবং এতে খুব সূক্ষ্মদানাযুক্ত গ্রানাইটের সাথে হলুদ রঙের ফেলস্পার, সাদা স্ফটিক এবং কালো রঙের অভ্র রয়েছে।

হয়, তখন পাহাড়ি অঞ্চলে শিকারিদেরও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিপরীত দিকে, সাঁওতালেরা পূর্বের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং বাজারের জন্য বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের চাষবাস করতে থাকে। এছাড়া সাঁওতালদের সাথে বণিক এবং মহাজনদের ও লেনদেন চলতে থাকে।

সে যাইহোক সাঁওতালরা অতিশীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে, তারা যে জমির মধ্যে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন, সেই জমিগুলো তাদের হাত থকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাঁওতালরা যে জমিগুলোকে পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু করেছিল, সেই জমিগুলোর উপর ব্রিটিশ সরকার অধিকমাত্রায় কর আরোপ করে। সুদখোর মহাজনেরা (দিকু) অনেক উঁচু দরে তাদের কাছ থেকে সুদের হার ধার্য করে এবং তারা যদি এই ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হতো, তবে মহাজনেরা তাদের জমি দখল করে নিত। এছাড়া জমিদার লোকেরা দামিন-ই-কোহ অঞ্চলের উপর তাদের শাসন চাপিয়ে দিত।

1850-এর দশকের দিকে সাঁওতালেরা উপলব্ধি করেছিল যে, নিজেদের জন্য একটি আদর্শ জায়গার নির্মাণ করতে হলে জমিদার, মহাজন এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করতে হবে। যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য একটি আদর্শ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে। যেখানে তারাই শাসনকার্য চালাতে পারবে। 1855-56 সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ভাগলপুর ও বীরভূম জেলা থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার (5,500) বর্গমাইল দূরবর্তী অঞ্চলে সাঁওতাল পরগণা তৈরি হয়। ঔপনিবেশিক সরকার চিন্তা করেছিল যে, সাঁওতালদের জন্য একটি নতুন এলাকা স্থাপন এবং কিছু বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাঁওতালদের সাথে বোঝাপড়া করা যেতে পারে।

2.3 বুকাননের বিবরণ

আমরা বুকাননের বিবরণকে ইতিহাসের উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছি। তবে তাঁর লিখিত বিবরণ পড়ার সময় আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি কেবল প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যকে ভালোবেসে এবং অজানাকে খুঁজে বের করার জন্য ভ্রমণ করতেন না। তিনি জরিপকারী, মানচিত্রকার পালকিবাহক, কুলিদের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে সর্বত্র যাত্রা করতেন। তাঁর ভ্রমণ ব্যয় বহন করত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কারণ তাদের সেইসব তথ্যের খুব প্রয়োজন ছিল যেগুলো বুকানন সংগ্রহ করতেন। বুকাননের কী সন্ধান করতে হবে এবং কী লিপিবদ্ধ করতে হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ছিল। তিনি যখনই তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কোনো গ্রামে যেতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁকে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হত।

কোম্পানি নিজের শক্তি বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস সন্ধানে এবং এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তারা প্রাকৃতিক ভূভাগও রাজস্বের উৎস সন্ধান শুরু

উৎস 5

জঙ্গাল পরিষ্কার এবং স্থায়ী কৃষি সম্পর্কে

রাজমহল পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলে একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় বুকানন লিখেছেন :

> এই প্রদেশের দৃশ্য খুবই মনোরম এখানাকার চাষাবাদ বিশেষ করে সংকীর্ণ উপত্যাকায় ধান চাষ পরিষ্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাছ গাছালি, পাথুরে পাহাড় এই স্থানের সৌন্দর্যতাকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। এখানে যে জিনিসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা হল এলাকটির অগ্রগতি ও উন্নত চাষাবাদ, যার জন্য প্রদেশটি অত্যন্ত উপযুক্ত। এখানে তসর (তসর রেশম কীট) ও লাক্ষার জন্য চাহিদা অনুসারে আশান ও পলাশের বৃক্ষরোপণ করা যায়, বাকি বনাঞ্চল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করা যায়, এবং যে অংশটি চাষের উপযুক্ত নয়, সেখানে পালমিরা গাছ এবং মহুয়ার গাছ লাগানো যায়।

➲ আলোচনা করো...

উন্নয়ন সম্পর্কে বুকাননের চিন্তাধারা আলোচনা কর। উদ্ধৃতাংশের উল্লেখ করে তোমার যুক্তির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দাও। তুমি যদি পাহাড়ের অধিবাসী হতে তবে এই ধারণা সম্পর্কে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হত?

করে, আবিষ্কারের জন্য যাত্রা সংগঠিত করে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের ভূতাত্ত্বিক ও ভূগোলবিদ, উদ্ভিদবিদ ও চিকিৎসাবিদ্যার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে। নিঃসন্দেহে বুকানন ছিলেন একজন অসাধারণ পর্যবেক্ষক। বুকানন যেখানেই গেছেন, সেখানে তিনি পাথর, শিলার বিভিন্ন স্তরও ভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বাণিজ্যিকভাবে মূল্যবান খনিজ পদার্থ ও পাথরের অনুসন্ধান করেন, তিনি লৌহ আকরিক, অভ্র, গ্রানাইট এবং সল্টপেটারের সন্ধান করে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সতর্কতার সাথে লবণ তৈরি এবং আকরিক লোহা থেকে লোহা তৈরির স্থানীয় পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন।

কোনো অঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার সময় বুকানন শুধুমাত্র সেখানকার ভৌগোলিক বিবরণই দেননি, কীভাবে এবং কী পরিবর্তন সাধন করে তাকে আরো উৎপাদনশীল করা যায়, কোনো ধরনের শস্য বেশি ফলনশীল হবে, কোন্ ধরনের গাছ কেটে, কোন্ গাছের চাষ লাভজনক হবে — তা বুকাননের লেখনীতে ফুটে ওঠে। আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং অগ্রাধিকারগুলো স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে পৃথক ছিল : কোম্পানির বাণিজ্যিক উন্নতি এবং অগ্রগতির বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মূল্যায়ন করতেন। তিনি বনবাসীদের স্বাভাবিকভাবেই জীবনধারার সমালোচনা করেন এবং জঙ্গালকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করতে চান।

3. গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহ বোম্বাই দাক্ষিণাত্য

ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষক ও জমিদার এবং রাজমহল পাহাড়ের পাহাড়ি ও সাঁওতালদের জীবন কী ধরনের পরিবর্তন এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা পড়েছ। এসো চলো এবার আমরা পশ্চিম ভারত এবং পরবর্তী সময়ে বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের গ্রামাঞ্চলে কী ঘটেছিল তা দেখি।

উৎস 6

সেদিন সুপায় যা ঘটেছিল

1875 সালের 16 মে পুনার জেলা শাসক পুলিশ কমিশনারকে লিখেছেন :

15 মে শনিবার সুপায় আসার পর আমি বিশৃঙ্খলার কথা জানতে পারি।

এক মহাজনের বাড়ি পুরোপুরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, প্রায় এক ডজন ঘর জোর জবরদস্তি ভেঙে দেওয়া হয় এবং ঘরের ভেতরে রাখা সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আয়ব্যয়ের কাগজপত্র, বন্ড, শস্য দেশীয় কাপড় রাস্তায় এনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ছাইয়ের স্তূপগুলো এখনও দেখা যায়।

মুখ্য পুলিশ কনস্টেবল 50 জনকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় দুহাজার টাকার মূল্যের চুরি করা সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। আনুমানিক 25,000 হাজার টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। যদি মহাজনেরা দাবি করেছে তাদের ক্ষতির পরিমাণ 1 লক্ষ টাকারও বেশি।

দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন

মহাজন (সাউকার) তাদের বলা হত যারা টাকা ধার দিত এবং সাথে সাথে ব্যবসাও করত।

➲ একজন লেখকের ব্যবহৃত ভাষা এবং শব্দাবলি থেকে তার পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 7 নং উৎসটি যত্নসহকারে পড়ো এবং সেই শব্দগুলো চয়ন কর যা লেখকের পক্ষপাতমূলত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা দেয়। একজন রায়ত কীভাবে উক্ত পরিস্থিতির বর্ণনা করতেন তা আলোচনা কর।

এই ধরনের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানার একটি উপায় হল কৃষক বিদ্রোহের দিকে মনোনিবেশ করা। এই ধরনের চরম সময়ে বিদ্রোহীরা তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করে, তারা যেটা অন্যায় বলে মনে করে এবং নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কারণ মনে করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। যদি আমরা তাদের ক্ষোভের কারণ জানার চেষ্টা করি, তাহলে তাদের জীবন এবং বঞ্চনার অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি যা আমাদের অজানা বিদ্রোহগুলো থেকে এমন তথ্য জানা যায় যা ইতিহাসবিদরা ইতিহাস নির্মাণের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন এবং আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে সচেস্ট শাসক কর্তৃপক্ষ কেবল বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করে না, তারা এর কারণগুলো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে এবং বোঝার চেষ্টা করে যাতে সঠিক নীতি নির্ধারণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এইসব অনুসন্ধানের ফলে এমন প্রামাণিক তথ্যের সৃষ্টি হয় যা ঐতিহাসিকরা গবেষণা করতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকেরা মহাজন এবং শস্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 1875 খ্রি. দাক্ষিণাত্যে এমনই একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 1875 সালে ডেক্কানে এই ধরনের বিদ্রোহ ঘটেছিল।

3.1 হিসাবের বই-এ অগ্নি সংযোগ

এই আন্দোলনটি পুনা জেলার (বর্তমানে পুনে) সুদা নামক একটি বড়ো গ্রামে শুরু হয়। এটি এমন একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল যেখানে বহু ব্যবসায়ী এবং মহাজনরা বসবাস করত। 1875 খ্রিস্টাব্দের 12 মে আশেপাশের গ্রামীণ অঞ্চল থেকে রায়তেরা একত্রিত হয়ে তাদের জমা খরচের খাতা এবং ঋণপত্র হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে দোকানদারদের উপর আক্রমণ করেছিল। তারা খাতাগুলো পুড়িয়ে দেয়, শস্যের দোকান লুট করে এবং মহাজনদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

উৎস 7

একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

রায়ত এবং মহাজন শিরোনামের নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি (6 জুন 1876) নেটিভ ওপিনিয়ন নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং রিপোর্ট অফ্ দ্যা নেটিভ নিউজ পেপার্স অফ্ বোম্বে-তে যথাযথ উদ্ধৃত করা হয়েছিল :

তারা (রায়তরা) গ্রামের সীমান্তে চর নিয়োগ করে সরকারি অফিসারদের আগমন বার্তা দুষ্কৃতিদের কাছে আগাম পৌঁছে দিত। এরপরে তারা সম্মিলিতভাবে তাদের পাওনাদারদের ঘরে যায় এবং তাদের কাছ থেকে ঋণপত্র এবং অন্যান্য নথিপত্র দাবি করে এবং তা দিতে অস্বীকার করলে ঋণদাতাদের উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। যদি ঘটনার সময় কোনো সরকারি আধিকারিককে সেই গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যেত তখন গুপ্তচরদের সতর্কবার্তা অনুযায়ী বিদ্রোহীরা আত্মরক্ষার্থে সময় থাকতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।

পুনা থেকে এই বিদ্রোহ আহমেদনগরে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী দুই মাসে আরো 6,500 বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই বিদ্রোহ ছড়ায়। ত্রিশটিরও অধিক গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সর্বত্রই বিদ্রোহের স্বরূপ ছিল একইরকম, মহাজনদের আক্রমণ করা হয়, হিসেবের বই পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং ঋণপত্র ধ্বংস করা হয়। কৃষকদের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে মহাজনরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জিনিসপত্র ও সম্পত্তি সেখানে পেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ব্রিটিশ আধিকারিকদের চোখে 1857 সালের আতঙ্ক ফুটে ওঠে (একাদশ অধ্যায় দেখো)। বিদ্রোহী কৃষকদের ভয় দেখানোর জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয়। দ্রুত সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠানো হয়, 951 জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং এদের মধ্যে অনেকেই দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ আনতে বেশ কয়েকমাস সময় লাগে।

ঋণপত্র এবং দস্তাবেজ কেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল? এই বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এর থেকে আমরা দাক্ষিণাত্যের গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার ঔপনিবেশিক শাসনে কৃষি বা ভূমি সম্পর্কিত পরিবর্তন সম্পর্কে কী জানতে পারি? এসো আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে হওয়া পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকাই।

3.2 একটি নতুন রাজস্ব পদ্ধতি

বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার ঘটার সাথে সাথে সেখানে রাজস্ব সংগ্রহের নতুন পদ্ধতিও প্রচলিত হয়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বাংলার বাইরে খুব কম জায়গাতেই চালু করা হয়েছিল।

এমনটা কেন ঘটেছিল? এর একটি কারণ ছিল, 1810 সালের পর কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পায়, যার ফলে বাংলার জমিদারদের আয়ত্ত বাড়ে। যেহেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল, তাই উপনিবেশিক সরকার এই বর্ধিত আয়ের কোনো অংশ দাবি করতে পারে নি। ঔপনিবেশিক সরকার জমির আয়কে সর্বাধিক করার উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল কারণ তারা নিজেদের আয়ের উৎস বাড়াতে চেয়েছিল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলোতে অস্থায়ী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করা হয়।

এর অন্যান্য কারণও ছিল। আধিকারিকরা যখন নীতিমালা তৈরি করেন, তখন যেসব অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর সাথে তারা গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন সেইগুলোর দ্বারাই প্রভাবিত হন। 1820 দশক পর্যন্ত ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো। ঔপনিবেশিক আধিকারিকরা তাদের কলেজ জীবনে রিকার্ডোর তত্ত্বের অধ্যয়ন করতেন। 1820 এর দশকে মহারাষ্ট্রে যখন ব্রিটিশ আধিকারিকরা প্রাথমিক বন্দোবস্তের শর্তাবলি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন তারা তাঁর কিছু তত্ত্ব অনুসারে কাজ করেছিল।

উপস্বত্বজীবি এমন একটি শব্দ যেটি যারা সম্পত্তি থেকে ভাড়া আদায়ের মাধ্যমে জীবনযাপন করে, তাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে, ভূস্বামীদের ওই সময়ে প্রচলিত "গড় ভাড়া" বা রাজস্বই শুধু দাবি করা উচিত। জমি থেকে 'গড় ভাড়ার' অতিরিক্ত প্রাপ্তি ছিল উদ্বৃত্ত আয়, যার ওপর সরকার রাজস্ব আদায় করতে পারে। যদি কর আদায় না করা হত, তাহলে কৃষকেরা বর্গাদার (rentier) হয়ে যাবে এবং তাদের উদ্বৃত্ত আয় দ্বারা

জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অর্থ বিনিয়োগ করবে না। ভারতের অনেক ব্রিটিশ আধিকারিক ভেবেছিলেন যে বাংলার ইতিহাস রিকার্ডোর তত্ত্বকে সত্য প্রমাণিত করে। এটা মনে করা হত যে, জমিদাররা উপস্বত্বজীবিতে (rentiers) পরিণত হয়েছে, তাঁরা তাদের জমি ইজারা দিয়ে দেন এবং ভাড়া আদায়ের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তাই ব্রিটিশ আধিকারিকদের মনে হয়েছিল, একটি ভিন্ন রাজস্ব পদ্ধতির ব্যবস্থা করা দরকার।

বোম্বাই দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় প্রচলিত নিয়মের বিপরীতে, এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ রায়তদের সাথে স্থির করা হত। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জমি থেকে গড় আয় অনুমান করা হত, রায়তের রাজস্ব প্রদানের ক্ষমতা নির্ধারণ করা হত এবং এর একটি অংশ সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার জন্য স্থির করা হত, প্রতি 30 বছর পর পুনরায় জমি জরিপ করা হত এবং রাজস্বের হার বৃদ্ধি করা হত। ফলে রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট বা স্থির থাকত না।

3.3 রাজস্বের দাবি এবং কৃষকদের ঋণ

বোম্বাই দাক্ষিণাত্যে 1820-এর দশকে প্রথম রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হয়। যে পরিমাণ রাজস্বের দাবি করা হয়েছিল তা এত বেশি ছিল যে অনেক জায়গায় কৃষকরা তাদের গ্রাম ছেড়ে দিয়ে নতুন অঞ্চলে চলে যায়। যেসব এলাকায় জমি অনুন্নত ছিল এবং বৃষ্টিপাত কম বা বেশি হত, সেখানে সমস্যাটি ছিল তীব্রতর। যখন বৃষ্টিপাতের অভাব বা ফসল খারাপ হত তখন কৃষকদের পক্ষে রাজস্ব পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তবুও, রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকা সংগ্রহকারীরা তাদের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের উচ্চ আধিকারিকদের সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই তারা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে রাজস্ব আদায় করার চেষ্টা করতেন। যদি কখনো কৃষক রাজস্ব দিতে না পারত, তাহলে তার ফসল বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হত এবং সমস্ত গ্রামবাসীদের উপর জরিমানা আরোপ করা হত।

1830-এর দশকের মধ্যে সমস্যাটি আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে। 1832 সালের পর কৃষি পণ্যের দাম ব্যাপকহারে হ্রাস পায় এবং প্রায় দেড় দশক ধরে এই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। এর ফলে কৃষকদের আয় আরো কমে যায়। একই সময়ে 1832-34 সালে গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যে এক-তৃতীয়াংশ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। জনসংখ্যার অর্ধেক লোক মারা যায়। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের কাছেও এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খাদ্য মজুত ছিল না। রাজস্বের বকেয়া পরিমাণ আকাশছোঁয়া হয়ে গিয়েছিল।

কৃষকরা এত বছর কীভাবে বেঁচেছিলেন? তারা কীভাবে রাজস্ব পরিশোধ করেছিল, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কীভাবে সংগ্রহ করেছিল, তারা লাঙ্গাল এবং গবাদি পশু কীভাবে ক্রয় করেছিল এবং তাদের সন্তানদের কীভাবে বিয়ে দিয়েছিল?

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাধ্য হয়েই কৃষকদের ঋণ নিতে হয়েছিল। মহাজন থেকে ঋণ নেওয়া ব্যতিত রাজস্ব পরিশোধ করায় তাদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু একবার ঋণ নিলে রায়তের পক্ষে তা পরিশোধ করা খুব কঠিন ছিল। ঋণের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে এবং ঋণ পরিশোধ করতে না

পারায় মহাজনদের উপর কৃষকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে এবং তাদের উৎপাদন ব্যয় মেটাতেও ঋণ নিতে হত। 1840-এর দশকের মধ্যে আধিকারিকরাও প্রমাণ পেয়েছিল যে ঋণগ্রস্থ কৃষকের সংখ্যা উদ্বেগজনক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

1840-এর দশকের মাঝামাঝি এক বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা গেল। অনেক ব্রিটিশ আধিকারিক অনুভব করতে পেরেছিলেন যে 1820-এর দশকের রাজস্ব বন্দোবস্ত খুব কঠোর ছিল। যতটুকু রাজস্বের দাবি করা হয়েছিল তা ছিল অত্যধিক, ব্যবস্থা ছিল অনমনীয় এবং কৃষি অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সুতরাং কৃষিকাজ সম্প্রসারণে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। 1845 সালের পর কৃষিপণ্যের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষকরা তাদের আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, এর জন্য তারা নতুন নতুন অঞ্চলে যাওয়া শুরু করে এবং চারণভূমিকে চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত করে। তবে কৃষিকাজ সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের আরো লাঙ্গাল এবং গবাদি পশুর প্রয়োজন হয়। বীজ এবং জমি কেনার জন্য তাদের অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। এইসব কিছুর জন্য ঋণের প্রয়োজনে তারা আবার মহাজনের দারস্থ হয়।

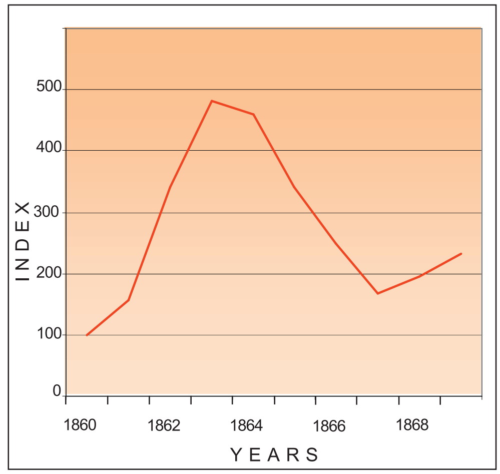

চিত্র 10.15
তুলো চাষের উন্নতি
এই রেখাচিত্র অঙ্কিত লাইনটি কার্পাসের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

3.4 কার্পাস চাষে উন্নতি

1860-এর দশকের আগে, ব্রিটেনের কাঁচামাল হিসেবে কার্পাস আমদানির তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকা থেকে আসত। ব্রিটেনের সুতিবস্ত্র নির্মাতারা দীর্ঘদিন ধরে তুলা আমদানির ক্ষেত্রে আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতার দরুন উদ্বিগ্ন থাকত। যদি তুলোর এই উৎস থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যায় তবে কী হবে? এই ব্যাপারে বিচলিত হয়ে তারা তুলো আমদানির বিকল্প উৎসের সন্ধান করেছিল।

চিত্র 10.16
তুলো পরিবহণকারী গরুর গাড়ি একটি বটগাছের নীচে বিশ্রামরত
ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ,
13 ডিসেম্বর 1862

1857 সালে ব্রিটেনে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 1859 সালে ম্যানচেস্টার কটন কোম্পানি গঠিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল "বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে কার্পাস উৎপাদনে উৎসাহিত করা যাতে তাদের কোম্পানি বিকশিত হয়।" আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যদি কার্পাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ভারতকে তুলো সরবরাহকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা ল্যঙ্কাশায়ারে তুলো সরবরাহ করতে পারবে। ভারতের মাটি এবং জলবায়ু দুটোই কার্পাস চাষের উপযোগী এবং এখানে সস্তায় শ্রমও উপলব্ধ।

1861 সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেনে সুতো ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা থেকে কাঁচা তুলোর আমদানি স্বাভাবিকের চেয়ে তিন শতাংশ কমে যায়, 1861 সালে যেখানে 20 লাখ গাঁট (প্রতিটি গাঁট 400 পাউন্ড) কাঁচা তুলো আমদানি হয় সেখানে 1862 সালে কেবলমাত্র 55 হাজার গাঁটই আমদানি হয়েছিল। ব্রিটেনে তুলোর রপ্তানি বাড়ানোর জন্য ভারত এবং অন্যান্য জায়গায় বার্তা প্রেরণ করা হয়। বোম্বেতে, তুলোর ব্যবসায়ীরা তুলো চাষকে উৎসাহিত করতে তুলো উৎপাদনকারী জেলাগুলো পরিদর্শন করতে গিয়েছিল। তুলোর দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে (10.15 নং চিত্র দেখো) বোম্বাইয়ের তুলো ব্যবসায়ীরা ব্রিটেনের চাহিদা মেটাতে অধিক তুলো মজুত করার চেষ্টা করেছিল। এর জন্য তারা শহুরে সাহুকারদের অগ্রিম টাকা দিত। সাহুকারদের হাত থেকে সেই অর্থ গ্রামীণ মহাজনদের হাতে যায়, যারা কৃষকদের মাধ্যমে অধিক তুলো

➲ 10.17 নং চিত্রের তিনটি ভাগ রয়েছে যেখানে তুলো পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যম চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্রে তুলোর ওজনের ভারে ন্যুব্জ বলদ, রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরখণ্ড, নৌকায় বিশাল বড়ো বড়ো তুলোর গাঁট রয়েছে। শিল্পী এই চিত্রগুলোর মাধ্যমে কী বোঝাতে বা দেখাতে চেয়েছেন?

চিত্র 10.17
রেলপথ স্থাপনের পূর্বে তুলোর পরিবহণ ইলাসট্রেট লন্ডন নিউজ-এ, 20 এপ্রিল 1861 খ্রি. প্রকাশিত চিত্র
আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় যখন আমেরিকা থেকে তুলোর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ব্রিটেন আশা করেছিল যে ভারত, ব্রিটিশ শিল্প কারখানাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় তুলোর যোগান দেবে। এর জন্য তুলোর মান পরীক্ষা করা, উৎপাদনও বিপণনের পদ্ধতিগুলো অধ্যয়ন করা শুরু হয়। এই সম্পর্কে ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজে ব্রিটেনের আগ্রহ প্রতিফলিত হয়।

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়। যখন বাজারে তেজিভাব আসে তখন সহজেই ঋণ দেওয়া যায় কারণ ঋণদাতা তার ঋণের অর্থ ফেরৎ পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে।

এই অগ্রগতি দাক্ষিণাত্যের গ্রামাঞ্চলে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। দাক্ষিণাত্যের গ্রামগুলোতে রায়তরা হঠাৎ প্রচুর ঋণ পেতে শুরু করে। তুলো উৎপাদনের জন্য প্রতি একর জমির ক্ষেত্রে 100 টাকা অগ্রিম দেওয়া হত। সাউকাররা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার জন্য সম্মত হত।

আমেরিকায় বিশৃঙ্খল অবস্থা চলাকালীন বোম্বেও দাক্ষিণাত্যে তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। 1860 থেকে 1864 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুলো উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। 1862 সাল নাগাদ বৃটেনে রপ্তানিকৃত প্রায় 90 শতাংশ তুলোই ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো হত।

তবে ওই সময়ে তুলো উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তুলো উৎপাদকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। কিছু ধনী তুলো চাষী মুনাফা লাভ করতে পারলেও, অধিকাংশ তুলাচাষীই অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

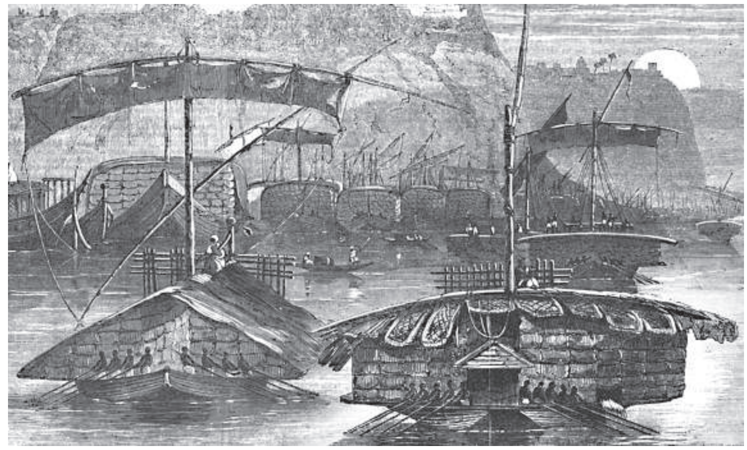

চিত্র 10.18
মির্জাপুর থেকে গঙ্গানদীর রাস্তায় তুলোর গাঁট বহনকারী নৌকার বহর ইলাসস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ, 13 ডিসেম্বর 1862 খ্রি. প্রকাশিত চিত্র।
রেল যোগাযোগ শুরু হওয়ার আগে, মির্জাপুর শহর ছিল দাক্ষিণাত্য থেকে আনা কার্পাসের সংগ্রহ কেন্দ্র।

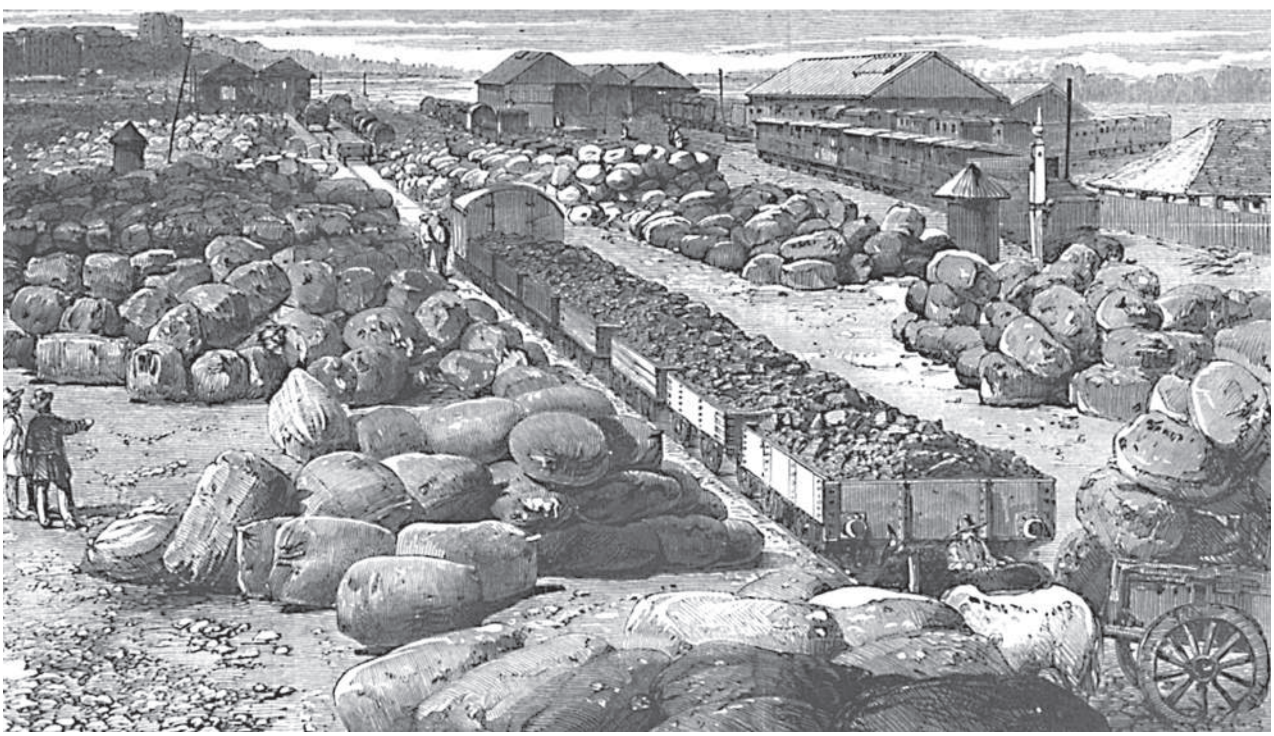

চিত্র 10.19
গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের বোম্বে টার্মিনালে তুলোর গাঁট পড়ে রয়েছে, এগুলোকে জাহাজে ইংল্যান্ডে পাঠানো হবে। ইলস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ, 23 আগস্ট 1862 খ্রি. প্রকাশিত চিত্র।
ভারতে রেল আসার পর কার্পাসের গাঁট শুধু গরুর গাড়ি বা নৌকায় নয়, রেলপথেও পরিবহণ করা শুরু হয়। নদীপথে যাতায়াত ধীরে ধীরে কমে যায়। তবে পরিবহণের পুরানো পদ্ধতিগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। চিত্রে দেখা যাচ্ছে ডানপাশের সামনের দিকে তুলো বোঝাই গরুর গাড়িটি রেলগাড়ি থেকে বন্দরে তুলোর গাঁট নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

3.5 ঋণের উৎসের যোগান তলানিতে

উৎপাদনের প্রাচুর্যের সময় ভারতের ব্যবসায়ীরা কাঁচা তুলার বিশ্ব বাজার দখল করে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের উৎখাত করার স্বপ্ন দেখেছিল। 1861 সালে বোম্বে গেজেটের সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন্ শক্তিই ল্যঙ্কাশায়ারে তুলো যোগানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। তুলোর যোগানদার হিসেবে আমেরিকার স্থান ভারতবর্ষ দখল করে। কিন্তু 1865 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই স্বপ্ন দেখার সমাপ্তি ঘটে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটায় শান্তি স্থাপিত হলে তুলো উৎপাদন পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে এবং ব্রিটেনে ভারতীয় তুলোর রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পায়।

মহারাষ্ট্রের রপ্তানি ব্যবসায়ী এবং সাউকাররা আর দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। তারা দেখতে পেয়েছিল যে ভারতীয় কার্পাসের চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং কার্পাসের দামও অনেক কমে যাচ্ছে। সুতরাং, তারা কার্যক্রম বন্ধ করার, কৃষকদের অগ্রিম টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আনার এবং বকেয়া ঋণ পরিশোধের দাবি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

একদিকে যেমন ঋণের উৎস সীমাবদ্ধতা হয়ে আসে অপরদিকে রাজস্বের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখেছি যে, প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত 1820 এবং 1830-এর দশকে করা হয়েছিল। এখন পরবর্তী বন্দোবস্ত করার সময় এসে পড়েছিল এবং এই নতুন বন্দোবস্তে রাজস্বের চাহিদা নাটকীয়ভাবে : 50 থেকে 100 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যখন তুলার দাম কমে যাচ্ছিল এবং চাষের জমি হ্রাস পাচ্ছিল, এই পরিস্থিতিতে অসহায় রায়তদের পক্ষে বর্ধিত রাজস্ব পরিশোধ করা কীভাবে সম্ভব ছিল? তাই তাদের আবার মহাজনদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। কিন্তু মহাজনরা এবার ঋণ দিতে অস্বীকার করে। তাদের তখন আর রায়তদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার উপর কোনো আস্থা ছিল না।

3.6 বিচারের বাণী

মহাজনরা ঋণ দিতে অস্বীকার করায় রায়তরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়নি যে তারা গভীর ঋণে নিমজ্জিত অথবা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য মহাজনদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, বরং তারা এই ব্যাপারে বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে মহাজনরা তাদের দুর্দশার প্রতি সংবেদনশীল ছিল না। মহাজনেরা গ্রামাঞ্চলের প্রথাগত নিয়ম লঙ্ঘন করছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসনের আগেই মহাজনি কারবার বিস্তৃত ছিল এবং মহাজনরা প্রায়শই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। বিভিন্ন গতানুগতিক রীতির মাধ্যমে

উৎস ৪

একজন রায়তের আবেদন

নীচে একটি আবেদনপত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কারজাত তালুকের মিরাজগাঁও নামক গ্রামের একজন রায়ত দ্বারা আহমেদ নগরের কালেক্টরের (দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের) কাছে দেওয়া হয়েছিল :

> সাউকাররা অনেকদিন ধরে আমাদের অত্যাচার করে আসছে। যেহেতু আমরা আমাদের পারিবারিক খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করতে পারছি না, তাই আমরা অর্থ, পোশাক এবং শস্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য তাদের কাছে ঋণ ভিক্ষা করতে বাধ্য হই। সাউকাররা কঠিন শর্তের বিনিময়ে আমাদের ঋণ দিতে সম্মত হত। তার উপর প্রয়োজনীয় কাপড় এবং শস্য নগদ হারে আমাদের কাছে বিক্রি করা হয় না। আমাদের কাছে যে পরিমাণ দাম বলা হত তা ছিল নগদ দামে কেনার গ্রাহকদের চেয়ে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বেশি।.... আমাদের জমির ফসলও সাউকাররা নিয়ে যায়; ফসল নিয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাদের আশ্বস্থ করে যে এর দাম আমাদের জমা খরচের খাতায় জমা হয়ে যাবে, কিন্তু আসলে আমাদের জমা খরচের খাতায় এর কোনো উল্লেখ থাকে না। তারা যখন আমাদের জমির উৎপাদিত সামগ্রি নিয়ে যায়, তখন আমাদের কোনো রসিদও দেয় না।

➲ রায়ত তার আবেদনপত্রটিতে কী অভিযোগ করছে তা ব্যাখ্যা করো। মহাজন দ্বারা কৃষকদের থেকে নেওয়া ফসলের হিসাব জমা খরচের খাতায় কেন লেখা হত না? কৃষকদের কেন কোনো রসিদ দেওয়া হত না? তুমি যদি মহাজন হতে তাহলে এইসব কাজের জন্য তুমি কী কী কারণ দেখাতে?

মহাজন ও রায়তদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত। একটি সাধারণ নিয়ম ছিল যে, সুদ মূলধনের চেয়ে বেশি নেওয়া যাবে না। মহাজনদের দ্বারা জোরজবরদস্তি মূলক সুদ আদায় করাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য এবং ন্যায্য সুদ-এর সংজ্ঞা কী হবে তা নির্ধারণ করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে এই রীতিনীতিগুলো ভেঙে পড়ে। দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন কর্তৃক তদন্তকৃত অনেক মামলার মধ্যে একটি মামলাতে দেখা যায় যে, মহাজন একশো টাকার মূলধনের উপর দু'হাজার টাকারও অধিক সুদ ধার্য করেছিল। অনেক আবেদনপত্রে রায়তেরা এ ধরনের বলপূর্বক সুদ আদায় এবং প্রথা লঙ্ঘনের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

উৎস 9

ভাড়ার দলিলপত্র

যখন কৃষকদের উপর ঋণের বোঝা বেড়ে যায় তখন তারা মহাজনদের ঋণ মেটাতে অসমর্থ হয়। এখন মহাজনকে তার সমস্ত সম্পত্তি-জমি, গরুর গাড়ি, গবাদি পশু হস্তান্তর করা ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু গবাদি পশু ছাড়া সে কৃষিকাজ করতে পারবে না। তাই সে জমি এবং পশু ভাড়া নিতে শুরু করে। তাকে এখন পশুর জন্য, যেগুলো মূলত তারই ছিল, ভাড়া দিতে হত। তাকে একটি ভাড়ার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হত যেখানে পরিষ্কার লেখা থাকত যে এই পশু এবং গাড়িগুলো তার নিজের নয়। এ মর্মে কোনো বিরোধ দেখা দিলে, আদালতের মাধ্যমে তা মীমাংসা করা হবে।

নীচে এমন একটি দলিলপত্রের নমুনা দেওয়া হয়েছে যা 1873 সালের নভেম্বরে একজন কৃষক স্বাক্ষর করেছিলেন। এটি দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের রেকর্ড থেকে নেওয়া হয়েছে :

> আমি আপনার দেওয়া ঋণের জন্য আমার লোহার অক্ষবিশিষ্ট দুটো গাড়িসহ আনুষঙ্গিক বস্তু এবং চারটি বলদ বিক্রি করেছি ... আমি এই দলিলের মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে ঠিক এই দুটি গাড়ি এবং চারটি বলদ ভাড়া নিচ্ছি। আমি প্রতিমাসে আপনাকে চার টাকা করে ভাড়া দেব এবং আপনার কাছ থেকে আপনার নিজের হস্তাক্ষর সম্বলিত রসিদ নেব। রসিদ না পেলে আমি এই দাবি করব না যে ভাড়া শোধ করা হয়েছে।

➲ কৃষকরা এই দলিলের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা তালিকভুক্ত করো। এই জাতীয় দলিল আমাদের কৃষক ও মহাজনদের সম্পর্কে কী বলে? এর ফলে কৃষক এবং বলদের (যেগুলো পূর্বে তারই মালিকানাধীন ছিল) মধ্যে সম্পর্কে কী পরিবর্তন আসবে?

রায়তরা মহাজনকে প্রতারক এবং সুবিধাবাদি ভাবতে শুরু করে। তারা মহাজনদের দ্বারা ঋণের খাতা জালিয়াতির এবং আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিল। 1859 সালে ব্রিটিশরা 'Limitation Law' নামে একটি আইন পাশ করে, যেখানে বলা হয় মহাজন এবং রায়তদের মধ্যে স্বাক্ষরিত

ঋণপত্রের মেয়াদ তিন বছরের জন্য থাকবে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল অনেক দিন ধরে জমা সুদের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু মহাজন এই আইনটিকে ঘুরিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে এবং প্রতি তিন বছরে রায়তদের নতুন ঋণপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। যখন কোনো নতুন ঋণপত্র স্বাক্ষর করা হয় তখন আগের অপরিশোধিত ঋণ অর্থাৎ মূল ঋণ এবং অপরিশোধিত ঋণকে মূলধন হিসেবে দেখানো হত এবং তার উপর নতুন করে সুদ ধার্য করা হত। দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন যে আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছে তাতে রায়তরা বর্ণনা করেছিলেন যে এই প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করেছিল (উৎস নং 10 দেখো) এবং মহাজনরা কীভাবে রায়তদের প্রতারণা করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করত : ঋণ পরিশোধ করলে তারা রায়তদের রসিদ দিতে অস্বীকার করত, ঋণপত্রে কল্পিত রাশি লিখে রাখত, খুব কম দামে কৃষকদের থেকে ফসল সংগ্রহ করে নিত এবং শেষপর্যন্ত কৃষকদের ধন সম্পত্তিও আত্মসাৎ করে নিত।

বিভিন্ন ধরনের দলিল এবং ঋণপত্র নতুন দমনমূলক ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। অতীতে এই ধরনের দলিল খুব কম দেখা যেত। ব্রিটিশরা অবশ্য মৌখিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে করা লেনদেনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। যেটি অতীতে একদম সাধারণ ব্যাপার ছিল। তাদের মতে লেনদেনের শর্তাবলি দলিল এবং ঋণপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা উচিত এবং আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলিল বা চুক্তিপত্র আইনের দৃষ্টিতে প্রয়োগযোগ্য না হয়, ততক্ষণ এর কোনো মূল্য থাকবে না।

সময়ের সাথে সাথে, কৃষকরা উপলব্ধি করতে লাগল যে তাদের জীবনে যা দুঃখ কষ্ট আছে সে সব এই নতুন ঋণপত্র এবং দলিলের কারণেই হয়েছে। নথিপত্রে তাদের স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হত বা আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হত কিন্তু বাস্তবে তারা কোথায় স্বাক্ষর করছে বা আঙ্গুলের ছাপ দিচ্ছে সে বিষয়ে তার অজ্ঞ ছিল। মহাজনদের দ্বারা ঋণপত্রে লেখা শর্তাবলি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা লিখিত শব্দের প্রতি তাদের ভীতি জন্মায়। তবে তাদের কাছে বিকল্প পথ ছিল না, কারণ বেঁচে থাকার জন্য তাদের ঋণের প্রয়োজন ছিল এবং মহাজনরা আইনি দস্তাবেজ ছাড়া ঋণ দিতে রাজি ছিল না।

উৎস 10

ঋণের পরিমাণ কীভাবে বৃদ্ধি পায়

দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনের কাছে দেওয়া আবেদনপত্রে একজন রায়ত ব্যাখ্যা করেছিলেন কীভাবে ঋণপদ্ধতি কাজ করত :

> একজন সাউকার তার ঋণগ্রহীতাকে একটি চুক্তিপত্র অনুসারে 100 টাকার সুদ 3-2 আনা মাসিক দরে ঋণ দেয়। ঋণগ্রহীতা এই ঋণ গ্রহণের আট দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়। এই ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের তিন বছর পর সাউকার তার ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে মূলধন এবং (মিশ্রধন) জন্য আরো একটি চুক্তিপত্র লিখিয়ে নেয় এবং সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করার জন্য 125 দিন সময় মঞ্জুর করে। 3 বছর 15 দিন পর ঋণগ্রহীতার দ্বারা তৃতীয় চুক্তিপত্র মঞ্জুর করা হয়। (এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হয়) ... 12 বছরের শেষে .... 1000 টাকার সুদের পরিমাণ 2028 টাকা 10 আনা 3 পয়সা হয়ে যেত।

➲ কয়েক বছর ধরে রায়তরা যে হারে সুদ প্রদান করেছিল তা হিসাব করে বের করো।

4. দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশন

দাক্ষিণাত্যে যখন কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে তখন প্রথমদিকে বোম্বের সরকার এটিকে গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু ভারত সরকার, 1857 সালের স্মৃতিচারণে উদ্বিগ্ন হয়ে বোম্বাই সরকারকে দাঙ্গার কারণ তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করার চাপ দেয়। এই কমিশন একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল যা 1878 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছিল।

'ডেকান রায়ট রিপোর্ট' (Deccan Riots Report) নামে পরিচিত এই প্রতিবেদনে ঐতিহাসিকদের দাঙ্গা সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন তথ্যসূত্র সরবরাহ করেছে। বিদ্রোহ কবলিত এলাকাগুলোতে তদন্ত কমিশন বিভিন্ন রকমের অনুসন্ধান কার্য চালায়, রায়তগণ, সাউকারগণও প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী নথিভুক্ত করে, রাজস্ব হারের পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সুদের হার সম্পর্কে তদন্ত করে। এছাড়াও, বিভিন্ন জেলা শাসকদের কাছ থেকেপ্রাপ্ত নথিগুলোও খতিয়ে দেখে।

➲ আলোচনা করো...

তুমি বর্তমানে যে অঞ্চলে বসবাস কর সেখানে কী হারে সুদের হার নির্ধারণ করা হয় তা অনুসন্ধান করো। গত 50 বছরে এই হারগুলো পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তাও সন্ধান করো। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রদত্ত সুদের হারের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে? যদি কোনো পার্থক্য থাকে তবে এর পেছনে কী কারণ রয়েছে?

তবে এই সকল সূত্রগুলোকে বিবেচনা করার সময় আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, এই সকল তথ্য আদতে সরকারি তথ্য। সুতরাং এগুলো সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, দাক্ষিণাত্য দাঙ্গা কমিশনকে সরকারি রাজস্ব দাবির মাত্রা এই বিদ্রোহের কারণ ছিল কিনা, তা বিশেষভাবে তদন্ত করতে বলা হয় এবং সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপনের পর কমিশন জানিয়েছিল যে সরকারের রাজস্ব হারের দাবি কৃষকদের বিদ্রোহের কারণ নয়। এই বিদ্রোহের পেছনে মহাজনদের দোষ ছিল। বহু ঔপনিবেশিক নথিপত্রে এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে ঔপনিবেশিক সরকার কখনোই এটি মানতে রাজী ছিল না যে সরকারি পদক্ষেপের কারণে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছিল।

যদিও সরকারি নথিপত্রগুলোকে ইতিহাসের পুনর্বিবেচনার জন্য বহুমূল্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়, তথাপি এই বিবরণগুলো সর্বদা সাবধানতার সাথে পড়তে হবে এবং সংবাদপত্র, বেসরকারি বিবরণ আইনি নথিপত্র এবং পাশাপাশি মৌখিক সূত্র থেকে সংকলিত তথ্যগুলোর সাথে সেগুলোকে মিলিয়ে এর সত্যতা যাচাই করা উচিত।

সময়পঞ্জি

1765	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভ করে
1773	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা রেগুলেটিং আইন পাশ হয়
1793	বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন
1800s	সাঁওতালরা রাজমহল পাহাড়ে আগমন এবং বসতি স্থাপন
1818	বোম্বাই দাক্ষিণাত্যে প্রথম রাজস্ব বন্দোবস্ত
1820-এর দশক	কৃষিজ পণ্যের দাম হ্রাসের সূত্রপাত
1840 থেকে 50-এর দশক	বোম্বাই দাক্ষিণাত্যে ধীরগতিতে কৃষির সম্প্রসারণ
1855-56	সাঁওতাল বিদ্রোহ
1861	তুলা চাষের তেজিভাব আসে
1875	দাক্ষিণাত্যের গ্রামাঞ্চলে রায়তদের বিদ্রোহ

চিত্র 10.20
1820 সালে উইলিয়াম প্রিন্সেপ দ্বারা অঙ্কিত একটি গ্রামীণ দৃশ্য।

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে জোরদাররা কেন ক্ষমতাশালী ছিল?
2. জমিদাররা কীভাবে তাদের জমিদারির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন?
3. বহিরাগতদের আগমনকে কেন্দ্র করে পাহাড়িরা কীভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে?
4. সাঁওতালরা কেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল?
5. দাক্ষিণাত্যে রায়তেরা মহাজনদের উপর কেন ক্ষুব্ধ ছিল?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কেন অনেক জমিদারি নিলাম হয়ে গিয়েছিল?
7. পাহাড়িদের থেকে সাঁওতালদের জীবনজীবিকা ধরন কীভাবে পৃথক ছিল?
8. আমেরিকান গৃহযুদ্ধ কীভাবে ভারতের রায়তদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল?
9. কৃষকদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য ব্যবহার করার প্রধান সমস্যাগুলো কী কী?

মানচিত্রের কাজ

10. উপমহাদেশের একটি রেখা মানচিত্র এই অধ্যায়ে বর্ণিত অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করো। এর কোনো অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা চালু ছিল কিনা তা খুঁজে বের করো এবং মানচিত্রে এইসব অঞ্চলকে চিহ্নিত করো।

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

11. ফ্রান্সিস বুকানন পূর্ব ভারতের অনেক জেলা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর মধ্যে একটি প্রতিবেদন পড়ো এবং এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলো আলোকে গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে সংকলন কর। ঐতিহাসিকরা এই জাতীয় প্রতিবেদনগুলো কীভাবে ব্যবহার করেন তাও উল্লেখ করো।
12. তুমি যে অঞ্চলে বসবাস কর, সেখানকার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে কথা বলো এবং তারা বর্তমানে যে জমিগুলো চাষ করে সেগুলো দেখো। তারা কী উৎপাদন করে, কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের বাবা মা কী করতেন, তাদের ছেলেমেয়েরা এখন কী করে এবং গত 75 বছরে তাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছে, তাও অনুসন্ধান করো। তোমার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন লেখো।

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Sugata Bose. 1986.
Agrarian Bengal.
Cambridge University Press, Cambridge.

Francis Buchanan.1930.
Journal of Francis Buchanan Kept During the Survey of the District of Bhagalpur.
Superintendent, Government Printing, Bihar and Orissa, Patna.

Ramachandra Guha. 1989.
The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalayas.
Oxford University Press, New Delhi.

Sumit Guha. 1985.
The Agrarian Economy of the Bombay Deccan, 1818-1941.
Oxford University Press, New Delhi.

Ravinder Kumar. 1968.
Western India in the Nineteenth Century: A Study in the Social History of Maharashtra.
Routledge and Kegan Paul, London.

Ratnalekha Ray. 1979.
Change in Bengal Agrarian Society, c. 1760-1850.
Manohar, New Delhi.

Kumar Suresh Singh. 1966.
Dust-storm and the Hanging Mist: A Study of Birsa Munda and His Movement in Chhotanagpur (1874-1901).
Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta.

বিষয়বস্তু এগারো

ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা

1857 -এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

1857-এর 10 মে বিকেলবেলা মীরাটের সেনাছাউনির সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রথমতঃ দেশীয় পদাতিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। এরপর তা দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে এবং পরে শহরে ছড়িয়ে পড়ে। শহর এবং তার আশেপাশের গ্রামগঞ্জের সাধারণ জনগণও সিপাহীদের সাথে যোগদান করে। সিপাহীরা ওই সমস্ত অস্ত্রাগারের দখল নিয়ে নেয় যেখানে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ রাখা হত এবং শেতাঙ্গাদের আক্রমণ তথা তাদের বাংলো, সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং সেগুলোতে অগ্নি সংযোগ করার জন্য অগ্রসর হয়। নথিপত্রের অফিস, কারাগার, আদালত, ডাকঘর, সরকারি কোষাগার প্রভৃতি লুণ্ঠন তথা ধ্বংস করা হয়। দিল্লির সাথে শহরের সংযোগ রক্ষাকারী টেলিগ্রাফ লাইন কেটে ফেলা হয়। অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে একদল সিপাহি ঘোড়ায় চড়ে দিল্লির পথে রওনা দেয়।

চিত্র 11.1
বাহাদুর শাহের প্রতিকৃতি

তারা পরদিন 11 মে ভোরবেলায় লালকেল্লার প্রবেশদ্বারে পৌঁছায়। সময়টা ছিল রমজান মাস, মুসলিম সম্প্রদায়ের রোজা রাখার সময়। বৃদ্ধ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ সূর্যোদয়ের পূর্বেই নামাজ পড়ে এবং খাবার খেয়ে সবেমাত্র রোজার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি ফটকের কাছে হৈ-হল্লা শুনতে পান। উনার ঘরের জানালার নীচে সমবেত সিপাহীরা তাঁকে বললো যে, “আমরা মীরাটে সমস্ত ইংরেজ পুরুষদের হত্যা করে এখানে এসেছি কারণ তারা গরু এবং শুয়োরের চর্বি মাখানো কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছিল। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই ধর্ম ভ্রষ্ট হবে”। এরই মাঝে আরেকদল সিপাহি দিল্লিতে প্রবেশ করে। শহরের সাধারণ মানুষও তাদের সাথে যোগ দেয়। প্রচুর সংখ্যায় ইউরোপীয় জনগণকে হত্যা করা হয়; দিল্লির বিত্তবান শ্রেণির লোকেদের উপর আক্রমণ তথা লুটপাট সংগঠিত হয়। স্পষ্টতই, দিল্লি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিছু সিপাহি দিল্লির রাজ দরবারের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে লালকেল্লার ভেতরে প্রবেশ করে। তারা সম্রাটের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। সিপাহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বাহাদুর শাহের কাছে তাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনোও উপায় ছিল না। এভাবে বিদ্রোহটি এক ধরনের বৈধতা অর্জন করে, কারণ তখন একে মোগল সম্রাটের নামে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল।

12 এবং 13 মে উত্তর ভারত শান্ত ছিল। কিন্তু যখন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে নিয়েছে এবং বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের আশীর্বাদ করেছেন, এরপরই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং দিল্লির পশ্চিমে একের পর এক সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহ মাথাচাঁড়া দেয়।

1. বিদ্রোহের ধরন (PATTERN OF THE REBELLION)

যদি এই বিদ্রোহের ঘটনাগুলোকে সময়ানুক্রমে সাজানো হয় তবে দেখা যাবে যে, এক শহর থেকে অন্য শহরে বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সেখানকার সিপাহীরা অস্ত্র ধারণ করতে শুরু করে। প্রত্যেক সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহের ঘটনাক্রম কমবেশি একই প্রকার ছিল।

Bell of arms হল ঘণ্টা আকৃতির অস্ত্রাগার, যেখানে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয়।

1.1 বিদ্রোহ কীভাবে শুরু হয় (How the mutinies began)

সিপাহীরা কোনও না কোনও বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অনেক স্থানে সন্ধ্যার সময় কামানের গোলা দাগা হয় অথবা বিউগল বাজানো হয়। প্রথমতঃ তারা ঘণ্টা আকৃতির অস্ত্রাগার (bell of arms) দখল করে এবং সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করে। এরপরে তারা বিভিন্ন সরকারি ভবন যেমন-জেল, সরকারি কোষাগার, টেলিগ্রাফ অফিস, রেকর্ড রুম, বাংলো প্রভৃতি আক্রমণ করে সমস্ত নথি জ্বালিয়ে দেয়। শ্বেতাঙ্গদের সাথে যুক্ত সমস্ত কিছু এবং সকল ব্যক্তি তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী সকল অংশের জনগণকে একজোট করা এবং ফিরিঙ্গিদের উৎখাত করার জন্য হিন্দি, উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় আহ্বান জানিয়ে শহরগুলোতে প্রচার চালানো হয়।

ফিরিঙ্গি শব্দটির উৎপত্তি ফার্সী ভাষা থেকে যা সম্ভবত ফ্রাঙ্ক (যা থেকে ফ্রান্স নামের উৎপত্তি) থেকে এসেছে। প্রায়শই মর্যাদাহানিকর দৃষ্টিতে বিদেশীদের অভিহিত করার জন্য উর্দু এবং হিন্দি ভাষার এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিদ্রোহে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সাথে সাথে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর পরিধি বাড়তে থাকে। লক্ষ্ণৌ, বেরেলি এবং কানপুরের মতো বড়ো শহরগুলোতে মহাজন এবং বিত্তবান শ্রেণির উপর বিদ্রোহীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। কৃষকশ্রেণি তাদের কেবলমাত্র অত্যাচারী হিসেবেই নয় বরং ব্রিটিশদের জোট সঙ্গী হিসেবেও দেখত। অধিকাংশ স্থানে ধনীদের ঘরবাড়ি লুটপাট ও ধ্বংস করা হয়। সিপাহীদের মধ্যে শুরু হওয়া ছোটোখাটো অসন্তোষ দ্রুত বিদ্রোহের

চিত্র 11.2
লক্ষ্ণৌতে ব্রিটিশদের আক্রমণ করার সময় সাধারণ অংশের জনগণও সিপাহীদের সাথে যোগদান করে।

রূপ নেয়। সমস্ত ধরনের কর্তৃত্বের তথা শাসনের প্রকাশ্যে অবমাননা করা হতে থাকে।

মে-জুন মাসে ব্রিটিশরা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। ব্রিটিশরা নিজেদের তথা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল। জনৈক ব্রিটিশ অফিসার লিখেছেন, ব্রিটিশ শাসন "তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে"।

উৎস 1

অস্থির সময়ে সাধারণ জনজীবন

বিদ্রোহের মাসগুলোতে শহরগুলোতে কী ঘটে চলছিল? দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলাকালীন ওই মাসগুলোতে লোকেরা কীভাবে জীবনযাপন করছিলো? সাধারণ জনজীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়? বিভিন্ন শহর থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন হতে আমরা জানতে পারি যে, দৈনন্দিন কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। 'দিল্লি উর্দু আখবার', 14 জুন 1857-এ প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি পড়ো :

> একই রকম অবস্থা ছিল সব্জি এবং শাঁকের (পালং)। কুমড়ো এবং বেগুন বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জনসাধারণকে অভিযোগ জানাতে দেখা গেছে। আলু এবং মিষ্টি আলু বাজারে পাওয়া গেলেও সেগুলো ছিল বাসি এবং পঁচা। সেগুলো কুঁজরাদের (সব্জি চাষি) কাছ থেকে দূরদৃষ্টিসম্পন্নরা পূর্বেই সংগ্রহ করে রেখেছিল। শহরে অবস্থিত বাগিচাগুলোতে উৎপাদিত কিছু সামগ্রী কিছু কিছু স্থানে পৌঁছাত কিন্তু দরিদ্র তথা মধ্যবত্তি শ্রেণির জনগণের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। তারা সেগুলোর দিকে তাকিয়ে কেবলমাত্র নিজেদের ঠোঁটই চাটতো অর্থাৎ সেগুলো তাদের নাগালের বাইরে ছিল। (কারণ ওই সমস্ত দ্রব্য কেবলমাত্র বিশেষ লোকেদের জন্যই ছিল।)
>
> ... এখানে অন্য একটি বিষয়ের উপরও নজর দেওয়া দরকার যা জনগণের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে চলছে। জলবাহকরা জল ভরা বন্ধ করে দিয়েছে। বেচারা সুরফাগণকে (ভদ্রসমাজ) নিজেদের কাঁধে করে জলের পাত্র বহন করতে দেখা যায় এবং এই জল নিয়ে গেলে পরেই বাড়িঘরের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, যেমন রান্না-বান্না প্রভৃতি সম্ভবপর হয়। ন্যায়পরায়ণ লোকেরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রচুর জনবসতি এলাকা বা মহল্লায় জনগণ বেশ কিছুদিন যাবৎ কোনো কিছু রোজগার করতে সমর্থ হয়নি এবং এই পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে দুর্নীতি, মৃত্যু এবং রোগব্যাধী শহরের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলবে এবং শহরের সর্বত্র মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি শহরের আশেপাশের এলাকাও এর থেকে বাদ যাবে না।

➲ এই দুটি প্রতিবেদন এবং ওই সময়ে দিল্লির পরিস্থিতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে দেওয়া বিবরণগুলো পড়। মনে রাখবে যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রায়শই প্রতিবেদকের নিজস্ব চিন্তাধারা অথবা তার পূর্বলব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'দিল্লি উর্দু আখবার' জনগণের কার্যকলাপকে কীভাবে দেখেছিল?

1.2 যোগাযোগের মাধ্যম (Lines of communication)

বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত বিদ্রোহের প্রকৃতির সাদৃশ্যের কারণ আংশিকরূপে এর পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের মধ্যে নিহিত ছিল। এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন সেনা ছাউনির সিপাহীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল। মে মাসের প্রথম দিকে 7 ম বা অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর (7th Awadh Irreguralr Cavatry) সৈন্যরা নতুন কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মতি জানানোর পরে তারা 48তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে চিঠি লিখে

উৎস 2

সিস্টেন এবং তহশিলদার

বিদ্রোহ তথা সৈনিক অভ্যুত্থানের সংবাদ আদান-প্রদান প্রসঙ্গে সীতাপুরের একজন দেশীয় খ্রিস্টান পুলিশ ইন্সপেক্টর ফ্রাঙ্কয়িস সিস্টেনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে সাহারানপুর গিয়েছিলেন। সিস্টেন ভারতীয় পোশাক পরিধান করেছিলেন এবং পায়ের উপর পা রেখে বসেছিলেন। এরই মাঝে বিজনূরের এক মুসলিম তহশীলদার কক্ষে প্রবেশ করে। যখন সে জানতে পারে যে সিস্টেন অবধ থেকে এসেছেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'অবধের খবর কী? কাজকর্ম কেমন চলছে?" সিস্টেন জবাবে বলেন, "যদি অবধে আমাদের কোনো কাজ থাকে তো মহামান্যও তা জানতে পারবেন'। তহশিলদার বললো, "ভরসা রাখুন, আমরা এবার সফল হবই। মামলাটি যোগ্য ব্যক্তির হাতেই সমর্পণ করা হয়েছে।" পরবর্তীকালে খবর পাওয়া যায় যে, ওই তহশীলদার ছিলেন বিজনূরের বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা।

➲ বিদ্রোহীরা নিজেদের পরিকল্পনাসমূহকে যেভাবে একে অন্যের কাছে পৌঁছাত এই সম্পর্কে এই কথোপকথন থেকে কী জানা যায়? তহশিলদার সিস্টেনকে কেন একজন সম্ভাব্য বিদ্রোহী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন?

জানায় যে, "তারা তাদের ধর্মরক্ষায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং 48 নেটিভ ইনফেনট্রির আদেশের অপেক্ষা করেছি"। সিপাহি অথবা তাদের প্রতিনিধিরা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাচ্ছিল। এইভাবে জনগণ বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিল তথা এনিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল।

বিদ্রোহের ধরন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এটা মনে হয় যে এটি কিছু পূর্ব পরিকল্পনা তথা সমন্বয় অনুযায়ী সংগঠিত হয়েছিল সেগুলো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। এই পরিকল্পনাগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়? কারা এর পরিকল্পনা করেছিলেন? প্রাপ্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া কঠিন। তবুও একটি ঘটনা থেকে এই ব্যাপারে কিছু সংকেত পাওয়া যায় যে, কীভাবে এই বিদ্রোহটি এতো সুসংগঠিত ছিল। বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে অবধ মিলিটারি পুলিশের সেনানায়ক (ক্যাপ্টেন) হিয়ার্সেকে তাঁর ভারতীয় অধস্তনগণ সুরক্ষা প্রদান করেছিল, ওই একই স্থানে অবস্থানরত 41 তম নেটিভ ইনফেনট্রি হিয়ার্সেকে হত্যা করার জন্য অথবা তাদের কাছে বন্দী হিসেবে হস্তান্তর করার জন্য মিলিটারি পুলিশের উপর জোর দাবি জানায়, যেহেতু তারা তাদের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ পদাধিকারীদের আগেই হত্যা করেছিলে, কিন্তু মিলিটারি পুলিশ নেটিভ ইনফেনট্রির দাবি মানতে অস্বীকার করে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রত্যেক রেজিমেন্টের দেশীয় পদাধিকারীদের নিয়ে গঠিত একটি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই ব্যাপারটি মিটমাট করে নেওয়া হবে। এই বিদ্রোহের প্রথমদিকের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একজন চার্লস বেল লিখেন যে, কানপুরে সিপাহীদের আবাসস্থলে রাত্রিবেলা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এধরনের পঞ্চায়েত বসতো, এ থেকে বোঝা যায় যে, কিছু কিছু সিদ্ধান্ত দলগতভাবে নেওয়া হত। বস্তুতঃ সিপাহীরা একইস্থানে একসাথে বাস করত এবং একই ধরনের জীবনযাপন করত তথা এদের মধ্যে

সিপাহি বিদ্রোহ (Munity)— সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরে নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবমাননা।

বিদ্রোহ (Revolt)— প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ তথা ক্ষমতার বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধ প্রদর্শন।

1857-এর বিদ্রোহ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, এখানে বিদ্রোহ বলতে প্রাথমিকভাবে সাধারণ শ্রেণির জনগণের (কৃষক, জমিদার, রাজা, জায়গিরদার প্রমুখ) উত্থান বা বিদ্রোহকে বোঝায়। অন্যদিকে সিপাহি বিদ্রোহে কেবলমাত্র সিপাহীরাই অংশগ্রহণ করে।

চিত্র 11.3
রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর একটি জনপ্রিয় চিত্র।

চিত্র 11.4
নানা সাহেব
বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় 1858-এর শেষের দিকে নানা সাহেব নেপালে পালিয়ে যান। এই ঘটনা তাঁর সাহসিকতা তথা বীরত্বের কাহিনির সাথে জড়িয়ে রয়েছে।

অনেকেই একই জাতিভুক্ত ছিল। তারা একসাথে বসে নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে — এটাই স্বাভাবিক। এই সিপাহীগণ নিজেরাই নিজেদের বিদ্রোহের স্রষ্টা ছিল।

1.3 নেতা এবং অনুগামীগণ (Leaders and followers)

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নেতৃত্ব তথা সংগঠনের প্রয়োজন ছিল। এর জন্য বিদ্রোহীরা মাঝে মধ্যে ওই সমস্ত ব্যক্তির শরণাপন্ন হত যারা ব্রিটিশ আগ্রাসনের পূর্বে নেতৃত্বস্থানীয় ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, মীরাটের সিপাহীরা সর্বপ্রথমে যে সমস্ত কাজ করেছিল তার মধ্যে একটি হল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানের জন্য দিল্লিতে ছুটে গিয়ে মোঘল সম্রাটের কাছে আবেদন। কিন্তু এই ব্যাপারে মোঘল সম্রাটের সম্মতি লাভ করতেও বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। বাহাদুর শাহ এই প্রস্তাব পেয়ে প্রথমতঃ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিদ্রোহের নামসর্বস্ব নেতা হতে তখনই তিনি রাজি হন যখন কয়েকজন সিপাহী লালকেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থিত মোঘল দরবারের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধ সম্রাট অনুধাবন করেন যে, নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উনার কাছে আর কোনো বিকল্প নেই।

অন্যান্য স্থানেও, স্বল্প পরিসরে একই ধরনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। কানপুরে সিপাহীরা এবং সাধারণ জনগণ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের উত্তরাধিকারী নানা সাহেবের সামনে তাদের নেতা হিসেবে বিদ্রোহে যোগদানের বিকল্প ছাড়া আর অন্য কোনো পথ খোলা রাখেনি। ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ সাধারণ জনগণের প্রবল জনপ্রিয়তার দরুন বিদ্রোহের নেতৃত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন। তেমনিভাবে কুনোয়ার সিং নামে বিহারের আরহা এর এক স্থানীয় জমিদারের অবস্থাও অনেকটা এমনই ছিল। অবধ-এ (অযোধ্যায়) নবাব ওয়াজিদ আলীর মতো জনপ্রিয় শাসককে সিংহাসনচ্যুত করা তথা উনার রাজ্য গ্রাস করে নেওয়ার স্মৃতি সাধারণ জনগণের মনে তখনও বেশ তাজা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের পতনের সংবাদ পেয়ে লক্ষ্ণৌতে উৎসাহী জনগণ নবাবের তরুণ পুত্র বিরজিস কাদেরকে নিজেদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করে।

সব জায়গাতেই রাজ দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথা-রাণী, রাজা, নবাব এবং তালুকদারগণই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন — এমন নয়, প্রায়শই সাধারণ নারী-পুরুষ এবং কখনো কখনো ধর্মকর্মের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাও বিদ্রোহের সংবাদ এক স্থান হতে অন্যস্থানে পৌঁছাত। মীরাট থেকে এমন একটি সংবাদ আসে যে, হাতির পিঠে চড়া একজন ফকিরকে সেখানে দেখা গিয়েছিল এবং সিপাহীরা ঘন ঘন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতো। লক্ষ্ণৌতে অবধের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পরে সেখানকার অনেক ধর্মীয় নেতা এবং স্বঘোষিত পয়গম্বর ব্রিটিশ সরকারকে ধ্বংস করার জন্য প্রচার করতেন।

1857-এর দুইজন বিদ্রোহী

শাহ্ মল

শাহ্মল উত্তরপ্রদেশের বড়ৌৎ পরগণার একটি বৃহৎ গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি একটি জাট কৃষকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা 'চৌরাসী দেশ' বা চুরাশিটি গ্রামে বসবাস করতো। এই বিস্তৃত অঞ্চলের জমিতে জলসেচের সুবিধা ছিল। এখানকার দোঁয়াশ কৃষ্ণ মৃত্তিকা ছিল যথেষ্ট উর্বর। প্রচুর গ্রামবাসী ছিল সমৃদ্ধশালী এবং তাঁরা ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে নিপীড়নকারী হিসেবে দেখতো। রাজস্বের পরিমাণ ছিল খুবই বেশি এবং তা কঠোর হাতে আদায় করা হত। ফলতঃ কৃষকদের জমি বহিরাগতদের হাতে চলে যেতে থাকে। এই অঞ্চলে বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ী এবং সুদখোর মহাজনরা তাদের জমি হাতিয়ে নিতে থাকলে শাহ্ মল চৌরাশী দেশ-এর গ্রাম প্রধান এবং কৃষকদের সংগঠিত করতে তৎপর হন। এরজন্য তিনি রাতের আধারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আবেদন জানান। অন্যান্য অনেক স্থানের মতো এখানেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আন্দোলন ক্রমশঃ সমস্ত ধরনের উৎপীড়ন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের রূপ নেয়। কৃষকরা তাদের কৃষিজমি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে এবং মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর লুটপাট করে। বেদখল হওয়া জমির মালিকগণ নিজেদের কেড়ে নেওয়া জমি পুনরায় দখল করে নেয়। শাহ্ মলের লোকেরা সরকারি ইমারত আক্রমণ করে। সেতু ধ্বংস করে এবং পাকা রাস্তার মাঝে গর্ত খুঁড়ে ফেলে। এর একটি কারণ ছিল যাতে সরকারি ফৌজ ওই সমস্ত এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে, অন্য একটি কারণ হল সেতু ও রাস্তাঘাটকে ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক মানা হত। তারা দিল্লিতে বিদ্রোহে সামিল হওয়া সিপাহীদের রসদ যোগান দেয় এবং দিল্লি ও মীরাটের মধ্যে সব ধরনের সরকারি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় স্তরে রাজা হিসেবে স্বীকৃত শাহ্মল এক ইংরেজ অফিসারের বাংলোবাড়ি দখল করে একে 'ন্যায় ভবন' নাম দেন। এখানে তিনি সমস্ত ধরনের ঝগড়া-বিবাদের বিচার তথা নিস্পত্তি করতেন। তিনি গুপ্তচর ব্যবস্থার একটি অন্তর্জাল গড়ে তুলেন যা ছিল বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসু। বেশ কিছুটা সময়কালের জন্য ওই এলাকার জনগণ অনুভব করে যে, ফিরিঙ্গি-রাজ শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের রাজ বা শাসন এসেছে, 1857-এর জুলাই মাসে তিনি যুদ্ধে নিহত হন।

মৌলবী আহমদুল্লা শাহ

1857-এর মহাবিদ্রোহে অনেক মৌলবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৌলবী আহমদুল্লাহ শাহ। হায়দ্রাবাদে শিক্ষিত হওয়া শাহ খুব তরুণ বয়সেই ধর্মপ্রচারক হয়ে ওঠেন। 1856 খ্রি. তাঁকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষদের মধ্যে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের প্রচার তথা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্রচার চালাতে দেখা যায়। তিনি একটি পাল্কিতে চেপে চলাফেরা করতেন। পাল্কির সামনে ঢাকি বা ঢোলবাদকরা এবং পেছনে তাঁর অনুগামীরা চলতো। সেজন্য জনগণ তাঁকে ডঙ্কা (ঢোল) শাহ নামে অভিহিত করতো। হাজার হাজার লোক তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে এবং তাঁকে একজন অনুপ্রাণিত পয়গম্বর হিসেবে জানতে শুরু করে এবং এটি দেখে ব্রিটিশ শাসকরা যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তিনি 1856 খ্রি. লক্ষ্ণৌতে পৌছান তখন পুলিশবাহিনী তাঁর প্রচারে বাধা দান করে। 1857 খ্রি. তাঁকে ফৈজাবাদ কারগারে বন্দি করে রাখা হয়। কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করার পর 22 তম নেটিভ ইনফেনট্রির বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁকে নিজেদের নেতা নির্বাচিত করে। তিনি বিখ্যাত চিনহাটের যুদ্ধে হেনরি লরেন্সের নেতৃত্বে যুদ্ধরত ইংরেজ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি তাঁর সাহস তথা ক্ষমতার জন্য পরিচিতি লাভ করেন। বস্তুতঃ অনেকেই বিশ্বাস করতো যে, তিনি অপরাজেয় ছিলেন এবং তিনি জাদুর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তারা আরো বিশ্বাস করতো যে, ব্রিটিশদের পক্ষে তাকে হত্যা করা অসম্ভব। কিছুটা এই বিশ্বাসের কারণেই তাঁর কর্তৃত্ব সবাই মেনে নেয়।

চিত্র 11.5
ফ্রান্সিস গ্র্যান্টের আঁকা হেনরী হারডিঞ্জের চিত্র, 1849 খ্রি.
গভর্নর জেনারেল হিসেবে হার্ডিঞ্জ সৈনিক সাজ সরঞ্জামের আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেন। শুরুর দিকে তিনি এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন করেন যাতে চর্বি মাখানো কার্তুজ ব্যবহার করা হত, যার বিরুদ্ধে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।

1.4 গুজব এবং ভবিষ্যৎবাণী (Rumours and prophecies)

জনগণকে আন্দোলনে সামিল করার পেছনে বিভিন্ন ধরনের গুজব এবং ভবিষ্যৎবাণীর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। আমরা দেখেছি যে, যে সমস্ত সিপাহীগণ মীরাট থেকে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছিল তারা বাহাদুর শাহ্‌কে ওই কার্তুজগুলো সম্পর্কে জানায় যেগুলোতে গরু এবং শুকরের চর্বির প্রলেপ দেওয়া ছিল এবং তাদের বক্তব্য ছিল যে, এগুলো দাঁতে কাটলে তাদের জাত ও ধর্ম দুটোই নষ্ট হবে। সিপাহীরা আসলে ওই সমস্ত এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের কথা বলেছিল যেগুলো সবেমাত্র তাদের দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজরা শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সিপাহীদের এটা বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে, কার্তুজগুলোতে আসলে এমন কোনো চর্বির প্রলেপ ছিল না। উত্তর ভারতে সিপাহীদের ছাউনিগুলোতে ওই গুজবটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে যে নতুন কার্তুজগুলো গরু ও শুকরের চর্বি লাগানো ছিল।

এই গুজবের উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রাইফেল ইন্সট্রাক্সন ডিপোর কমান্ডেন্ট ক্যাপ্টেন রাইট নিজের প্রতিবেদনে লেখেন যে, দমদমস্থিত অস্ত্রাগারে কর্মরত নীচু জাতির এক খালাসী 1857 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এক ব্রাহ্মণ সিপাহীকে জলপান করানোর অনুরোধ জানায়। ব্রাহ্মণ সিপাহি এই বলে নিজের ঘটি থেকে জল পান করাতে অস্বীকার করে যে, নীচু জাতির লোকের ছোঁয়ায় জলের ঘটি অপবিত্র হয়ে যাবে। প্রতিবেদন অনুসারে, জবাবে ওই খালাসী বলে যে, "এমনিতেই খুব শীঘ্রই আপনার জাত নষ্ট হতে যাচ্ছে, কারণ এখন আপনাকে গরু এবং শুকরের চর্বি মাখানো কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাঁটতে হবে।" এই প্রতিবেদনের সত্যতা আমাদের জানা নেই কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একবার এই গুজব ছড়িয়ে পড়া শুরু করলে ইংরেজ অফিসারদের যথেষ্ট আশ্বাস সত্ত্বেও এর প্রচার বন্ধ করা তথা এর ফলে সিপাহীদের মধ্যে সৃষ্ট আতঙ্ককে দূর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

1857 খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে উত্তর ভারতে শুধুমাত্র এই গুজবটিই ছড়িয়ে পড়েনি। এই গুজবটিও খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ইংরেজ সরকার হিন্দু এবং মুসলমানদের জাত ও ধর্ম নষ্ট করার জন্য ভয়ানক ষড়যন্ত্র করছে। গুজব রটনাকারীদের বক্তব্য ছিল যে, এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই ইংরেজরা বাজারে বিক্রি হওয়া আটায় গরু ও শুয়োরের হাঁড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছে। শহর ও সেনা ছাউনিতে সিপাহি এবং সাধারণ জনগণ এই আটা স্পর্শ করতেও অস্বীকার করে। চর্তুদিকে এই নিয়ে ভয় তথা আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে যে, ইংরেজরা ভারতীয়দের খ্রিস্টান বানাতে চায়, ফলে দ্রুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ অফিসাররা এই ভয় দূর করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এই আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে জনগণ আন্দোলনমুখী হয়। 1857-এর 23 জুন পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্তিতে ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটবে — এই ভবিষ্যৎবাণী আন্দোলনকে আরোও শক্তিশালী করে তুলে।

সেসময় কেবলমাত্র গুজবই রটেছিল না। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রামে গ্রামে চাপাটি বিতরণ করার সংবাদ আসছিল। রাত্রিবেলায় একজন লোক

একটি চাপাটি নিয়ে আসতো এবং সেটি গ্রামের চৌকিদারকে দিয়ে বলতো যে সে যাতে আরো পাঁচটি চাপাটি বানিয়ে পরবর্তী গ্রামগুলোতে বিলি করে আসে। এভাবে এই ব্যাপারটি চলতেই থাকতো। চাপাটি বিলির অর্থ এবং উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল না এবং আজও পরিষ্কার নয়। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, লোকেরা এটিকে কোনো এক আগত বিপর্যয়ের পূর্ব লক্ষণ হিসেবে ধরে নেয়।

1.5 সাধারণ জনগণ কেন গুজবে বিশ্বাস করেছিল? (Why did people believe in the rumours?)

ইতিহাসে গুজব তথা ভবিষ্যৎবাণীগুলোর শক্তি কেবলমাত্র এই ভিত্তিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয় যে সেগুলো বাস্তবিকই সত্য ছিল কিনা। আমাদের এটা দেখা প্রয়োজন যে, সেগুলোতে বিশ্বাসী জনগণের মন মানসিকতা সম্পর্কে এগুলো থেকে কী জানা যায়? এই সমস্ত গুজব তথা ভবিষ্যৎবাণী তাদের ভয় তথা সংশয়, তাদের বিশ্বাস এবং প্রত্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে কি বলে? গুজব তখনই রটে যখন এগুলো জনগণের মনে থাকা গভীর ভয় এবং সন্দেহের সাথে অণুরণিত হয়।

1857 খ্রিস্টাব্দের এইসব গুজবগুলোকে 1820-এর দশক থেকে ইংরেজদের দ্বারা চালু করা বিভিন্ন নীতির প্রসঙ্গে দেখলে এগুলোর অর্থ অনুধাবন করা আরো সহজ হয়। তোমরা জানো যে, ওই সময় হতেই গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নেতৃত্বে ভারতীয় সমাজকে সংস্কার করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার পাশ্চাত্য বিচারধারা, পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি গ্রহণ করে এসেছে। ভারতীয় সমাজের কিছু অংশের সহযোগিতায় তারা ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে, যেগুলোতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং উদার কলাবিদ্যা (liberal arts) সম্পর্কে পড়ানো হত। ইংরেজরা সতীদাহ প্রথার বিলোপ (1829) এবং হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রথাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করে।

দত্তক প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করার মাধ্যমে এবং কুশাসনের অজুহাতে ইংরেজরা অবধ ছাড়াও ঝাঁসী এবং সাঁতারার মতো বহু দেশীয় রাজ্য দখল করে নেয়। ব্রিটিশদের অধীনে চলে যাওয়ার পরে ওই অঞ্চলগুলোতে ইংরেজদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা তথা আইনকানুন, ভূমি বন্দোবস্ত তথা ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। উত্তর ভারতের জনগণের উপর এগুলোর ক্রমবর্ধমান তথা গভীর প্রভাব পড়েছিল।

সাধারণ লোকেদের মনে হয়েছিল যে, তারা সেসময় পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিস লালন করে আসছিল এবং পবিত্র বলে মেনে আসছিল যেমন-রাজা এবং ধর্মীয় সামাজিক রীতিনীতি, ভূমি দখল এবং রাজস্ব প্রদান সেগুলো সব নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছিল এবং এর স্থানে হৃদয়হীন বিদেশী এবং দমনমূলক ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ তাদের এই বিশ্বাসকে আরো তীব্রতর করে তোলে। এই ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

1857 খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ভিত্তি কি ছিল তা স্বল্প বিস্তারে অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের অবধের (অযোধ্যার) দিকে তাকাতে হয় - যা ছিল 1857-এর মহাবিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

➲ আলোচনা করো...

এই অংশটিকে আরো একবার পড়। বিদ্রোহ চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে যেভাবে নেতৃত্বের উন্মেষ ঘটে, এ ব্যাপারে যে সমস্ত মিল তথা পার্থক্য রয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা কর। যে-কোনো দুজন নেতার সম্পর্কে আলোচনা কর। কেন সাধারণ জনগণ তাদের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল?

2. অবধে (অযোধ্যায়) বিদ্রোহ (AWADH IN REVOLT)

2.1 "একটি চেরী ফল - যা অচিরেই আমাদের মুখে এসে পড়বে"

1851 খ্রি. গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি অবধ রাজ্যকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, "একটি চেরি ফল যা অচিরেই আমাদের মুখে এসে পড়বে"। এর পাঁচ বছর পরে 1856 খ্রি. এই রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

রাজ্য দখলের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। 1801 খ্রি. এই রাজ্যটির উপর অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Subsidiary Alliance) চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই নীতির শর্ত অনুসারে নবাবের নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিতে হয় এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে ইংরেজরা নিজেদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং এরই সাথে সে সময় রাজদরবারে ইংরেজদের প্রতিনিধি হিসেবে থাকা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের পরামর্শ অনুসারে নবাব কাজ করতে বাধ্য হন। রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে নবাব ক্রমবর্ধমানভাবে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বিদ্রোহী সর্দার এবং তালুকদারদের উপর আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেননি।

রেসিডেন্ট --- গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধিকে রেসিডেন্ট বলা হত। তাকে এমন রাজ্যে নিযুক্ত করা হত যেখানে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না।

এরই মাঝে ব্রিটিশরা অবধ দখল করতে অত্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে। তাদের মনে হয় যে, অবধের জমি নীল এবং তুলা চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত এবং উত্তর ভারতের প্রধান বাজার রূপে বিকশিত করার ব্যাপারে এই অঞ্চলটি আদর্শস্থানে রয়েছে। 1850-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের মুখ্য এলাকাগুলো যেমন-মারাঠা ভূমি, দোয়াব, কর্ণাটক, পাঞ্জাব এবং বাংলা - সব ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বাংলা দখলের সাথে শুরু হওয়া ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের এই প্রক্রিয়া 1856 খ্রি. অবধের অধিগ্রহণের সাথে সাথে পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

1798 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী এই অধিনতামুলক মিত্রতা নীতি চালু করেন। যেসব রাজ্য এই নীতি গ্রহণ করত তাদের ইংরেজদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া কিছু শর্ত মানতে হত। যথা —

(a) ইংরেজরা তাদের মিত্রপক্ষকে অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব নেবে।

(b) এই নীতি গ্রহণকারী রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটিশদের একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনী থাকবে।

(c) ওই রাজ্যই এই সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবে।

(d) অন্য কোনো শাসকের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন তথা যুদ্ধে লিপ্ত হবার পূর্বে ব্রিটিশদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।

2.2 "দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গিয়েছিল"

লর্ড ডালহৌসির এই কার্যকলাপ অধিগ্রহণ করে নেওয়া সমস্ত অঞ্চল তথা দেশীয় রাজ্যসমূহ গভীর অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত অবধে যে পরিমাণ অসন্তোষ ঘনীভূত হয় তা এমন আর কোথাও দেখা যায়নি। এখানে কুশাসনের অজুহাতে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং কলিকাতায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। ব্রিটিশরা ভেবেছিল নবাব ওয়াজিত আলি একজন জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না। কিন্তু আসলে তাঁকে প্রজারা মন থেকে ব্যাপকভাবে ভালোবাসতো। যখন তিনি তাঁর প্রিয় লক্ষ্ণৌ শহর ছেড়ে চলে যান তখন প্রচুর লোক বিলাপ করতে করতে উনার পেছন পেছন কানপুর পর্যন্ত যায়।

নবাবের নির্বাসনের ফলে জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হওয়া তীব্র ক্ষোভের তথা অপমানের এই ব্যাপক অনুভূতিকে ওই সময়ের অনেক পর্যবেক্ষক লিপিবদ্ধ করেন। এদের মধ্যে একজন লেখেন, "দেহ হতে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল। এই

মানচিত্র 1
1857 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ

শহরের দেহ প্রাণহীন অবস্থায় পড়েছিল। শহরের এমন কোনো রাস্তা বা বাজার এবং বাসস্থান ছিল না যেখান থেকে 'জান-এ-আলম' (নবাব) হতে বিচ্ছেদের মর্মবেদনার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল না। একটি লোকসঙ্গীতে আক্ষেপের সুরে গাওয়া হয়, "ইংরেজ বাহাদুর এল এবং আমাদের দেশ নিয়ে গেল (Angrez-Bahadur ain, mulk lailinho)।

বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় জনসাধারণের আবেগ আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। নবাবকে সরিয়ে দেওয়ায় তাঁর রাজদরবার এবং এর সাথে জড়িত সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটে। ফলতঃ সঙ্গীতকার, নর্তকি, কবি, কারিগর, বাবুর্চি, চাকর, প্রশাসনের সাথে যুক্ত কর্মচারী এবং অন্যান্যরা তাদের জীবন-জীবিকা হারায়।

2.3 *ফিরঙ্গি রাজত্ব* (এর আগমন) এবং একটি পর্বের পরিসমাপ্তি

অবধ-এ দুর্দশার কারণে রাজকুমার, তালুকদার, কৃষক এবং সিপাহী সবাই এক ক্ষোভের সূত্রে বাধা পড়ে। তারা ফিরঙ্গি শাসনকে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী করে। তারা যে সমস্ত জিনিসকে মূল্যবান মনে করতো, সম্মান প্রদর্শন করতো তথা

উৎস 3

নবাব চলে গেছেন

অন্য একটি সঙ্গীতে নবাবের দুর্দশা সম্পর্কে বিলাপ করা হয়েছে যাকে তাঁর জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল :

অভিজাত এবং কৃষক সবাই একসাথে
কাঁদছিল

এবং সারা বিশ্ব কাঁদছিলো এবং বিলাপ
করছিলো

হায়! জান-এ-আলম (নবাব) দেশ
থেকে বিদায় নিয়ে বিদেশ চলে গেছেন।

➲ সম্পূর্ণ অংশটি পড় এবং ওয়াজিদ-আলি-শাহ-এর প্রস্থানের কারণে জনগণ কেন বিলাপ করেছিল তা আলোচনা করো।

চিত্র 11.6
অবধের একজন জমিদার, 1880 খ্রিস্টাব্দ

আপন বলে মনে করতো - সেগুলো ভেঙে পড়ে। ভাবাবেগের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয়, ঐতিহ্য এবং আনুগত্য 1857-এর বিদ্রোহে অভিব্যক্ত হয়। অন্যান্য স্থানের তুলনায় অবধ (অযোধ্যা)-এ এই বিদ্রোহ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটি গণ প্রতিরোধ হিসেবে প্রকাশ পায়।

অবধ (অযোধ্যা) দখলের ফলে কেবলমাত্র নবাবকেই সিংহাসন চ্যুত করা হয়নি; এই অঞ্চলের তালুকদারদেরও নিজেদের তালুকদারি থেকে উৎখাত করা হয়। অবধ-এর সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় তালুকদারদের জায়গীর এবং দুর্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাঁরা কয়েক প্রজন্ম ধরে জমি ও ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে আসছিল। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে তালুকদারদের কাছে সশস্ত্র সিপাহি ছিল। তারা দুর্গ নির্মাণ করেছিল এবং যতদিন পর্যন্ত তারা নবাবদের আধিপত্য স্বীকার করতো এবং তাদের তালুক থেকে রাজস্ব প্রদান করতো ততদিন পর্যন্ত তারা স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকারও লাভ করতো। কিছু অধিকতর বড়ো মাপের তালুকদারদের কাছে 12000-এর মতো পদাতিক সিপাহি ছিল। এমনকি ছোটো তালুকদারেদের কাছেও 200-এর মতো পদাতিক সৈন্য থাকতো। ইংরেজরা এই তালুকদারদের শক্তিকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। অবধ (অযোধ্যা) দখলের ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই তালুকদারদের সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া হয় এবং তাদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

ইংরেজদের ভূমি রাজস্ব নীতির ফলে তালুকদারদের সামাজিক পদমর্যাদা এবং কর্তৃত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অবধ (অযোধ্যা) অধিগ্রহণের পরে 1856 খ্রিস্টাব্দে 'সামারি সেটেলমেন্ট' নামে ইংরেজ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। এই ভূমি বন্দোবস্ত এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তালুকদাররা অনধিকার প্রবেশকারী। জমির উপর তালুকদারদের কোনো স্থায়ী অধিকার নেই, তারা বল প্রয়োগ তথা জোচ্চোরির মাধ্যমে জমির উপর দখলদারী কায়েম করেছিল। এই সামারী সেটেলমেন্টের ফলে তালুকদারদের নিজেদের দখলীকৃত জমি থেকে উৎখাত করা হতে থাকে। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ইংরেজদের আগমনের পূর্বে তালুকদারদের কাছে অবধের (অযোধ্যার) 67 শতাংশ গ্রাম ছিল; আর সামারী সেটেলমেন্ট চালু হবার পর এই সংখ্যা নেমে আসে 38 শতাংশে। অবধের (অযোধ্যার) দক্ষিণাঞ্চলের তালুকদারগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অর্ধেকেরও বেশি গ্রাম হাতছাড়া হয়।

ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব আধিকারিকগণ বিশ্বাস করতেন যে, তালুকদারদের সরিয়ে দিয়ে তারা ওই জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেবে এবং এভাবে কৃষকদের শোষণের মাত্রা কমবে এবং অন্যদিকে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। রাজ্যের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেলেও কৃষকদের উপর চাপ হ্রাস পায়নি। আধিকারিকগণ শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে, অবধের বিরাট অঞ্চলে অনেকটা বর্ধিত হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিছু কিছু অঞ্চলের রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অর্থাৎ অবধের অধিগ্রহণের ফলে তালুকদার বা কৃষকশ্রেণি কারোরই সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

তালুকদারদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে পুরো একটি সমাজ ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে। তালুকদারদের সাথে কৃষকদের যে একটা আনুগত্য তথা পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক ছিল - সেটা বিঘ্নিত হয়। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে তালুকদাররা উৎপীড়ন করতো ঠিকই তবুও তাঁদের মধ্যে অনেকেই দয়ালু অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতেন। তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে নানা ধরনের পাওনা আদায় করতেন কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের সহায়তাও করতেন। এখন ইংরেজদের শাসনাধীনে জমির অতিরিক্ত কর নির্ধারণের ফলে তারা অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদান তথা কঠোর কর আদায় পদ্ধতির দ্বারা নিষ্পেষিত হতে থাকে। এর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না যে শস্যহানি বা কষ্টের সময় রাজস্ব লাঘব করা হবে অথবা স্থগিত রাখা হবে। উৎসবের সময় কৃষকদের ঋণ বা অন্যান্য সহায়তা পাবারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, যা তারা পূর্বে তালুকদারদের কাছ থেকে পেয়ে থাকতো।

অবধ (অযোধ্যা) -এর মতো যে সকল এলাকাগুলোতে 1857-এর সময় তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়, সমস্ত অঞ্চলে তালুকদার এবং কৃষকদের দ্বারা লড়াই পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে অনেক তালুকদারই অবধ (অযোধ্যা) -এর নবাবের অন্তর্গত ছিল এবং তারা বেগম হজর মহল (নবাবের পত্নী) -এর সাথে লড়াইয়ে যোগদান করে; এদের মধ্যে কেউ কেউ পরাজিত হবার পরেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেনি।

কৃষকদের অসন্তোষ সে সময় সিপাহীদের ব্যারাকেও পৌঁছায়। এর কারণ এক বিরাট সংখ্যক সিপাহি অবধ (অযোধ্যা) -এর গ্রামগুলো থেকে নিযুক্ত হয়েছিল। কয়েক দশক ধরে সিপাহীরা নিম্ন বেতন এবং সহজে ছুটি মঞ্জুর না হওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট ছিল। 1850-এর দশক আসতে আসতে তাদের মধ্যে আরো নতুন নতুন অসন্তোষের কারণ সৃষ্টি হতে থাকে।

1857-এর মহাবিদ্রোহের পূর্ববর্তী বছরগুলোতে সিপাহীদের সাথে তাদের শ্বেতাঙ্গ আধিকারিকদের সম্পর্কের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। 1820-এর দশকে শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা সিপাহীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দিত। তারা সিপাহীদের অবসরকালীন বিনোদনে সামিল হত। তাদের সাথে কুস্তি লড়ত, তলোয়ারবাজি করত, এমনকি শিকারেও যেত। তাদের অনেকেই সাবলীলভাবে হিন্দুস্থানি ভাষায় কথা বলতে পারতো এবং এদেশের সংস্কৃতি তথা রীতিনীতির সাথে পরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে আধিকারিকদের নিয়মানুবর্তিতা তথা অভিভাবকের স্নেহ উভয়ই ছিল।

1840-এর দশকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। অফিসারদের মধ্যে এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব তৈরি হয় এবং তারা সিপাহীদের তথা জাতিগতভাবে নিম্নশ্রেণির বলে মানতে শুরু করে। সংবেদনশীল সিপাহীদের সাথে রূঢ় ব্যবহার শুরু করে। সিপাহীদের গালমন্দ করা তথা দৈহিক নির্যাতন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এভাবে সিপাহি এবং অফিসারদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। বিশ্বাসের স্থানে সন্দেহ ঢুকে পড়ে। চর্বি মাখানো কার্তুজের ঘটনা ছিল এরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উৎস 4

তালুকাদারদের চিন্তাভাবনা

রায়বেরেলির সন্নিকটস্থ কলকঙ্করের রাজা হনওয়ন্ত সিং তালুকদারদের মনোভাব খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে হনওয়ন্ত সিং একজন ইংরেজ অফিসারকে আশ্রয় দেন তথা সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেন। ওই অফিসারের সাথে শেষ দর্শনে হনওয়ন্ত সিংহ তাকে বলেন :

> সাহেব, আপনার দেশবাসীরা আমাদের দেশে আসে এবং আমাদের রাজাকে বিতাড়িত করে। আপনাদের মতো অফিসারদের প্রতিটি জেলায় ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পাঠায়। এক ধাক্কায় আপনি আমার কাছ থেকে ওই জমি ছিনিয়ে নেন - যে জমি স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পরিবার মালিকানাধীন ছিল। আমি কিছুই বলিনি। হঠাৎ আপনাদের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। এই দেশের জনগণ আপনাদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়। তখন আপনি আমার নিকট আসেন, যাকে আপনিই সর্বস্বান্ত করেছিলেন। আমি আপনার জীবন রক্ষা করলাম। কিন্তু এখন আমি আমার সিপাহীদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি যাতে আপনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সচেষ্ট হতে পারি।

➲ এই উদ্ধৃতাংশটি হতে তোমার তালুকদারদের মনোভাব সম্পর্কে কী জানতে পারো? 'এই দেশের লোক' বলতে হনওয়ান্ত সিং কাদের বুঝিয়েছেন? জনগণের ক্রোধের কারণগুলো সম্পর্কে তিনি কী বলেছেন?

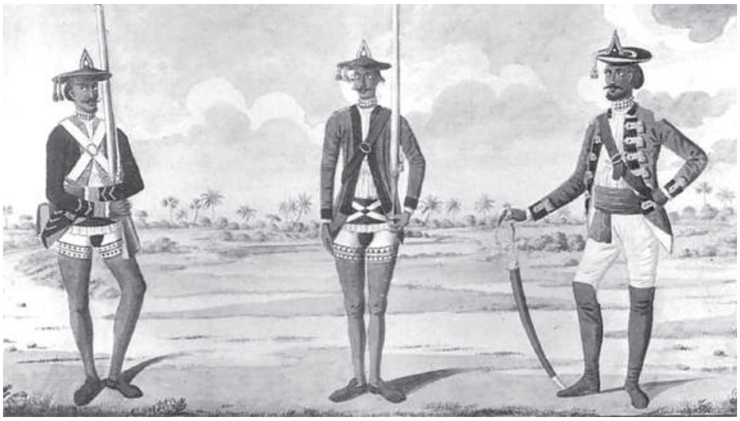

চিত্র 11.7
ইউরোপীয় পোশাকে বাংলার সিপাহীগণ

এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, উত্তর ভারতে সিপাহী এবং গ্রামীণ জগতের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বেঙ্গাল আর্মির সিপাহীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যককে অবধ (অযোধ্যা) এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের গ্রামগুলো থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল ব্রাহ্মণ অথবা তথাকথিত 'উঁচু জাতের'। বস্তুতপক্ষে অবধকে (অযোধ্যা) বেঙ্গাল আর্মির আঁতুড়ঘর (nursery) বলা হত। সিপাহীদের পরিবারের সদস্যরা তাদের আশেপাশে ঘটে চলা পরিবর্তনগুলো দেখেছিল এবং যে সমস্ত বিপদ অনুভব করেছিল সেগুলো সিপাহীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছিল। ফলত নতুন কার্তুজ সম্পর্কে সিপাহীদের ভয়, ছুটি মঞ্জুর হওয়া সম্পর্কে তাদের ক্ষোভ শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের ক্রমবর্ধমান দুর্ব্যবহার এবং জাতপাত নিয়ে গালি গালাজের প্রতি বেড়ে চলা অসন্তোষ গ্রামগুলোতেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। সিপাহীদের সাথে গ্রামীণ জীবনের এই যোগাযোগের মহাবিদ্রোহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যখন কোনো সিপাহি তার অফিসারের আদেশ অমান্য করতো এবং হাতে অস্ত্র তুলে নিত তখন খুব দ্রুততার সাথে গ্রামে বসবাস করা তার স্বজনরাও তার সাথে যোগ দিত। প্রতিক্ষেত্রেই কৃষকরা শহরে চলে আসে এবং সিপাহীদের সাথে যোগ দেয় এবং এদের সাথে শহরের সাধারণ জনগণও দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

➲ আলোচনা করো...

তোমার রাজ্যের জনগণ 1857-এর মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল কিনা তা খুঁজে বের করো। যদি তারা অংশগ্রহণ করে থাকে তবে এর কারণ খুঁজে বের করো। আর যদি অংশগ্রহণ না করে থাকে তবে এর কারণও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করো।

3. বিদ্রোহীরা কী চেয়েছিল? (What the Rebels Wanted)

বিজেতা হিসেবে ইংরেজরা নিজেদের প্রচেষ্টা, ক্লেশ তথা বীরত্বকে নথিভুক্ত করেছিল। তারা বিদ্রোহীদের একদল অকৃতজ্ঞ এবং বর্বর লোক হিসেবে দেখিয়েছিল। বিদ্রোহীদের দমন পীড়নের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল - তা হল তাদের কণ্ঠরোধ করা। অল্প সংখ্যক বিদ্রোহীরা এই ঘটনাক্রম তাদের মতো করে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পায়। অধিকন্তু বিদ্রোহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল সিপাহি এবং সাধারণ জনগণ - যারা ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। এভাবে নিজেদের মতামত, আদর্শ প্রচারের জন্য তথা বিদ্রোহে যোগদানের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু ঘোষণাপত্র এবং ইস্তেহার ছাড়া বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রচারিত এমন আর কিছুই আমাদের কাছে নেই, যার থেকে আমরা বিদ্রোহীদের মতামত সম্পর্কে জানতে পারি। এভাবে 1857 খ্রিস্টাব্দে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানার জন্য বাধ্য হয়েই আমাদের অবধারিতরূপে ইংরেজদের লিখে যাওয়া বিবরণীর উপরই নির্ভর করতে হয়। যদিও এগুলো হতে ইংরেজ অফিসারদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কেই জানা যায় এবং বিদ্রোহীরা আসলে কী চেয়েছিল - সে ব্যাপারে খুব কমই জানা যায়।

3.1 একতার স্বপ্ন (The vision of unity)

1857-এ বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রচারিত ঘোষণাপত্র গুলোতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণের প্রতি বারংবার আবেদন জানানো হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ঘোষণাপত্র মুসলিম রাজকুমারদের দ্বারা অথবা তাদের নামে প্রচারিত হয়েছিল সেগুলোতে হিন্দুদের ভাবাবেগেরও খেয়াল রাখা হত। এই বিদ্রোহকে এমন একটি যুদ্ধ হিসেবে দেখানো হয়, যেখানে হিন্দু মুসলিম উভয় অংশের জনগণের লাভ-ক্ষতি সমান ছিল। বাহাদুর শাহ্-এর নামে প্রচারিত ঘোষণাপত্রগুলোতে জনসাধারণকে মহম্মদ এবং মহাবীরের দোহাই দিয়ে লড়াইয়ে যোগদান করার আবেদন জানানো হয়েছিল। এগুলোতে প্রাক-ব্রিটিশযুগের হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ও মোঘল আমলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহাবস্থানের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা তুলে ধরা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল যে, বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে কোনো রকম বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। 1857-এর ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশে পশ্চিম অংশে বারেলীতে ইংরেজরা এধরনের বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রায় 50,000 টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উৎস 5

আজমগড়ের ঘোষণাপত্র, 25 আগস্ট, 1857

বিদ্রোহীরা কী চেয়েছিল, এই ব্যাপারে আমরা নীচের উৎস হতে জ্ঞান লাভ করতে পারি :

এটা সর্বজনবিদিত যে, এই সময়ে হিন্দুস্থানের জনতা, হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ই বিধর্মী তথা নাস্তিক ইংরেজদের স্বৈরাচার এবং নিপীড়নেই জেরবার হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য দেশের সমস্ত বিত্তশালী লোকেদের, বিশেষ করে যারা শাহী মুসলিম পরিবারসমূহের সাথে যুক্ত এবং যাদের সাধারণ লোকেদের ধর্মরক্ষক এবং প্রভু মানা হয়, তাদের এটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যে তারা নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন করেও জনকল্যাণার্থে কাজ করবে। নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য বহুকাল পূর্বে গৃহত্যাগী এবং ভারত থেকে ইংরেজদের সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য (সর্বশক্তি প্রয়োগ করে) সচেষ্ট অনেক হিন্দু এবং মুসলমান শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আমার নিকট আসেন এবং তাঁরা এই ভারতীয় ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন। অধিকন্তু আমার সম্পূর্ণ আশা ছিল যে, শীঘ্রই পাশ্চাত্য থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। এজন্য সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বেশ কয়েকটি ভাগে রচিত এই ইস্তেহারটি জারি করা হল এবং এই ইস্তেহারটি সযত্নে বিবেচনা করা তথা এটি মেনে চলা আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই সর্বজনীন উদ্দেশ্য সাধনে সবাই যোগদান করতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যাদের কাছে নিজেদের ভরণপোষণ করার কোনো মাধ্যম নেই, আমার পক্ষ থেকে তাদের দৈনিক ভোজনের বন্দোবস্ত করা হবে। আর সবার এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু এবং মুসলিম দুই ধর্মেরই প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে, অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্নদের রচনা এবং পণ্ডিত জ্যোতিষীদের গণনায় ... সর্বত্র এই সহমত দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ অথবা অন্য কোনো স্থানে এই ইংরেজরা পা রাখার জায়গা খুঁজে পাবে না। এই কারণে এটা সবার দায়িত্ব যে, ইংরেজদের শাসন চালিয়ে যাবার সমস্ত আশা ছেড়ে দিতে হবে। পরিবর্তে সাধারণ জনগণ আশার সাথে থাকবে এবং সর্বজনীন স্বার্থে নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যমে বাদশাহী অথবা সম্রাট শাসিত সরকারের প্রজা হওয়ায় সম্মান লাভ করার অধিকারী হবে এবং এইভাবে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাবে। অন্যদিকে যদি এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় তবে তাদের নিজেদের মুর্খামির জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

contd

উৎস 5 *(contd)*

ভাগ I – জমিদারদের সম্পর্কে : এটা স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ সরকার জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় অত্যধিক *জমা* (ভূমি-রাজস্ব) চাপিয়ে দেয় এবং বকেয়া পরিশোধ না করায় অনেক জমিদারের জমিদারি নিলাম করে তাদের সর্বস্বান্ত করে দেয়। সাধারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কোনো চাকরানি অথবা দাসের দ্বারা দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমায়ও সম্মানিত জমিদারদের আদালতে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, গারদে পোড়া হচ্ছে এবং তাদের অপদস্থ করা হচ্ছে। জমিদারি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায় অত্যধিক স্ট্যাম্প মূল্য এবং দেওয়ানি আদালতের অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় খরচ ... প্রভৃতির উদ্দেশ্য হল মামলাকারীদের দরিদ্র হতে দরিদ্রতর করা। জমিদারের কোষাগার হতে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সড়ক প্রভৃতির জন্য বাৎসরিক চাঁদা অনুদান হিসেবে কর আদায় করা হয়ে আসছে। বাদশাহের অধীনে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে এ ধরনের কোনোরূপ অর্থ আদায় করা হবে না। 'জমা' আরও কমিয়ে দেওয়া হবে। জমিদারদের মর্যাদা এবং সম্মান সুরক্ষিত রাখা হবে এবং প্রত্যেক জমিদারের নিজের জমিদারীতে অবাধ শাসনাধিকার থাকবে।

ভাগ II – ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে : এই বিধর্মী এবং নাস্তিক ব্রিটিশ সরকার নীল, সুতির কাপড় এবং অন্যান্য দ্রব্য যেগুলোর ব্যবসা জাহাজের মাধ্যমে করা হত সেই সকল উত্তম মূল্যবান দ্রব্যাদির ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে নিয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য কেবলমাত্র ছোটোখাটো দ্রব্যের ব্যবসা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর পাশাপাশি ডাক খরচ, প্রবেশ শুল্ক (taxed) এবং বিদ্যালয়ের জন্য অনুদানের নামে ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর কর আরোপ করা হয়েছে। এই সকল ত্যাগ স্বীকার করার পরেও মর্যাদাহীন কোনো ব্যক্তির সাধারণ অভিযোগে ব্যবসায়ীদের জেলে পোরা হচ্ছে এবং তাদের মর্যাদাহানি ঘটছে। বাদশাহ-এর অধীনে সরকার প্রতিষ্ঠা হলে উপরোক্ত সকল প্রকার প্রতারণামূলক কাজ কারবার বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সড়কপথ তথা জলপথে কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত ধরনের পণ্যের ব্যবসা ভারতের দেশীয় বণিকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে, ... এই কারণে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা তথা বাদশাহ-এর সরকারকে অর্থ ও লোকবল দিয়ে সহায়তা করা সকল ব্যবসায়ীদের কর্তব্য।

ভাগ III – সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে : আজকাল এটা কোনো লুকানো ব্যাপার নয় যে, ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক এবং সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হওয়া ভারতীয়রা যোগ্য সম্মান পায় না। তাদের বেতন কম এবং তাদের কাছে কোনো ক্ষমতা নেই। উভয়ক্ষেত্রেই উচ্চমর্যাদা তথা বেতনভাতা সম্পন্ন পদগুলোতে শুধুমাত্র ইংরেজরাই বসতে পারে। ... এইজন্য ব্রিটিশদের অধীনে কর্মরত সকল ভারতীয়দের নিজস্ব ধর্ম এবং স্বার্থের দিকে নজর দেওয়া তথা ইংরেজদের আনুগত্য ত্যাগ করে বাদশাহ-এর সরকারের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং তারা বর্তমানে মাসে 200 এবং 300 টাকা করে বেতন পাবে এবং তারা ভবিষ্যতে উঁচুপদে আসীন হতে পারবে। ...

ভাগ IV – কারিগরদের সম্পর্কে : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্য আমদানি করার ফলে তাঁতি, সুতিবস্ত্র প্রস্তুতকারক, ছুঁতোর, কামার এবং মুচি-প্রমুখরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং ইংরেজরা সমস্ত রকম পেশায় এমনভাবে থাবা বসিয়েছে যে, সমস্ত দেশীয় কারিগররা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। বাদশাহ-এর সরকারে সমস্ত দেশীয় কারিগরদের রাজা এবং ধনীদের সেবায় নিয়োজিত করা হবে এবং নিঃসন্দেহে এতে উন্নতি ঘটবে। এজন্য এই সমস্ত কারিগরদের ইংরেজদের সেবা করা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ভাগ V – পণ্ডিত, ফকির এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে : পণ্ডিত এবং ফকিরগণ যথাক্রমে হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের অভিভাবকস্বরূপ এবং ইউরোপীয়রা উভয় ধর্মেরই শত্রুস্বরূপ এবং বর্তমানে ধর্মীয় কারণেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ ধূমায়িত হচ্ছে। পণ্ডিত এবং ফকিরদের কর্তব্য হল যে তাঁরা যাতে আমার সামনে উপস্থিত হন এবং এই পবিত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ...

➲ এই ঘোষণাপত্রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে? ঘোষণাপত্রের প্রতিটি ভাগ মনযোগ সহকারে পড়। ঘোষণাপত্রে ব্যবহৃত ভাষা লক্ষ করো এবং দেখো যে, এতে কোন্ ধরনের ভাবাবেগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উৎস 6

সিপাহীরা কী ভেবেছিল

বিদ্রোহী সিপাহীদের একটি আর্জি বা আবেদন :

একশ বছর পূর্বে হিন্দুস্থানে ব্রিটিশদের আগমন ঘটে এবং ধীরে ধীরে সৈন্যদল গড়ে তুলতে থাকে এবং সমস্ত রাজ্যের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সর্বদা তাদের সেবা করেছে এবং আমরাও তাদের অধীনে চাকুরিতে যোগ দিয়েছি। ... ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিটি অঞ্চল দখল করেছে। তাদের জন্য আমাদের মতো হাজার হাজার হিন্দুস্থানি জওয়ানের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা কোনো বাহানা অথবা বিদ্রোহ করিনি।

কিন্তু আঠারশ সাতান্ন সালে ব্রিটিশরা এই আদেশ জারি করে যে, এখন থেকে সিপাহীদের ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত নতুন কার্তুজ এবং বন্দুক দেওয়া হবে, নতুন কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মেশানো ছিল এবং আটার মধ্যে হাড়ের গুড়া মেশানো ছিল। এমনকি প্রতিটি পদাতিক, অশ্বারোহী বাহিনী তথা গোলান্দাজ বাহিনীতে সেগুলো বিতরণও করা হয়েছিলো ...

ইংরেজরা ওই সকল কার্তুজ থার্ড লাইট কেভেলরীর সওয়ারকে (অশ্বারোহী সেনা) দিয়েছিল এবং সেগুলোকে দাঁত দিয়ে কাটার জন্য আদেশ দিয়েছিল। সিপাহীরা এই আদেশের বিরোধিতা করে এবং তারা সেগুলো কখনোই দাঁত দিয়ে কাটবে না বলে জবাব দেয়। কারণ সেগুলোকে দাঁত দিয়ে কাটলে তাদের বিশ্বাস নষ্ট হবে এবং তারা ধর্মচ্যুত হবে। ... এর পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ অফিসারগণ তিন রেজিমেন্টের সিপাহীদের প্যারেড করতে নামিয়ে দেয়। 1400 ইংরেজ সিপাহি, ইউরোপীয় সৈনিকদের অন্যান্য ব্যাটেলিয়ন এবং অশ্বারোহী গোলান্দাজ বাহিনীকে সজ্জিত করে ভারতীয় সৈনিকদের ঘিরে ফেলা হয়। সমস্ত পদাতিক বাহিনীর সামনে গোলাভর্তি ছয়-ছয়টি কামান স্থাপন করা হয় এবং 84 জন নতুন সিপাহীকে গ্রেপ্তার করে, লোহার বেড়ি পরিয়ে জেলে বন্দি করে দেওয়া হয়। ... ছাওনীর ঘোড় সাওয়ারদের জেলে পুরে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে আমরা ভীত হয়ে কার্তুজগুলো দাঁত দিয়ে কাটতে রাজি হয়ে যাই, এজন্য আমার এবং আমাদের সকল দেশবাসীরা একত্রিত হই এবং আমাদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করি ... আমরা দুই বছর লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য হই এবং যেসকল রাজা এবং সর্দারগণ ধর্ম তথা আস্থার প্রশ্নে আমাদের সাথে ছিলেন তারা সমস্তরকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখনও আমাদের পাশে রয়েছেন। আমরা দুই বছর ধরে লড়াই করেছি যাতে আমাদের বিশ্বাস এবং ধর্ম দূষিত না হয়। যদি একজন হিন্দু বা মুসলমান ধর্মভ্রষ্ট হয় তবে এই দুনিয়ার আর কিই বা থাকবে।

➲ এই আর্জি বা আবেদনপত্রে সিপাহি বিদ্রোহের যে সকল কারণের বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোর সাথে তালুকদারদের দ্বারা উল্লেখিত কারণসমূহের (উৎস 3) তুলনা করো।

3.2 উৎপীড়ন নিপীড়নের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর বিরোধিতা

এই সমস্ত ঘোষণাপত্রে ব্রিটিশ শাসন (যাকে বিদ্রোহীরা ফিরিঙ্গি রাজ বলতো) এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়। তারা ব্রিটিশদের ভারতীয় রাজ্য দখল বা অধিগ্রহণে তথা চুক্তিভঙ্গ করার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। বিদ্রোহের নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল যে ইংরেজদের বিশ্বাস করা যায় না।

জনসাধারণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিল যে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছোটো বড়ো ভূস্বামীদের তাদের জমি থেকে বেদখল করে দেয় এবং বিদেশী ব্যবসা বাণিজ্য দেশীয় কারিগর এবং তাঁতীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ব্রিটিশ শাসনের সাথে সম্পর্কিত

সমস্ত কিছুর উপর আক্রমণ করা হয় এবং অতি পরিচিত তথা সযত্নে লালিত জীবনশৈলী ধ্বংসের জন্য ফিরিঙ্গিদের দায়ি করা হয়। বিদ্রোহীরা তাদের ওই পুরনো সামাজিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল।

ঘোষণাপত্রে এই ব্যাপক ভয়কে ব্যক্ত করা হয় যে, ব্রিটিশরা হিন্দু এবং মুসলিমদের জাতি তথা ধর্মকে বিনষ্ট করতে উদ্যত এবং তারা জনগণকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায়। এই ভীতির ফলে জনগণ সেইসময় ছড়িয়ে পড়া অনেক গুঁজব বিশ্বাস করতে শুরু করে। জনগণকে নিজেদের জীবন-জীবিকা, বিশ্বাস, সম্মান তথা আত্ম পরিচয় রক্ষার জন্য তথা ব্যাপক সর্বজনীন কল্যাণার্থে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে সামিল হতে আহ্বান জানানো হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহুস্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া বিদ্রোহ ওই সকল শক্তির বিরুদ্ধেও সম্প্রসারিত হয় যাদের ব্রিটিশদের দেশের অথবা স্থানীয় অত্যাচারী হিসেবে দেখা হত। প্রায়শই বিদ্রোহীরা শহরের সম্ভ্রান্তদের ইচ্ছে করেই সম্মানহানি করত। গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহীরা মহাজনদের হিসাবের খাতা জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের বাড়িঘর তছনছ করে। এ থেকে বোঝা যায় যায় যে, বিদ্রোহীরা সমস্ত ধরনের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ছিল এবং বহুদিন ধরে সমাজের চলে আসা উঁচু নীচুর ভেদাভেদকে পাল্টে ফেলতে চেয়েছিল। এখানে আমরা একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাই, সম্ভবত জনগণ এমন একটি সমাজ চেয়েছিল যেখানে সকলের আরো অধিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা বিদ্রোহীদের ওই সকল ঘোষণাপত্রসমূহে প্রকাশ পায়নি। সেগুলোতে ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

3.3 বিকল্প শাসনব্যবস্থার খোঁজ

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরে দিল্লি, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের মতো অঞ্চলে বিদ্রোহীরা এক ধরনের কর্তৃত্ব তথা প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেস্টা চালায়। অবশ্যই তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তবুও এই ধরনের প্রচেস্টা হতে বোঝা যায় যে, বিদ্রোহী নেতৃত্বরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক-ব্রিটিশ যুগকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। নেতৃত্বরা রাজ দরবারের সংস্কৃতির যুগে ফিরে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের পদে লোক নিয়োগ করা হয়, ভূমি রাজস্ব আদায়ে তথা সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের বন্দোবস্থ করা হয়, লুটপাট বন্ধ করার জন্য আদেশ জারি করা হয়। এরই পাশাপাশি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনাও চালিয়ে যাওয়া হতে থাকে। সেনাবাহিনীতে পদমর্যাদার ক্রম অনুসারে সেনা নিয়োগ করা হয়। এই সমস্ত প্রচেস্টায় বিদ্রোহীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মোঘল শাসনব্যবস্থা হতে অনুপ্রেরণা নেয়, যার সমস্ত কিছু আগেই হারিয়ে গিয়েছিল।

বিদ্রোহীদের দ্বারা প্রবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামোর উদ্দেশ্য ছিল মূলত লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রসদের বন্দোবস্ত করা। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাঠামোগুলো ব্রিটিশদের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে পারেনি। তবুও অবধ (অযোধ্যায়)-এ, যেখানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সবচেয়ে বেশিদিন চলেছিল, সেখানে লক্ষ্ণৌ রাজদরবার দ্বারা জবাবী হামলার পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছিল এবং 1857-এর শেষ মাস তথা 1858-এর প্রথমদিক পর্যন্ত সিপাহীরা ব্রিটিশদের বাধা দিয়ে চলছিল।

➲ আলোচনা করো...

বিদ্রোহীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃ রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ কী ধরনের মুখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন বলে তুমি মনে করো?

4. দমনপীড়ন (Repression)

1857-এর মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে আমাদের নিকট যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে সেগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই বিদ্রোহ দমন করা ইংরেজদের পক্ষে খুব একটা সহজ কাজ ছিল না।

উত্তর ভারত পুনরুদ্ধার করার জন্য সৈন্য পাঠানোর আগে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর কাজকে সহজ করার উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে বেশ কিছু আইন পাশ করে। 1857-এর মে এবং জুন মাসে পাশ হওয়া বেশ কিছু আইনের দ্বারা সমগ্র উত্তর ভারতে মার্শাল আইন চালু করে দেওয়া হয় এবং এরই সাথে মিলিটারি অফিসার সহ সাধারণ ইংরেজদেরও বিদ্রোহে যুক্ত সন্দেহে যে-কোনো ভারতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া তথা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে আইন আদালত অথবা মামলা মোকদ্দমার চিরাচরিত কার্যপ্রণালী স্থগিত রেখে বিদ্রোহী ভারতীয়দের জন্য একটি নির্দিষ্ট শাস্তিই ধার্য করা হয় তা হল মৃত্যুদণ্ড।

সদ্য পাশ হওয়া বিশেষ আইন এবং ব্রিটেন থেকে আনা নতুন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা বলীয়ান হয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন প্রক্রিয়া শুরু করে। বিদ্রোহীদের ন্যায় তারাও দিল্লির গুরুত্ব উপলব্ধি করে। ফলে তারা দ্বিমুখী আক্রমণ শুরু করে। একদিকে কলিকাতা হতে, অন্যদিকে পাঞ্জাব থেকে সৈন্যরা দিল্লি পুনরুদ্ধারে যাত্রা শুরু করে, যদিও পাঞ্জাব মূলত শান্ত ছিল। দিল্লি পুনরুদ্ধারে ইংরেজদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ১৮৫৭-এর জুন মাসের প্রথমদিক থেকে শুরু হয়, কিন্তু তারা এই শহরটি

উৎস 7

বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা

অবধ (অযোধ্যা)-এর গ্রামাঞ্চল থেকে (যাকে নীচের বর্ণনায় 'অবধ' (অযোধ্যা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে) একজন অফিসার লিখেছেন :

> অবধ (অযোধ্যা)-এর জনগণ উত্তর ভারত থেকে যোগাযোগের পথ ক্রমশ দখল করে নেয় ... অবধ-এর জনগণ ছিল গ্রামবাসী ... ব্রিটিশ সরকার এদের কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করতে পারছে না। প্রয়োজনে তারা ছত্রভঙ্গ হচ্ছে আবার একতাবদ্ধও হচ্ছে। অসামরিক কর্তৃপক্ষের মতে এইসব গ্রামবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি এবং তাদের দখলে আগ্নেয়াস্ত্রও রয়েছে।

➲ এই বিবরণ অনুসারে গ্রামবাসীদের মোকাবিলা করার জন্য ইংরেজদের কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ?

মানচিত্র 2
এখানে বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে দেখানো হয়েছে। এরই সাথে ইংরেজরা যে পথ ধরে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে সেইপথও দেখানো হয়েছে।

চিত্র 11.8
দিল্লি রিজ-এ অবস্থিত একটি মসজিদ। 1857-58 খ্রিস্টাব্দে ফেলিস বিয়েতো-র নেওয়া একটি আলোকচিত্র।
1857 খ্রিস্টাব্দের পরে ব্রিটিশ আলোক চিত্রকারেরা জনশূন্যতা এবং ধ্বংসের অসংখ্য ছবি তোলে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকেই পুরোপুরিভাবে দখল করতে সমর্থ হয়। উভয়পক্ষই প্রবলভাবে লড়াই করে এবং উভয়েরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর একটি কারণ সমস্ত উত্তর ভারতের বিদ্রোহীরা রাজধানী রক্ষার জন্য দিল্লিতে জমা হয়েছিল।

গাঙ্গেয় সমভূমিতেও ব্রিটিশদের পুনর্দখলের অভিযান ধীরগতিতে চলে। ইংরেজ সেনাবাহিনীকে একের পর এক গ্রাম পুনরুদ্ধার করতে হয়। গ্রামাঞ্চল এবং এর আশেপাশের বাসিন্দারা ব্রিটিশদের বিপক্ষে ছিল। তারা তাদের বিদ্রোহ বিরোধী অভিযান শুরু করার সাথে সাথেই বুঝতে পারে যে শুধুমাত্র একটি সাধারণ সিপাহি বিদ্রোহের সাথেই নয়, তারা এমন একটি আন্দোলনের মোকাবিলা করছে, যার পেছনে জন সমর্থন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অবধ (অযোধ্যা)-এ ফোরসিথ নামক জনৈক ইংরেজ আধিকারিক হিসাব করে দেখেন যে, আনুমানিক প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই বিদ্রোহে জড়িত ছিল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর 1858-এর মার্চ মাসে অঞ্চলটি ব্রিটিশদের অধীনে আসে।

ইংরেজরা বিশাল পরিমাণে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে। কিন্তু এটিই তাদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল না। বর্তমান উত্তর প্রদেশের এক বিশাল ভূভাগের বড়ো জমিদার এবং কৃষকরা মিলিতভাবে ইংরেজদের প্রতিহত করে। ইংরেজরা বড়ো জমিদারদের জমিদারি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই ঐক্যকে ভাঙ্গার চেস্টা করে। বিদ্রোহী জমিদারদের নিজেদের জমিদারি থেকে উৎখাত করা হয় এবং বিশ্বস্ত জমিদারদের পুরস্কৃত করা হয়। ইংরেজদের বিপক্ষে লড়তে গিয়ে অনেক জমিদার প্রাণ হারায় অথবা নেপালে পালিয়ে যায়। যেখানে তারা রোগব্যাধি অথবা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে।

চিত্র 11.9
সেকেন্দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ 1858 খ্রিস্টাব্দে ফেলিস বিয়েটোর নেওয়া আলোকচিত্র।
এখানে আমরা নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ নির্মিত রঙ্গ-বাগ (pleasure garden)-এর ধ্বংসাবশেষে চারজন লোক দেখতে পাচ্ছি। 1857 খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রঙ্গাবাগ-এর সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকা 2000-এরও অধিক বিদ্রোহী সিপাহীকে হত্যা করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা নরকঙ্কালগুলো বিদ্রোহের নিস্ফলতার একটি হিমশীতল সতর্কবার্তা বহন করে।

5. বিদ্রোহের চিত্র (Images of the Revolt)

এই বিদ্রোহ, বিদ্রোহীদের গতিবিধি এবং তাদের উপর যে পরিমাণে দমন পীড়ন হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানতে পারি?

আমরা দেখেছি যে, বিদ্রোহীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে লিখিত বিবরণ আমাদের কাছে খুব কমই রয়েছে। আমাদের কাছে বিদ্রোহীদের কিছু ঘোষণাপত্র এবং বিজ্ঞপ্তি তথা নেতাদের লেখা কিছু চিঠিও রয়েছে। তবুও আজ পর্যন্ত ইতিহাসবিদ্‌গণ ইংরেজদের লেখা বিবরণী হতেই প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীদের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছেন।

অবশ্যই এ ব্যাপারে সরকারি নথিপত্রে অজস্র বিবরণ রয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসকগণ এবং সামরিক বাহিনীর লোকেরা চিঠিপত্র, রোজনামচা (ডায়রি)। আত্মজীবনী এবং সরকারি ইতিহাসে তাদের নিজেদের বয়ান লিপিবদ্ধ করে গেছে। অসংখ্য স্মারকলিপি (memo) এবং নির্দেশনা (notes), পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদন হতে চলো আমরা দেখি এগুলো থেকে কী জানতে পারি। আমরা সরকারি চিন্তাভাবনা তথা ইংরেজদের পরিবর্তিত মনোভাব সম্পর্কে অনুমান করতে পারি। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সিপাহি বিদ্রোহের দলিল হিসেবে বেশ কিছু খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এগুলো থেকে সরকারি আধিকারিকদের ভীতি তথা উদ্বেগ এবং বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তাদের কী ধারণা ছিল — এ ব্যাপারে জানা যায়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং পত্রিকাগুলোতে (Magazine) এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনি ছাপা হয়, সেগুলোতে বিদ্রোহী সিপাহীদের দ্বারা সংঘটিত হিংসাত্মক কার্যকলাপের রগরগে বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলো জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং এর প্রতিশোধ তথা উচিত শিক্ষা দেওয়ার দাবি উঠতে থাকে।

ইংরেজ এবং ভারতীয়দের দ্বারা তৈরি করা চিত্রগুলো সিপাহি বিদ্রোহের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক চিত্র, পেন্সিলে আঁকা চিত্র, নকশা, পোস্টার এবং ব্যঙ্গাচিত্র প্রভৃতি রয়েছে।

5.1 রক্ষাকর্তাদের অভিনন্দন

ইংরেজদের উপস্থাপিত চিত্রগুলো বিভিন্ন ধরনের আবেগ তথা প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছুতে ইংরেজদের রক্ষাকর্তা তথা বিদ্রোহীদের দমনকারী ইংরেজ নায়কদের গুণগান করা হয়েছে। 1859 খ্রিস্টাব্দে থমাস জোন্‌স বার্কার-এর আঁকা চিত্র "রিলিফ অফ লক্ষ্ণৌ" — এ ধরনের একটি উদাহরণ যখন বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ ঘিরে ফেলে তখন লক্ষ্ণৌর কমিশনার হেনরি লরেন্স সমস্ত খ্রিস্টানদের একত্রিত করে অত্যন্ত সুরক্ষিত রেসিডেন্সিতে আশ্রয় নেন। পরবর্তী সময়ে লরেন্সকে হত্যা করা হয় কিন্তু কর্ণেল ইঙ্গলিসের নেতৃত্বে রেসিডেন্সি সুরক্ষিত থেকে যায়। 25 সেপ্টেম্বর জেম্‌স আউটরাম এবং হেনরী হ্যাভলক সেখানে পৌঁছান। তাঁরা বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলেন। কুড়ি দিন পরে ভারতবর্ষে ইংরেজ সেনাবাহিনীর নতুন

চিত্র 11.10
"রিলিফ অব লক্ষ্ণৌ" —1859 খ্রিস্টাব্দে থমাস জোন্স বার্কারের আঁকা চিত্র।

কমাণ্ডার কলিন ক্যাম্পবেল প্রচুর সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌঁছান এবং আটক হয়ে থাকা ব্রিটিশ সেনাদের উদ্ধার করেন। ইংরেজদের বিবরণীগুলোতে লক্ষ্ণৌর অবরোধ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সাফল্য বেঁচে থাকার গল্পে কাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

বার্কার-এর আঁকা চিত্রে ক্যাম্পবেলের প্রবেশের মুহূর্তটি উদ্‌যাপন করতে দেখা যাচ্ছে। চিত্রের কেন্দ্রে ক্যাম্পবেল, আউটরাম এবং হ্যাভলক - এই তিনজন ইংরেজ নায়ক রয়েছেন। তাঁদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের হাতগুলো দেখলে দর্শকদের দৃষ্টি চিত্রের কেন্দ্রস্থলের দিকে চলে যায়। নায়করা এমন একটি স্থানে দাঁড়ানো যেখানে যথেষ্ট আলো রয়েছে। তাদের সামনে রয়েছে ছায়া এবং পেছনে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্থ আবাস। সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহ এবং আহতরা এই অবরোধের সময় ঘটে যাওয়া মারদাঙ্গার সাক্ষ্য বহন করে। অন্যদিকে মধ্যভাগে ঘোড়াগুলোর বিজয়ী চিত্র জোরালোভাবে জানান দেয় যে, ইংরেজদের শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরনের চিত্রগুলো ব্রিটিশ জনগণের মনে পুনরায় ভরসা জাগিয়ে তোলে। এই চিত্রগুলো দেখে তাদের মনে হয় যে, বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সঙ্কটের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে; ব্রিটিশরা জয়লাভ করেছে।

5.2 ইংরেজ মহিলারা এবং ব্রিটেনের সম্মান (English women and the honour of Britain)

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন জনগণের কল্পনাকে প্রভাবিত করে। এগুলোর দ্বারা কোনো ঘটনার ব্যাপারে জনগণের অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষে

মহিলা এবং শিশুদের সাথে সংগঠিত সহিংস কাহিনিগুলো পড়ে ব্রিটেনের জনতা প্রতিশোধ তথা উচিত শিক্ষা দেওয়ার দাবি জানায়। নির্দোষ মহিলাদের সম্মান এবং অসহায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে বলা হয়। চিত্র শিল্পীরা মানসিক আঘাত এবং ক্লেশ সম্পর্কে নিজেদের অনুভূতিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তথা ফুটিয়ে তুলেছেন।

জোসেফ নোয়েল পেটন সিপাহি বিদ্রোহের দুই বছর পরে "ইন মেমোরিয়াম" (চিত্র 11.11) অঙ্কন করেন। এই ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, ইংরেজ মহিলা এবং শিশুরা একে অপরকে আঁকড়ে ধরে জড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের অসহায় এবং নিস্পাপ হিসাবে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন অবধারিত সম্মানহানি, হিংসা এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। "ইন মেমোরিয়াম"-এ রক্তাক্ত হিংসা দেখানো হয়নি। এতে শুধুমাত্র এর সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা দর্শকদের চিন্তাভাবনাকে নাড়া দেয় এবং তাদের মনে ক্রোধ এবং উন্মত্ততার ভাবনা জাগিয়ে তোলে। এতে বিদ্রোহীদের হিংস্র তথা নিষ্ঠুর হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যদিও এই ছবিতে তারা অদৃশ্য। তোমরা ছবির পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছো যে, তাদের রক্ষাকারী হিসেবে ইংরেজ বাহিনী এসে পৌঁছাচ্ছে।

চিত্র 11.11
1859 খ্রিস্টাব্দে জোসেফ নোয়েল পেটনের আঁকা "ইন মেমোরিয়াম"।

চিত্র 11.12
মিস্ হুইলার কানপুরে সিপাহীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছেন

অন্যান্য কিছু চিত্রে আমরা মহিলাদের অন্য এক রূপে দেখতে পাই, এগুলোতে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তাদের বীরাঙ্গানার ভূমিকায় দেখা যায়। চিত্র 11.12-এর মিস হুইলারকে দৃঢ়তাপূর্বক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের সম্মান রক্ষা তথা বিদ্রোহীদের এক হাতে হত্যা করতে দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ব্রিটিশ চিত্রের মতো এখানেও বিদ্রোহীদের দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে চারজন বলিষ্ঠ পুরুষকে বন্দুক এবং তলোয়ার নিয়ে একজন মহিলাকে আক্রমণ করতে দেখা যাচ্ছে। এখানে সম্মান এবং জীবনরক্ষার জন্য মহলির সংঘর্ষের আড়ালে আসলে এক গভীর ধার্মিক চিন্তাধারাও রয়েছে — যা হল খ্রিস্টধর্ম রক্ষার জন্য সংগ্রাম। চিত্রে মেঝেতে পড়ে থাকা বইটি হল বাইবেল।

5.3 প্রতিহিংসা এবং প্রতিফল (Vengeance and retribution)

ব্রিটেনে ক্ষোভ এবং সংঘাতের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রতিহিংসার জোরদার দাবি উঠতে থাকে। বিদ্রোহ সম্পর্কে প্রকাশিত চিত্র এবং সংবাদ এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে হিংসাপূর্বক দমন এবং প্রতিশোধ খুবই প্রয়োজনীয় তথা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজদের সম্মান এবং ক্ষমতার উপর ওঠা চ্যালেঞ্জকে নির্মমতার সাথে মোকাবিলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের হুমকির মুখে ব্রিটিশরা অনুভব করে যে, তারা যে অপরাজেয় - এটা প্রদর্শন করা জরুরী। এ ধরনের একটি চিত্রে (চিত্র 11.13) আমরা ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে এক নারীমূর্তির ছবি দেখতে পাই, যার এক হাতে তলোয়ার এবং অন্যহাতে ঢাল রয়েছে। তাঁর দেহ ভঙ্গিমা আক্রমণাত্মক। মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড রাগের বহির্প্রকাশ রয়েছে এবং প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। সে বিদ্রোহীদের পদদলিত করছে অন্যদিকে একজন ভারতীয় মহিলা এবং শিশু ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে।

এগুলো ছাড়াও ব্রিটিশ ছাপাখানায় অসংখ্য ছবি এবং ব্যঙ্গাচিত্র ছাপা হয়েছিল যেগুলো নিষ্ঠুর দমন পীড়ন এবং হিংসাত্মক প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করে।

চিত্র 11.13
জাস্টিস, 12 সেপ্টেম্বর, 1857,
চিত্রের নীচের শিরোনামে লেখা রয়েছে — "কানপুরে সংগঠিত ভীষণ গণসংহার-এর সংবাদে সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ড প্রচণ্ড ধিক্কারে ফেটে পড়ে এবং প্রতিশোধের অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়।

চিত্র 11.14
চিত্রের নীচের শিরোনামে লেখা — "বাংলার বাঘের উপর ব্রিটিশ সিংহের প্রতিশোধ" পুঞ্জ, *1857.*

➲ এই ছবিতে কোন্ ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে? সিংহ এবং বাঘের মাধ্যমে কী প্রকাশ করা হয়েছে? ছবিতে মহিলা এবং শিশুদের মাধ্যমে কী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে?

5.4 সন্ত্রাসের কদর্যরূপ (The performance of terror)

বিদ্রোহীদের যেরকম নির্মমভাবে হত্যা করা হয় — এ থেকে প্রতিশোধ তথা উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রচণ্ড স্পৃহার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয় অথবা ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এই ধরনের প্রাণদণ্ডের ছবি জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

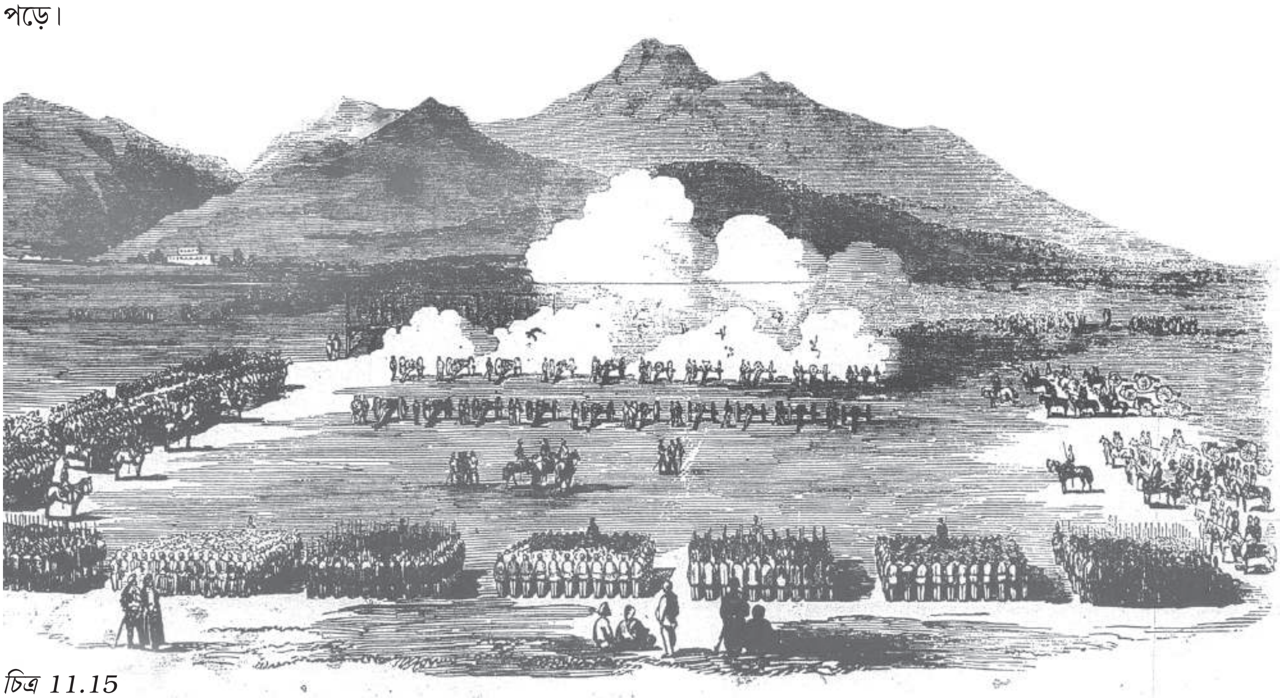

চিত্র 11.15
Execution of mutineers in Peshawar: Blowing from the guns (পেশোয়ারে বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড)
ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ, *1857*-এর 3 অক্টোবর প্রকাশিত চিত্র।
এখানে মৃত্যুদণ্ডের দৃশ্যকে একটি নাটকের রঙ্গমঞ্চের মতো মনে হচ্ছে যা কিনা পাশবিক ক্ষমতার প্রদর্শন। উর্দি পরিহিত অশ্বারোহী এক সৈন্য এবং পদাতিক বাহিনীরা সিপাহীদের প্রভাব খাটাতে দেখা যাচ্ছে। নিজেদের সহকর্মী সিপাহীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার দৃশ্য দেখা এবং বিদ্রোহের ভয়ানক পরিনাম তাদের অনুভব করতে হয়।

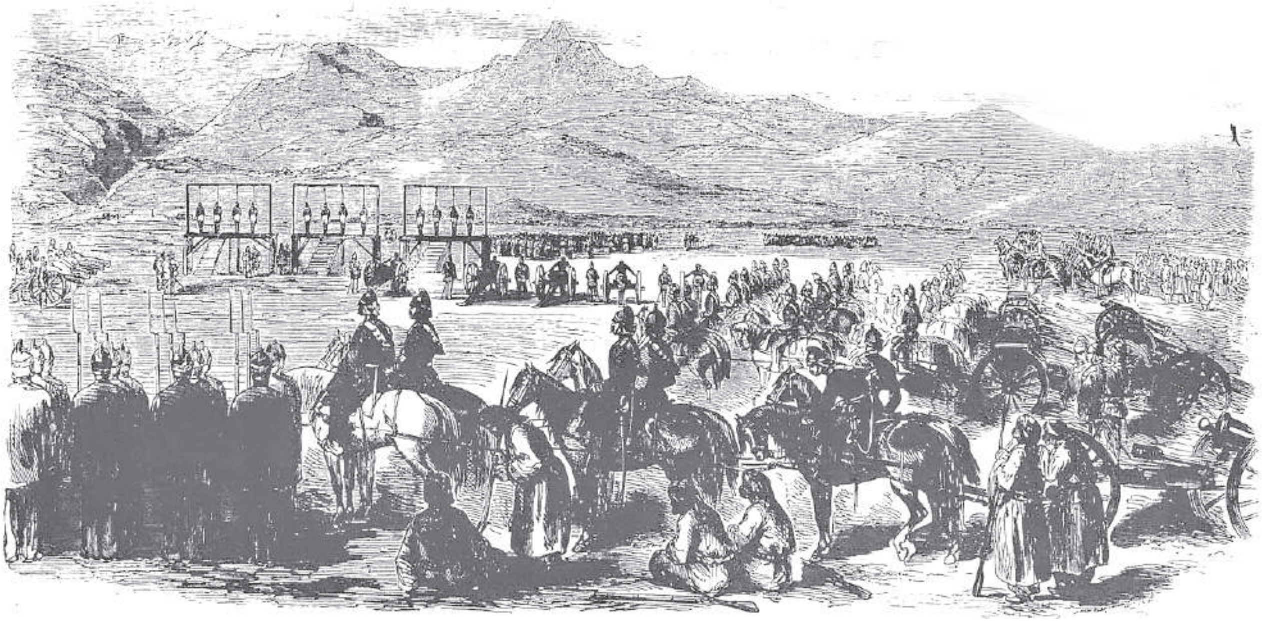

চিত্র 11.16

Execution of mutinous sepoys in Peshawar (পেশোয়ারে বিদ্রোহী সিপাহীদের মৃত্যুদণ্ড), 1857-এর 3 অক্টোবর
ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজ-এ প্রকাশিত চিত্র। এখানে 12 জন বিদ্রোহীকে একই সারিতে ফাঁসিতে ঝুলাতে দেখা যাচ্ছে। তাদের চারদিকে কামান দেখা যাচ্ছে। এখানে তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ সেটা আসলে কোনো স্বাভাবিক শাস্তি প্রদান নয় - এর আসল উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং এর সাথে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া যে, মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র কোনো আবদ্ধ জায়গায় নয়, খোলাস্থানেও দেওয়া যেতে পারে। শাস্তি প্রদান নাটকীয় ভঙ্গিতে সম্পাদন করা আবশ্যক ছিল।

5.5 অনুকম্পার কোনো স্থান নেই (No time for clemency)

যখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জোরদার দাবি উত্থাপিত হচ্ছিল সে সময় দয়া প্রদর্শনের আর্জিকে শুধুমাত্র বিদ্রুপ হিসেবেই দেখা হয়। যখন গভর্নর জেনারেল ক্যানিং ঘোষণা করেন যে, ধৈর্য্য এবং ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে সিপাহীদের আনুগত্য লাভ করা সম্ভব, তখন ব্রিটিশ সংবাদপত্রে তাকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করা হয়।

পাঞ্চ (*Punch*) নামক ব্রিটিশ কৌতুক বিদ্রুপাত্মক পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কনের একটিতে লর্ড ক্যানিংকে একজন পিতার ভূমিকায় দেখানো হয়েছে। তাঁর হাত সুরক্ষা প্রদানের ভঙ্গিতে এমন একজন সিপাহীর মাথায় রয়েছে, যার এক হাতে তখনও খোলা তলোয়ার এবং অন্য হাতে একটি ছুরি ছিল এবং এগুলোর দুটি থেকেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। (চিত্র 11.17)। এটি এমন একটি

চিত্র 11.17

"দ্যা ক্লিমেন্সি অফ ক্যানিং" (ক্যানিং-এর অনুকম্পা) পাঞ্চ (Punch) পত্রিকার *1857* খ্রিস্টাব্দের *24* অক্টোবর প্রকাশিত।
এই ব্যঙ্গচিত্রের নীচের শিরোনামে লেখা রয়েছে : "গভর্নর জেনারেল : ঠিক আছে যদি সে একজন ভালো সিপাহী হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে তাকে ঘৃণ্য কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হবে না।"

কাল্পনিক চিত্র ছিল যা ওই সময়ের বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ চিত্রে বার বার প্রদর্শিত হয়।

5.6 জাতীয়তাবাদী চিত্র (Nationalist imageries)

1857 খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলি হতে বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রেরণা লাভ করে। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার এক সম্পূর্ণ জগৎ রচিত হয়। একে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে পালন করা হত যাতে দেশের সব অংশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

ইতিহাসের রচনার মতো কলা এবং সাহিত্যেও 1857-এর স্মৃতিকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারীদের এমন নায়ক রূপে প্রদর্শন করা হয় যারা জনগণকে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ধিক্কার জানানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তথা দেশকে যুদ্ধের দিকে নিয়ে যান। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম এবং অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে নিজ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যুদ্ধরত রাণীর লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বের গৌরব গাঁথা সম্বলিত কবিতা রচিত হয়। ঝাঁসীর রাণীকে এমন এক সাহসিক ব্যক্তিত্বরূপে উপস্থাপন করা হয় যিনি শত্রুদের তাড়া করেন এবং ইংরেজ সিপাহীদের হত্যা করেন তথা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বীরাঙ্গানার মতো যুদ্ধ করেন। ভারতবর্ষের অনেক অংশের শিশুরাই সুভদ্রা কুমারী চৌহান রচিত নিম্নলিখিত পঙক্তি পড়ে বড়ো হয়েছে : "খুব লড়ি মরদানী বো তো ঝাঁসী বালি রাণী থি"। (তিনি একজন পুরুষ মানুষের মতো লড়াই করেছেন, তিনি ছিলেন ঝাঁসীর রাণী)। জনপ্রিয় ছবিগুলোতে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে প্রায়শই যুদ্ধের পোশাকে এক হাতে তরোয়াল নিয়ে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখানো হয়, যা কিনা অন্যায় এবং বিদেশী শাসন প্রতিরোধের এক অদম্য প্রতীক।

চিত্র 11.18
ছায়াছবি এবং পোস্টার রাণী লক্ষ্মীবাঈকে একজন পুরুষের মতো সাহসী যোদ্ধা রূপে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে।

এই চিত্রগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, সেগুলো তৈরি করা চিত্রকরেরা এই সমস্ত ঘটনাসমূহকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতো, তারা কি অনুভব করত এবং তারা কি ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। এই সমস্ত চিত্র এবং ব্যঙ্গাচিত্রের মাধ্যমে আমরা ওই সমস্ত জনগণ সম্পর্কে জানতে পারি যারা ওই সমস্ত চিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে সেগুলোর প্রশংসা বা সমালোচনা করত এবং সেগুলোর প্রতিলিপি ক্রয় করে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখত।

এই সমস্ত ছবিগুলোতে কেবলমাত্র ওই সময়ের আবেগ এবং অনুভূতির প্রতিফলনই ঘটে না, সেগুলো সংবেদনশীলতাকেও রূপদান করে। ব্রিটেনে মুদ্রিত ছবিগুলোর দ্বারা সেখানকার উত্তেজিত জনতা বিদ্রোহীদের ভয়ানক বর্বরতার সাথে দমন করার জন্য আওয়াজ তোলে, অন্যদিকে বিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী চিত্র জাতীয়বাদী চিন্তাধারাকে রূপদান করতে সহায়তা করে।

➲ আলোচনা করো...

এইভাগে দেওয়া প্রত্যেকটি চিত্রের পর্যালোচনা করো এবং সেগুলোর মাধ্যমে তোমার শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কী জানতে পারো — তা আলোচনা কর।

সময়পঞ্জি

1801	ওয়েলেসলি দ্বারা অবধ-এ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি চালু (Subsidiary Alliance)।
1856	নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ-এর অপসারণ : অবধ (অযোধ্যা) অধিগ্রহণ
1856-57	ইংরেজদের দ্বারা অবধ (অযোধ্যা)-এ সামারি রেভিনিও সেটেলমেন্ট চালু
1857	
10 মে	মীরাটে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা
11-12 মে	দিল্লির সেনা (garrisons) বিদ্রোহ; বাহাদুর শাহ-এর নামসর্বস্ব নেতৃত্ব গ্রহণ
20-27 মে	আলিগড়, ইটাওয়াহ, মৈইনপুরি, ইটাহ-এ সিপাহি বিদ্রোহ
30 মে	লক্ষ্ণৌ-এ বিদ্রোহ
মে-জুন	সিপাহি বিদ্রোহের গণ বিদ্রোহে রূপান্তর
30 জুন	চিন হাটের যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজয়
25 সেপ্টেম্বর	হেভলক এবং আওটরামের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে প্রবেশ
জুলাই	যুদ্ধে শাহ মলের মৃত্যু
1858	
জুন	যুদ্ধে ঝাঁসীর রাণীর মৃত্যু

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

চিত্র 11.19
বিদ্রোহীদের চেহারা

1. অনেক স্থানে বিদ্রেহী সিপাহীরা নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কেন পূর্বতন শাসকদের শরণাপন্ন হয়?
2. যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা পূর্ব পরিকল্পনা তথা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করছিল - সেগুলো সম্পর্ক আলোচনা কর।
3. 1857-এর ঘটনাবলির জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা কতদূর ছিল - সে সম্পর্কে আলোচনা কর।
4. বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্য সুনিশ্চিত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?
5. ইংরেজরা বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. বিদ্রোহ বিশেষত অবধ-এ কেন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে? কৃষক, তালুকদার এবং জমিদারগণ কেন এই বিদ্রোহে যোগদান করেন?

7. বিদ্রোহীরা কী চেয়েছিল? বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কী পার্থক্য ছিল?

8. বিভিন্ন চিত্র হতে আমরা 1857-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে কী জানতে পারি? ইতিহাসবিদগণ এসমস্ত চিত্রের বিশ্লেষণ কীভাবে করে থাকেন?

9. একটি চিত্র এবং একটি লিখিত পাঠ বেছে নিয়ে এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত যে-কোনো দুটি উৎস পর্যালোচনা কর এবং এগুলো কীভাবে বিজয়ী এবং পরাজিতদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে - এ ব্যাপারে আলোচনা করো।

মানচিত্রের কাজ

10. ভারতের একটি রেখা মানচিত্রে কলিকাতা (কোলকাতা) বোম্বে (মুম্বাই) এবং মাদ্রাজ (চেন্নাই)কে চিহ্নিত করো যেগুলো 1857 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শক্তির প্রধানকেন্দ্র ছিল। মানচিত্র 1 এবং 2 লক্ষ করো তথা ওই সকল এলাকাকে চিহ্নিত করো যেখানে বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঔপনিবেশিক শহরগুলো থেকে ওই সমস্ত এলাকা কতটুকু দূরে অথবা নিকটে ছিল?

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

11. 1857-এর বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে যে-কোনো একজনের জীবনী পড়ো। এটি রচনার সময় জীবনীকার যেসব উৎস হতে তথ্য আহরণ করে সেগুলো দেখো। এগুলোর মধ্যে কি সরকারি প্রতিবেদন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, স্থানীয় ভাষায় রচিত কাহিনি, চিত্র অথবা অন্য কোনো কিছু রয়েছে? এই সমস্ত উৎসগুলোর মধ্যে কি একই তথ্য রয়েছে অথবা সেগুলোর মধ্যে কি কোনো ভিন্নতা বা পার্থক্য রয়েছে? তোমার প্রাপ্ত তথ্যগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

12. 1857-এর বিদ্রোহের উপর নির্মিত কোনো ছায়াছবি (film) দেখো এবং এতে বিদ্রোহকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে সম্পর্কে লেখো। এতে ইংরেজ, বিদ্রোহী এবং ইংরেজদের অনুগত ভারতীয়দের কীভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? কৃষক, শহরের অধিবাসী, আদিবাসী জমিদার তথা তালুকদারদের সম্পর্কে ছায়াছবিতে কী ব্যক্ত করা হয়েছে? এই ছায়াছবিটি কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে?

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Gautam Bhadra. 1987. 'Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven', *Subaltern Studies, IV*. Oxford University Press, Delhi.

Rudrangshu Mukherjee. 1984. *Awadh in Revolt, 1857-58*. Oxford University Press, Delhi.

Tapti Roy. 2006. *Raj of the Rani*. Penguin, New Delhi.

Eric Stokes. 1980. *Peasants and the Raj*. Oxford University Press, Delhi.

You could visit:

http://books.google.com
(for accounts of 1857 by British officials)

www.copsey-family.org/allenc/lakshmibai/links.html
(for letters of Rani Lakshmibai)

বিষয়বস্তু
দ্বাদশ

ঔপনিবেশিক নগরগুলো

নগরায়ণ, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

এই অধ্যায়ে আমরা ঔপনিবেশিক ভারতে নগরায়ণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব; ঔপনিবেশিক নগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে বের করব এবং এগুলোর মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করব। আমরা তিনটি বড়ো নগর — মাদ্রাজ (চেন্নাই), কলিকাতা (কলকাতা) এবং বোম্বে (মুম্বাই)-এর ক্রমবিকাশের দিকে খুঁটিয়ে দেখব।

এই তিনটি নগরই মূলত মৎস্য শিকার এবং বয়ন শিল্পের গ্রাম ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কারণে এগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কোম্পানির এজেন্টগণ 1639 খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে এবং 1690 খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেছিল। 1661 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ রাজা বোম্বেকে কোম্পানির কাছে দিয়ে দেন, যা তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে পণ হিসাবে পর্তুগালের রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এইসব জনবসতিগুলোর প্রত্যেকটিতে কোম্পানি ব্যবসায়িক এবং প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপন করে।

চিত্র 12.1
1798 খ্রিস্টাব্দে ওরিয়েন্টাল সিনারী-তে প্রকাশিত ড্যানিয়েলের অঙ্কিত চিত্রের উপর ভিত্তি করে থমাস এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েলের দ্বারা অঙ্কিত মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জ-এর দক্ষিণ-পূর্ব দৃশ্য। মাল পরিবহণকারী ইউরোপীয় জাহাজের দিগন্তের দৃশ্য। সম্মুখভাগে দেশীয় নৌকা দেখা যেতে পারে।

এই দেশে নতুন শাসকের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে এই বসতিগুলো বড়ো নগরে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন শাসকদের কর্তৃত্বকে দেখানোর জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এইসব নগরগুলোতে ভারতীয়রা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নতুন পদ্ধতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলিকাতার নকশাগুলো অন্যান্য ভারতীয় পুরনো নগরগুলো থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল এবং এই নগরগুলোতে তৈরি ভবনগুলো তাদের ঔপনিবেশিক উৎসের পদচিহ্ন বহন করেছিল। ভবনগুলো কী ব্যক্ত করে এবং স্থাপত্য কী প্রকাশ করতে পারে? ইতিহাসের ছাত্রদের এই প্রশ্নটা নিয়ে ভাবা দরকার।

স্মরণে রাখতে হবে যে, পাথর, ইট, কাঠ অথবা পলেস্তারারূপে ধারণা দিয়ে স্থাপত্য সাহায্য করে। সরকারি আধিকারিকের বাংলো, ধনী ব্যবসায়ীর প্রাসাদতুল্য বাড়ি থেকে শ্রমিকের সাধারণ কুঁড়েঘর পর্যন্ত, ভবনগুলো সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিচয়গুলোকে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত করে।

1. প্রাক ঔপনিবেশিক সময়ে শহর এবং নগর

ঔপনিবেশিক সময়ে নগরগুলোর বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে চলো আমরা ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী শতাব্দীর সময়ের শহরাঞ্চলের দিকে নজর দিই।

1.1 শহরগুলো কীভাবে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে?

শহরগুলোকে প্রায়ই গ্রামীণ এলাকার বিপরীতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ওইগুলো বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে। লোকজন গ্রামাঞ্চলে জমি চাষ করে, বনে খোরাক খুঁজে অথবা পশুপালন করে বেঁচে থাকে। এর বিপরীতে শহরে শিল্পী, ব্যবসায়ী, প্রশাসক এবং শাসকরা বসবাস করেন। কৃষি থেকে প্রাপ্ত কর এবং উদ্বৃত্তের উপর ভিত্তি করে শহরগুলো সমৃদ্ধিলাভ করেছিল এবং গ্রামের লোকদের উপর কর্তৃত্ব খাটাত। শহর এবং নগরগুলোকে প্রায়শই প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হত যা গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের পৃথকীকরণের প্রতীক ছিল।

যাইহোক শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পৃথকীকরণ অনিশ্চিত ছিল। কৃষকগণ দূরবর্তী অঞ্চলে শহরের উপর দিয়ে তীর্থ ভ্রমণে যেত; দুর্ভিক্ষের সময় তারা শহরে ভিড়ও করত। তাছাড়া শহর থেকে গ্রামের দিকে মানুষ ও দ্রব্য সামগ্রীর বিপরীত প্রবাহও দেখা যেত। যখন শহরগুলো আক্রান্ত হত, মানুষ প্রায়শই গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিত। ব্যবসায়ী এবং ফেরিওয়ালার শহর থেকে দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে বিক্রি করার জন্য গ্রামে যেত। এতে বাজারের বিস্তৃতি ঘটত এবং উপভোগের নতুন শৈলীর সৃষ্টি হত।

মোগলদের দ্বারা তৈরি শহরগুলো জনসংখ্যার কেন্দ্রীভূতকরণ, স্মৃতিসৌধ ভবন এবং

উৎস 1

গ্রামীণ অঞ্চলে পলায়ন

1857 সালে ব্রিটিশ সৈন্য যখন নগর অধিকার করে তখন দিল্লিবাসী কী করেছিল, বিখ্যাত কবি মির্জা গালিব এভাবে বর্ণনা করেন :

> শত্রুকে আক্রমণ এবং বিতাড়িত করে বিজেতাগণ (অর্থাৎ ব্রিটিশ) নগরের সমস্ত দিক কব্জা করে ফেলে। রাস্তায় যাদেরকে পেয়েছে তাদের সবাইকেই তারা কেটে ফেলে ... দুই থেকে তিনদিন পর্যন্ত নগরের প্রত্যেকটি রাস্তা, কাশ্মীরি দ্বার থেকে চাঁদনিচক পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিনটি দ্বার — আজমেরি, তুর্কমান এবং দিল্লি এখনও বিদ্রোহীদের কব্জায় ... এই প্রতিহিংসাপূর্ণ ক্রোধ এবং বিদ্বেষের নগ্ন দৃশ্য দেখে মানুষের চেহারার রঙ উবে যায় এবং বিশাল সংখ্যায় পুরুষ ও মহিলা ... এই তিন দ্বারা দিয়ে প্রবল বেগে পলায়ন করে। নগরের বাইরে ছোটো গ্রাম এবং মন্দির খুঁজে সেখানে আশ্রয় নিয়ে তাদের ফেরার অনুকূল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

তাদের রাজকীয় জাঁকজমক এবং প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আগ্রা, দিল্লি এবং লাহোর ছিল রাজকীয় প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। মনসবদার এবং জায়গীরদারগণ যাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব দেওয়া হত, সাধারণত এইসব নগরের বাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করত : এইসব ক্ষমতার কেন্দ্রে বসবাস করা একজন সম্ভ্রান্তের পদমর্যাদা এবং প্রতিপত্তির প্রতীক ছিল।

এই কেন্দ্রগুলোতে সম্রাট এবং আমিরের উপস্থিতির অর্থ হল যে, সেখানে বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবা প্রদান করতে হত। শিল্পীরা কুলীন পরিবারের জন্য বিশিষ্ট হস্তশিল্প উৎপাদন করত। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরবাসী এবং সেনার জন্য শস্য শহরের বাজারে আনা হত। রাজকোষও রাজকীয় রাজধানীতে অবস্থিত ছিল। এভাবে রাজ্যের রাজস্ব নিয়মিতভাবে রাজধানীতে আসতে থাকে। সম্রাট সুরক্ষিত প্রাসাদে থাকতেন এবং শহরটি দেওয়াল প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যেখানে পৃথক পৃথক দ্বার দ্বারা প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ন্ত্রিত ছিল। শহরগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বাগান, মসজিদ, মন্দির, সমাধি, মহাবিদ্যালয়, বাজার এবং সরাইখানা অবস্থিত ছিল। প্রাসাদ এবং মুখ্য মসজিদের দিকে শহরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

মাদুরাই এবং কাঞ্চিপুরমের মতো দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোর মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু ছিল মন্দির। এই শহরগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। ধর্মীয় উৎসবগুলো প্রায়শই মেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, যেখানে তীর্থ এবং ব্যবসা যুক্ত থাকত। সাধারণত শাসকই ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমাজ এবং শহরে অন্য দল এবং শ্রেণির স্থান শাসকের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হত।

মধ্যযুগীয় শহরগুলোতে শাসকবর্গের নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকের কাছে এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, তারা সমাজে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকবে। উত্তর ভারতে এই ব্যবস্থাকে বজায় রাখার কাজ করতেন কোতোয়াল নামক রাজকীয় আধিকারিক যাঁরা শহরে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং আইন কানুন দেখাশোনা করতেন।

চিত্র 12.2
1857 সালে শাহজাহানবাদ
1857 সালের পরে নগর পরিবেষ্টিত প্রাচীরকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। নদীর তীরে লালকেল্লা রয়েছে। ডানদিকে দূরে সেতুবন্ধে তুমি ব্রিটিশ জনবসিত এবং সেনা ছাউনি দেখতে পাচ্ছ।

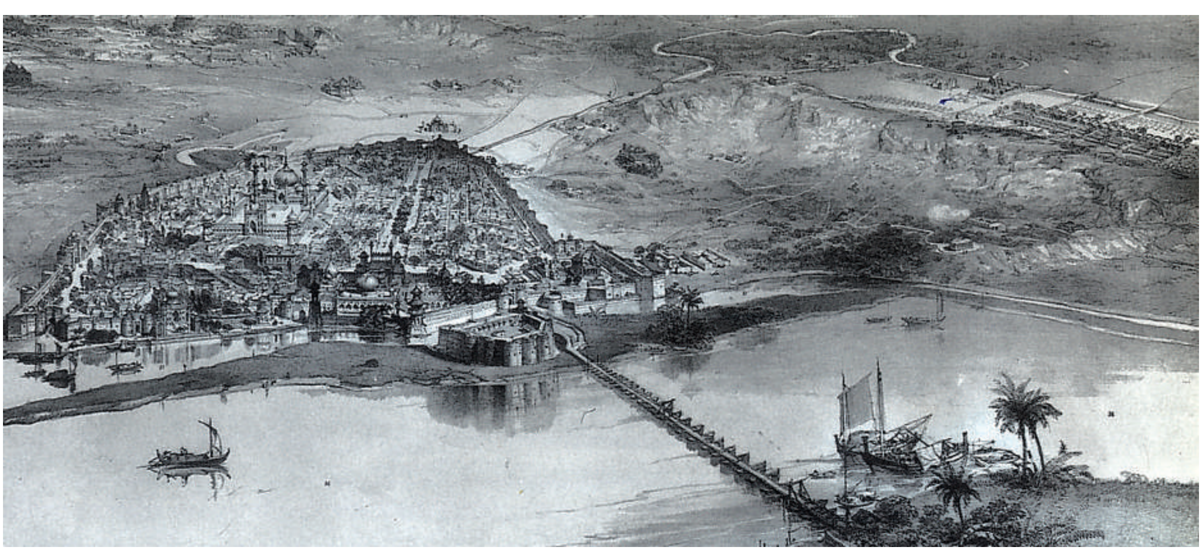

1.2 অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয় রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক পুনর্নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো শহরগুলোর পতন ঘটে এবং নতুন নতুন শহরের উদ্ভব হয়। মোগল শক্তির ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলেই তাদের শাসনের সঙ্গে যুক্ত শহরগুলোর পতন ঘটে। মোঘল রাজধানী দিল্লি এবং আগ্রা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। নতুন আঞ্চলিক ক্ষমতার বিকাশ আঞ্চলিক রাজধানী - লখনৌ, হায়দারাবাদ, সেরিঙ্গাপট্টম, পুনা (বর্তমানে পুণে) নাগপুর, বরোদা (বর্তমানে ভদোদরা) এবং তাঞ্জোর (বর্তমান তাঞ্জাবুর)-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বে প্রতিফলিত হয়। বণিকগণ, শাসকগণ, শিল্পীগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কাজ এবং রক্ষণের সন্ধানে পুরনো মোঘল কেন্দ্রগুলো থেকে এইসব নতুন রাজধানীতে চলে আসেন। নতুন রাজ্যগুলোর মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের ফল ছিল এই যে, ভাড়াটে সৈনিকরাও সেখানে কাজের সুযোগ পেয়ে গেল। উত্তর ভারতে মোঘল শাসনের সঙ্গে যুক্ত কিছু স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এবং আধিকারিকগণও কাস্বা এবং গঞ্জের মতো নতুন শহুরে জনবস্তি গড়ে তোলার সুযোগকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে নি। কিছু কিছু অঞ্চলে নতুন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়, আবার অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ, লুঠতরাজ এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে অর্থনৈতিক পতন দেখা দেয়।

ব্যবসার তন্ত্রে হওয়া পরিবর্তনগুলো নগর কেন্দ্রগুলোর ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো মোগল যুগের পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের ব্যবসায়িক ভিত্তি স্থাপন করেছিল : যেমন 1510 সালে পানাজীতে পর্তুগীজরা, 1605 সালে মসুলিপট্টনমে ডাচরা, 1639 সালে মাদ্রাজে ব্রিটিশরা এবং 1673 সালে পন্ডিচেরীতে (বর্তমান পুডুচেরী) ফরাসীরা। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই এই বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর চারপাশে শহর গড়ে উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে শক্তিশালী সমুদ্রভিত্তিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো এশিয়ার ভূমিকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যগুলোর স্থান দখল করে নেয়। আন্তর্জতিক বাণিজ্য, বাণিজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের শক্তিগুলো বর্তমানে সমাজের চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরিবর্তনের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। বাণিজ্য অন্য অঞ্চলগুলোতে স্থানান্তরিত হলে সুরাট, মসুলিপট্টনম এবং ঢাকার মতো বাণিজ্যিক কেন্দ্র যেগুলো সপ্তদশ শতাব্দীতে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, এগুলোর পতন ঘটে। 1757 সালে পলাশীর

দিল্লির কোতোয়াল

তুমি কি জান যে, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পিতামহ গঙ্গাধর নেহেরু 1857 সালের বিদ্রোহের আগে দিল্লির কোতোয়াল ছিলেন? আরও বিশদভাবে জানার জন্য জওহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনী পড়ো।

কাস্বা হল গ্রামাঞ্চলে একটি ছোটো শহর, যা প্রায়ই একজন স্থানীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির কেন্দ্র ছিল। একটি ছোটো স্থায়ী বাজারকে গঞ্জ ব লা হয়।
কাস্বা এবং *গঞ্জ* উভয়ই বস্ত্র, ফল, শাকসব্জী এবং দুধ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। বিশিষ্ট পরিবার এবং সৈন্যদের এরা এই সামগ্রীগুলো সরবরাহ করত।

চিত্র 12.3
নদী থেকে দৃশ্যমান গোয়ার নগরের একটি দৃশ্য, জে.গ্রেইগ্ দ্বারা 1812 সালে অঙ্কিত

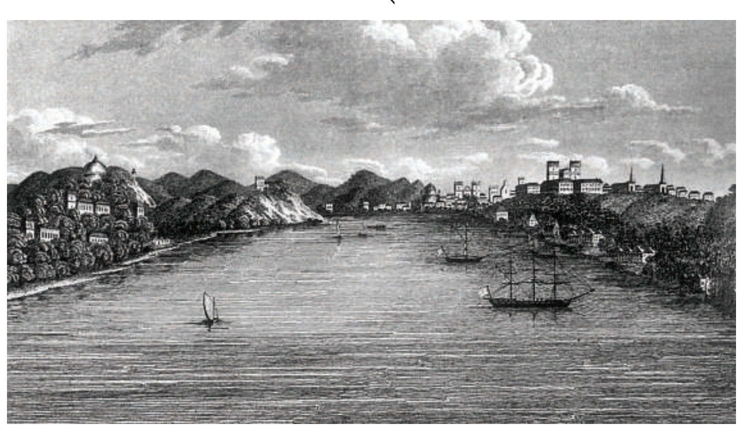

নগরগুলোর নাম

মাদ্রাজ, বোম্বে এবং ক্যালকাটা ছিল ইংরেজ প্রভাবিত গ্রামগুলোর নাম যেখানে ব্রিটিশরা প্রথম বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এগুলো এখন যথাক্রমে চেন্নাই, মুম্বাই এবং কোলকাতা নামে পরিচিত।

➲ আলোচনা করো...

তুমি যে নগর বা গ্রামে বাস কর, সেখানে কোন্ ভবন, প্রতিষ্ঠান অথবা অঞ্চলকে শহরের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু বলে গণ্য করা হয়? এর ইতিহাস খুঁজে বের করো। এটা কবে তৈরি হয়েছিল, কে তৈরি করেছিল, কেন তৈরি করেছিল, এর কী ভূমিকা ছিল এবং এই কাজগুলোর কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা খুঁজে বের করো।

যুদ্ধের পরে যখন ইংরেজরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটে তখন মাদ্রাজ, কলিকাতা এবং বোম্বের মতো ঔপনিবেশিক বন্দর নগরগুলো খুব দ্রুত নতুন অর্থনৈতিক রাজধানী হিসাবে পরিগণিত হয়। এগুলো ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রেও পরিণত হয়। নতুন নতুন ভবন, প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয় এবং শহরের অঞ্চলগুলোকে নতুনভাবে সাজানো হয়। নতুন পেশা বিকশিত হয় এবং লোকজন এইসব ঔপনিবেশিক নগরগুলোতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। প্রায় 1800 সালের মধ্যে জনসংখ্যার নিরিখে এগুলো ভারতের সবচেয়ে বড়ো নগর ছিল।

2. ঔপনিবেশিক নগরগুলোর সম্পর্ক খুঁজে বের করো

2.1 ঔপনিবেশিক নথি এবং শহুরে ইতিহাস

ঔপনিবেশিক শাসন প্রচুর পরিমাণ তথ্য সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত তথ্য রেখেছিল। ক্রমবর্ধমান নগরগুলোতে জীবনের গতিপথকে ধরে রাখার জন্য তারা নিয়মিতভাবে জরিপ করত, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করত এবং বিভিন্ন ধরনের সরকারি প্রতিবেদন প্রকাশ করত।

প্রথম বর্ষ থেকে ঔপনিবেশিক সরকার মানচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। সরকার মনে করত যে, ভূদৃশ্য এবং ভূসংস্থান জানার জন্য ভালো মানচিত্রের প্রয়োজন। এই অঞ্চলের উপর সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে এই জ্ঞান সহায়ক হবে। যখন শহরগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে, তখন শুধুমাত্র এই শহরগুলোর উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণই নয়, উপরন্তু বাণিজ্য এবং ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্যও মানচিত্রগুলো তৈরি করা হয়েছিল। শহরের মানচিত্রগুলো থেকে পাহাড়ের অবস্থান, নদী এবং গাছপালা সম্পর্কে তথ্য জানা যায়, এগুলো প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে কাঠামোর পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এই মানচিত্রগুলো ঘাটের অবস্থান, বাড়ির ঘনত্ব, গুণমান, রাস্তার সারিবদ্ধকরণ দেখা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনার এবং করারোপণ কৌশলের পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ইংরেজরা পৌরকরের সুসংবদ্ধ বাৎসরিক সংগ্রহের মাধ্যমে শহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের যোগান বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করেছিল। দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য তারা নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর কিছু দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিল। আংশিক লোক প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত পুর নিগমের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য হল জল সরবরাহ, নর্দমা, রাস্তা তৈরি এবং জন স্বাস্থ্যের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা। পুরনিগমের ক্রিয়াকলাপের ফলে নতুন ধরনের দলিল তৈরি হয় যেগুলোকে পুর নিগমের রেকর্ড কক্ষে রাখা হত।

নিয়মিত জনগণনার মাধ্যমে নগরের বৃদ্ধির উপর নজর রাখা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক স্থানীয় জনগণনা করা হয়। সর্বভারতীয় জনগণনার প্রথম প্রয়াস 1872 সালে করা হয়েছিল। এরপর 1881 সাল থেকে দশকীয় (প্রতি দশ বছর অন্তর) জনগণনা একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ভারতে শহরীকরণের অধ্যয়নের জন্য এই সংগৃহীত তথ্য একটি অমূল্য উৎস।

যখন আমরা এই প্রতিবেদনগুলোর দিকে তাকাই তখন মনে হয় যে, আমাদের কাছে ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে পরিমাপ করার জন্য লিখিত তথ্য রয়েছে। রোগ এবং মৃত্যুর সম্পর্কিত সারণির অন্তহীন পৃষ্ঠাগুলো অথবা বয়স, লিঙ্গ, জাতি এবং পেশা অনুসারে গণনার ব্যবস্থা থেকে এর বিশাল সংখ্যা পাওয়া যায় যা মূর্তের ভ্রম তৈরি করে। যাহোক ঐতিহাসিকরা খুঁজে পেয়েছেন যে, এই সংখ্যাগুলো বিভ্রান্তিকর হতে পারে। এই সংখ্যাগুলোকে ব্যবহার করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কারা এই তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং কেন এবং কীভাবে এগুলো সংগৃহীত হয়েছিল। আমাদের এটাও জানা দরকার যে, কীসের মান নির্ণয় করা হয়েছিল, কী মাপা হয়েছিল এবং কী মাপা হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ জনগণনার কাজ হল এমন একটি উপায় যার দ্বারা জনসংখ্যা সম্পর্কে সামাজিক তথ্যকে সুবিধাজনক পরিসংখ্যানে পরিবর্তিত করা হত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ছিল যেন এক অস্পষ্ট হেঁয়ালি। জনগণনার অধ্যক্ষ জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশকে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। এই শ্রেণিবিন্যাস প্রায়শই বিধিবহির্ভূত ছিল এবং জনগণের পরিবর্তনশীল এবং অধিক্রমণ পরিচয়গুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ছিল। একজন ব্যক্তি যে একজন কারিগর এবং ব্যবসায়ী তাকে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে? একজন ব্যক্তি যে তার নিজের জমিতে নিজে চাষ করে এবং উৎপাদন শহরে নিয়ে যায়, তাকে কোন্ শ্রেণিতে গণনা করা হবে? সে কী একজন চাষী অথবা একজন ব্যবসায়ী?

প্রায়শই জনগণ নিজেরা এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে চাইত না অথবা জনগণনা আধিকারিকদের প্রশ্নের ভুল উত্তর দিত। অনেকদিন পর্যন্ত জনগণনা কাজের প্রতি তারা সন্দিহান ছিল এবং মনে করত যে নতুন কর ধার্য করার জন্য ওইসব অনুসন্ধান করা হচ্ছে। উচ্চশ্রেণির লোকেরাও তাদের বাড়ির মহিলাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে চাইত না; মহিলাদের ঘরের অভ্যন্তরে নির্জনে

চিত্র 12.4
বোম্বাইয়ের একটি পুরনো মানচিত্র
দুর্গের পরিবৃত অঞ্চল ছিল সুরক্ষিত জনবসতির অংশ। ফোটাকিওয়ালা অঞ্চলগুলোতে ওই সাতটি দ্বীপকে দেখানো হয়েছে যেগুলোকে ক্রমান্বয়ে জমি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

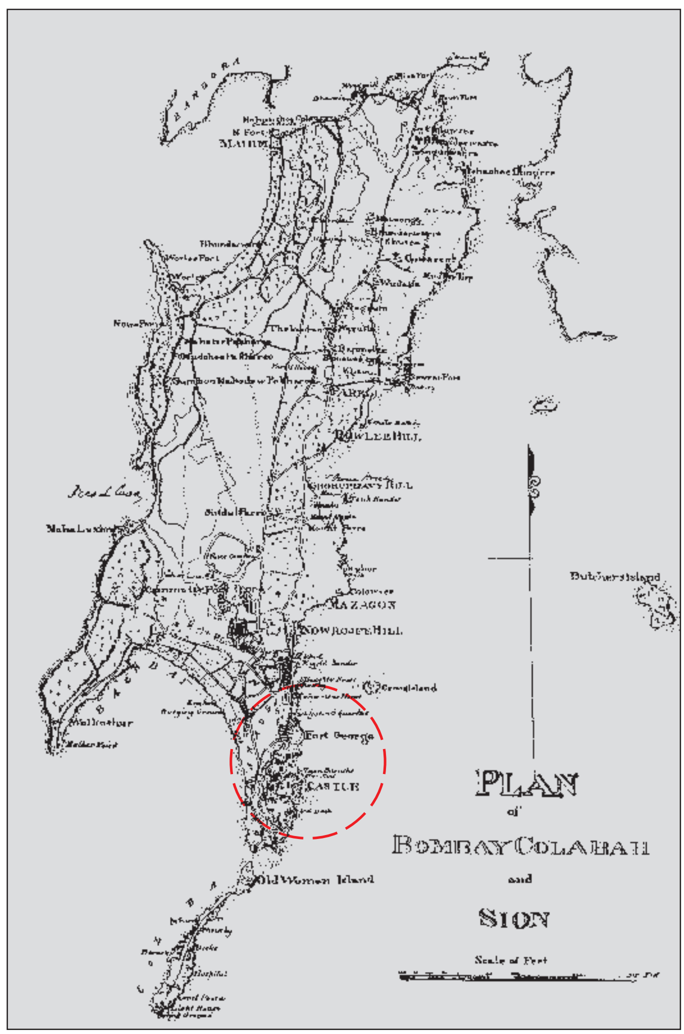

মানচিত্রগুলো কী প্রকাশ করে আর কী গোপন করে

জরিপ পদ্ধতির বিকাশ, নিখুঁত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনগুলোর ফলে মানচিত্রগুলোকে খুব যত্ন সহকারে তৈরি করা হত। দ্যা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া 1878 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময় তৈরি করা মানচিত্রগুলো আমাদের অনেক তথ্য প্রদান করে। এগুলো থেকে ইংরেজ শাসকদের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। শহরে গরীবদের বিশাল জনবসতিকে মানচিত্রে দেখানো হয়নি কারণ তারা শাসকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এর ফলে এটা মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, মানচিত্রে এই শূন্যস্থানগুলো অন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য উন্মুক্ত ছিল। যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন গরীবদের উচ্ছেদ করা হয়।

থাকাই শ্রেয় ছিল এবং তাদের জনসমক্ষে আসা অথবা তাদের সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তকে সঠিক মানা হত না।

জনগণনা আধিকারিকগণ এটাও খুঁজে পেয়েছিলেন যে, তাদের পরিচয় দেওয়ার সময় নিজেদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলে দাবি করতেন। উদাহরণস্বরূপ শহরে কিছু লোক ছিল যারা ফেরিওয়ালার কাজ করত এবং কোনো কোনো সময়ে ছোটো ছোটো জিনিস বিক্রি করত। আবার অন্য সময় জীবনধারণের জন্য তারা শ্রমদানের মাধ্যমে রোজগার করত। এসব লোকগুলো প্রায়শই জনগণনাকারীদের বলত যে, তারা ব্যবসায়ী, শ্রমিক নয়, কারণ তাদের মনে হত ব্যবসা শ্রমদান থেকে বেশি সম্মানীয় কাজ।

অনুরূপভাবে, মৃত্যু এবং রোগের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ছিল কারণ সব মৃত্যু ঘটনা নথিভুক্ত করা হত না এবং রোগের খবর সবসময় দেওয়া হত না এবং সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসিতও হত না। তাহলে কীভাবে রোগ ও মৃত্যুর ঘটনাগুলোর সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব?

তাই ঐতিহাসিকদের জনগণনার মতে উৎসগুলোকে খুব সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হয়। পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে সংখ্যাগুলোকে পুনরায় গণনা করতে হবে এবং সংখ্যাগুলো কী প্রকাশ করে না, সেটাও বুঝতে হবে। যাই হোক পৌরসভার মতো সংস্থাগুলোর জনগণনা, জরিপ মানচিত্র এবং নথিগুলো আমাদের প্রাক-ঔপনিবেশিক নগরগুলোর তুলনায় ঔপনিবেশিক নগরগুলোকে অধিক বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে।

2.2 পরিবর্তনের প্রবণতা

জনগণনার সযত্নে অধ্যয়নের ফলে কিছু আকর্ষণীয় প্রবণতা প্রকাশ্যে আসে। 1800 সালের পরে ভারতে নগরায়ণের গতি ছিল মন্থর। পুরো ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশ পর্যন্ত ভারতে মোট জনসংখ্যায় শহরের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল খুবই কম এবং সেটা স্থির ছিল। চিত্র 12.5 থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায়। 1900 থেকে 1940 অর্থাৎ এই চল্লিশ বছর সময়কালে শহরের জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার 10 শতাংশ থেকে বেড়ে গিয়ে প্রায় 13 শতাংশে পৌঁছায়।

অপরিবর্তনশীলতার এই চিত্রের অন্তরালে বিভিন্ন অঞ্চলে শহরের বিকাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন লুকিয়ে রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ছোটো শহরগুলোর অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত হবার সুযোগ কম ছিল। অন্যদিকে কলিকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ খুব দ্রুত বিকশিত হয় এবং শীঘ্রই বিস্তৃত নগরে পরিণত হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, ওই সময়ের মধ্যে অপর নগর কেন্দ্রগুলোর পরিবর্তে নতুন

বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে এই তিনটি নগরের বিকাশ ঘটে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চক্রকেন্দ্র হিসাবে অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সুতি বস্ত্রের মতো ভারতীয় উৎপাদনের রপ্তানির জন্য এই শহরগুলো সংগ্রহশালা হিসাবে কাজ করত। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পরে এই প্রবণতা উল্টে যায় এবং এই শহরগুলো বরং ব্রিটিশ উৎপাদিত পণ্যের প্রবেশ স্থান এবং ভারতীয় কাঁচা মালের রপ্তানির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি এসব ঔপনিবেশিক নগরগুলোকে ভারতের চিরাচরিত শহর এবং নগর জনবসতিগুলো থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে তোলে।

1853 সালে রেলপথের পত্তনের ফলে শহরগুলোর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। ক্রমশ পুরনো রাস্তা এবং নদীর পাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শহরগুলো থেকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দূরে সরে যায়। প্রত্যেকটি রেলওয়ে স্টেশন কাঁচামাল সংগ্রহের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং আমদানি দ্রব্যের বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত মির্জাপুর দাক্ষিণাত্য থেকে তুলো এবং সুতি দ্রব্য সংগ্রহের কেন্দ্র ছিল কিন্তু বোম্বে পর্যন্ত রেলপথে যুক্ত হলে এর পতন ঘটে (অধ্যায় 10, চিত্র 10.18 এবং 10.19 দেখো)। রেলপথের জাল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রেল কারখানা এবং রেলওয়ে বসতিগুলো স্থাপিত হয়। জামালপুর, ওয়াল্টেয়ার এবং বরেলীর মতো রেলওয়ে শহরগুলো বিকশিত হয়।

ভারতে নগরায়ণ
1891-1941

সাল	মোট জনসংখ্যায় শহরে জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
1891	9.4
1901	10.0
1911	9.4
1921	10.2
1931	11.1
1941	12.8

চিত্র 12.5

➲ আলোচনা করো...

একটি নগরের কিছু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য অথবা মানচিত্র অধ্যয়ন করো। পরীক্ষা করো কারা এই তথ্য সংগ্রহ করে এবং কেন তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়। এরকম সংগ্রহের মধ্যে সম্ভাব্য গোঁড়ামিগুলো কী কী? কোন্ ধরনের তথ্য-এর বাইরে ছিল? মানচিত্রগুলো কেন অঙ্কন করা হত এবং এগুলোতে নগরের সমস্ত অংশকে সমানভাবে চিহ্নিত করা হত কি না খুঁজে বের করো।

চিত্র 12.6
দুর্গ অঞ্চল বোরা বাজার, বোম্বে, 1885
বোম্বে শহরের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ অঞ্চলও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়। ব্যবসায়ীগণ, দোকানদারগণ এবং কর্মচারীগণ এই অঞ্চলে এসে পড়ে। অসংখ্য বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বড়ো বড়ো ভবন তৈরি হয়। এই ভীড়ের কারণে চিন্তিত ইংরেজগণ দুর্গের উত্তর ভাগে বসবাসকারী স্থানীয় ভারতীয় জনগণকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার অনেক চেষ্টা করে।

3. নতুন শহরগুলো কীরকম ছিল?

3.1 বন্দর, দুর্গ এবং সেবার জন্য কেন্দ্রসমূহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মাদ্রাজ, কলিকাতা এবং বোম্বে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়েছিল। এখানে যে জনবসতিগুলো স্থাপিত হয়েছিল সেগুলো পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেখানে তাদের কারখানাগুলো (অর্থাৎ ... বাণিজ্যিক কার্যালয়গুলো) গড়ে তুলেছিল এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে এই জনবসতিগুলোকে রক্ষা করার জন্য তারা দুর্গ তৈরি করেছিল। মাদ্রজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ, কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম এবং বোম্বাইয়ে ফোর্ট অঞ্চলগুলো ইংরেজ জনবসতি এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ, শিল্পীগণ এবং অন্য কর্মীরা যারা ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন করত তারা এই দুর্গ অঞ্চলের বাইরে তাদের নিজেদের বসতিতে বসবাস করত। এভাবে শুরু থেকেই ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের জন্য পৃথক পৃথক বসতি ছিল, যা ওই সময়ের লেখাগুলোতে যথাক্রমে 'হোয়াইট টাউন' (শ্বেত শহর) এবং 'ব্ল্যাক টাউন' (কৃষ্ণকায় শহর) নামে লিপিবদ্ধ ছিল। ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর এই জাতিগত পার্থক্য আরও জোরদার হয়।

চিত্র 12.7
থমাস এবং উইলিয়াম ডেনিয়েল দ্বারা 1787 সালে অঙ্কিত কলকাতায় ওল্ড ফোর্ট ঘাট।
ওল্ড ফোর্ট ঘাটটি জলের পাশেই ছিল। কোম্পানির পণ্যসামগ্রী এখানে নামানো হত। স্থানীয় লোক এই ঘাটটি স্নান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রেলপথের বিস্তৃত জাল এই নগরগুলোর সঙ্গে দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোকে যুক্ত করেছিল। ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলের পশ্চাদভূমি থেকে যে কাঁচামাল এবং শ্রমিকরা আসত, এই অঞ্চলগুলো এসব বন্দর নগরগুলোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। এই নগরগুলোতে রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল পরিবহণ করার পর থেকে এবং সস্তায় প্রচুর শ্রমিকের সহজলভ্যতার ফলে সেখানে আধুনিক কারখানা স্থাপন করা সুবিধাজনক ছিল। 1850-এর দশকের পর বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক এবং উদ্যোক্তাদের দ্বারা বস্ত্র কারখানা স্থাপিত হয় এবং কলকাতার আশপাশে ইউরোপীয় মালিকানায় পাটের কারখানাগুলো স্থাপিত হয়। এটা ভারতে আধুনিক শিল্প বিকাশের সূত্রপাত ছিল।

যদিও কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ (ইংল্যান্ডে শিল্পের জন্য) কাঁচামালের যোগান দিত এবং পুঁজিবাদের মতো আধুনিক অর্থনৈতিক শক্তির কারণে এই নগরগুলোর উদ্ভব হয়। তবে তাদের অর্থনীতি মুখ্যত কারখানা উৎপাদনের উপর নির্ভর ছিল না। এই নগরগুলোর অধিকাংশ শ্রমজীবি সেই শ্রেণির অন্তর্গত ছিল যাদের অর্থনীতিবিদগণ

তৃতীয় ক্ষেত্র (tertiary sector) হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করেন। ওই সময় সেখানে যথোপযুক্ত দুটি 'শিল্প নগরী' ছিল : চামড়া, পশমী এবং সুতি বস্ত্রে কানপুর এবং স্টীল উৎপাদনের জন্য জামশেদপুর বিখ্যাত ছিল। ভারত কখনো আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ হতে পারে নি কারণ পক্ষপাতমূলক ঔপনিবেশিক নীতিগুলো শিল্প উন্নয়নের গতিকে রুদ্ধ করেছিল। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ বড়ো নগরে তো পরিণত হয় কিন্তু এতে উপনিবেশিক ভারতের সমগ্র অর্থনৈতিক বিকাশে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন আসে নি।

3.2 একটি নতুন শহরের সামাজিক পরিবেশ

ঔপনিবেশিক নগরগুলো নতুন শাসকদের বাণিজ্যিক সংস্কৃতিকে প্রতিবিম্বিত করত। রাজনৈতিক শক্তি এবং পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় শাসকদের হাত থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের হাতে চলে যায়। দোভাষী, ফড়িয়া/দালাল, ব্যবসায়ী এবং পণ্য সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করা ভারতীয়দেরও এই নতুন নগরগুলোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। নদী বা সমুদ্রের নিকটে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে পোতাশ্রয় এবং ঘাটগুলো বিকাশ লাভ করে। সমুদ্র উপকূলে গুদাম, বাণিজ্যিক কার্যালয়, জাহাজের বীমা সংস্থাগুলো, পরিবহণ ঘাঁটি, ব্যাংকিং স্থাপনা ছিল। কোম্পানির মুখ্য প্রশাসনিক কার্যালয়গুলো ছিল সমুদ্র থেকে দূরে। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং ছিল এরকমই একটি কার্যালয়। দুর্গ পরিধির চারপাশে ইউরোপীয় বণিক এবং দালালগণ ইউরোপীয় শৈলীতে প্রাসাদতুল্য বাড়ি তৈরি করেছিল।

আয়নিক হল প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্য তিনটি রীতির মধ্যে একটি, অপর দুটো হল ডরিক এবং করিন্থিয়ান। একটি বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি রীতিকে চিহ্নিত করে তা হল স্তম্ভের মাথায় শীর্ষস্থানের শৈলী। এইরূপগুলোকে পুনর্জাগরণের নব্য ধ্রুপদি স্থাপত্যে পুনর্অভিযোজিত করা হয়।

ডোরিক ক্যাপিটাল

আয়োনিক ক্যাপিটাল

করিন্থিয়ান ক্যাপিটাল

চিত্র 12.8

1786 সালে থমাস এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েল কর্তৃক অঙ্কিত দ্যা ওল্ড কোর্ট হাউস এবং রাইটার্স বিল্ডিং-এর চিত্র।

ডানদিকে বিচারালয়ের খিলানে আচ্ছাদিত উন্মুক্ত বারান্দা এবং আয়নিক স্তম্ভকে 1792 সালে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এরপরেই রয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং যেখানে দেশে আগমনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ থাকতেন। পরবর্তী সময় এই ভবন একটি সরকারী কার্যালয়ে পরিণত হয়।

চিত্র 12.9
1787 সালে থমাস এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েল কর্তৃক অঙ্কিত চৌরঙ্গিতে অবস্থিত নতুন ভবন
ময়দানের পূর্বদিকে ইংরেজদের ব্যক্তিগত বাড়িগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ প্যালাডিয়ান শৈলী যার মধ্যে গরম থেকে বাঁচার জন্য স্তম্ভযুক্ত বারান্দা ছিল।

শহরতলী এলাকায় কিছু লোক বাগান বাড়ি তৈরি করেছিল। ক্ষমতাসীন অভিজাতদের জন্য জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র ক্লাব, ঘোড়দৌড়ের মাঠ এবং নাট্যশালাও তৈরি করা হয়েছিল।

ধনী ভারতীয় দালাল এবং ফড়িয়াগণ বাজারের আশেপাশে ব্ল্যাক টাউনে চিরাচরিত বড়ো প্রাঙ্গনযুক্ত বাড়ি তৈরি করেন। তারা ভবিষ্যতের লগ্নি হিসাবে শহরে বৃহৎ আকারের জমি ক্রয় করতো। তারা তাদের ইংরেজ প্রভুদের প্রভাবিত করার জন্য উৎসব চলাকালীন দারুণ ভোজসভার আয়োজন করত। সমাজে তাদের পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা মন্দিরও তৈরি করত। শ্রমিক শ্রেণির গরিবরা পাচক, পাল্কী বাহক, গাড়োয়ান, চৌকিদার, কুলি এবং নির্মাণকারী শ্রমিক এবং খালাসি হিসাবে তাদের ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রভুদের বিভিন্ন ফরমায়েশ খাটত। তারা শহরের বিভিন্ন অংশে অস্থায়ী কুঁড়েঘরে বসবাস করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঔপনিবেশিক শহরের প্রকৃতি আরও বদলে যায়। 1857 সালের বিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজরা এই ভয়ে আতঙ্কিত ছিলেন যে ভারতীয়রা যে-কোনো সময় আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তারা উপলব্ধি করে যে, শহরগুলো আরো সুরক্ষিত হওয়া দরকার এবং ইংরেজদের (শ্বেতকায়দের) 'স্থানীয়দের' হুমকি বা দাপট থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং বিচ্ছিন্ন জনপদে বসবাস করতে হবে। পুরনো শহরের চারপাশে মাঠ এবং কৃষিজ ভূমি পরিষ্কার করা হয় এবং 'সিভিল লাইনস' নামে পরিচিত নতুন শহর এলাকা গড়ে তোলা হয়। শ্বেতকায় লোকেরা সিভিল লাইনে বসবাস করতে শুরু করে। সেনা ছাউনিগুলোতে ইউরোপীয়দের অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে রাখা হত যা নিরাপদ জনপদ

চিত্র 12.10
দ্যা মার্বল প্যালেস, কলিকাতা
নতুন শহুরে অভিজাত বর্গের অন্তর্গত একটি ভারতীয় পরিবার দ্বারা তৈরি সবচেয়ে সুন্দর ভবনগুলোর মধ্যে এটি হল একটি।

চিত্র 12.11
চার্লস ডি অইলী দ্বারা অঙ্কিত চিটপুর বাজার
চিটপুর বাজার কলিকাতায় ব্ল্যাক টাউন (Black Town) এবং হোয়াইট টাউন (White Town)-এর সীমানায় অবস্থিত ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাড়িগুলোকে লক্ষ করো : একদিকে ধনী জমিদারে ইটের ভবন আর অন্যদিকে গরীবদের খড়ের কুঁড়েঘর। ছবিতে দেখানো মন্দিরকে ইংরেজরা ব্ল্যাক প্যাগোডা বলে উল্লেখ করত যার নির্মাণ এখানকার বাসিন্দা গোবিন্দ রাম মিত্তির নামে এক জমিদার করেছিলেন। জাতির ভাষা দ্বারা গঠিত এমনকি নামও প্রায়ই কালিমা দ্বারা রঙিন করা হত।

হিসাবেও বিকশিত হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলো ভারতীয় শহরগুলো থেকে আলাদ কিন্তু সংযুক্ত ছিল। চওড়া রাস্তা, বড়ো বাগানের মাঝখানে তৈরি বাংলা বাড়ি, সেনা ছাউনি, প্যারেড মাঠ এবং চার্চ প্রভৃতি যুক্ত এই সেনা ছাউনিগুলো ইউরোপীয় লোকদের জন্য একটি সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল তো ছিলই, এর পাশাপাশি ঘনবসতিপূর্ণ ভারতীয় শহরগুলোর বিপরীতে সুব্যবস্থিত শহুরে জীবনের একটি নিদর্শনও ছিল।

ইংরেজদের কাছে "ব্ল্যাক" (Black) এলাকা শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার প্রতীকই ছিল না, উপরন্তু অশ্লীলতা এবং রোগের প্রতীকও ছিল। ইংরেজরা দীর্ঘ সময়ের জন্য মূলত "হোয়াইট" (White) এলাকায় স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার প্রতি আগ্রহী ছিল। কিন্তু যখন কলেরা এবং প্লেগ-এর মতো মহামারি ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়, তখন ঔপনিবেশিক আধিকারিকগণ জঞ্জাল সাফাই এবং গণস্বাস্থ্যের জন্য আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তারা ভীত ছিল যে, "ব্ল্যাক" এলাকা থেকে "হোয়াইট" এলাকায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে। 1860 এবং 1870-এর দশক থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ভারতীয় শহরগুলোতে নির্মাণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই সময়ের আশেপাশে মাটির নীচে নলে জল সরবরাহ, নিকাশী এবং নর্দমা ব্যবস্থাও তৈরি করা হয়। এভাবে স্বাস্থ্যবর্ধক নজরদারী ভারতীয় শহরগুলো নিয়ন্ত্রণের অপর একটি উপায়ে পরিণত হয়।

➲ চিত্র 12.8, 12.9 এবং 12.11-এর দিকে লক্ষ করো। রাস্তার উপর বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতার রাস্তার উপর সামাজিক জীবন সম্পর্কে এই ক্রিয়াকলাপগুলো থেকে আমরা কী জানতে পারি?

3.3 প্রথম শৈল শহর

সেনানিবাসের মতো শৈল শহর ছিল ঔপনিবেশিক শহুরে বিকাশের এক স্বাতন্ত্র্যসূচক রূপ। শৈল শহরগুলোর স্থাপন প্রাথমিকভাবে ইংরেজ সেনার প্রয়োজনের সঙ্গো সম্পর্কিত ছিল। সিমলা (বর্তমানে শিমলা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গুর্খা যুদ্ধ (1815-16) চলাকালীন। 1818 সালে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণে

চিত্র 12.12
সিমলায় প্রতীক স্বরূপ একটি ঔপনিবেশিক বাড়ি; বিংশ শতাব্দীর শুরুর একটি আলোকচিত্র খুব সম্ভবত এটা স্যার জন মার্শালের বাসভবন ছিল।

মাউন্ট আবুর প্রতি ইংরেজদের আগ্রহ জন্মায় এবং দার্জিলিংকে 1835 সালে সিকিমের শাসকদের কাছ থেকে হস্তগত করা হয়। শৈল শহরগুলো সেনাবাহিনী থাকার, সীমানা নজরদারি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়।

ভারতীয় পাহাড়গুলোর নাতিশীতোষ্ণ এবং ঠাণ্ডা জলবায়ুকে সুবিধাজনক হিসাবে দেখা হয় বিশেষ করে এই কারণে যে ব্রিটিশরা ভারতে যে গরম আবহাওয়ার প্রভাবে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের বিশেষভাবে কলেরা, ম্যালেরিয়ার ভয় ছিল এবং সেনাবাহিনীকে এইসব রোগ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হত। সেনাবাহিনীর প্রবল উপস্থিতির ফলে এইসব স্থানগুলো পাহাড়ে একটি নতুন ধরনের সেনা শিবিরে পরিণত হয়। এই শৈল শহরগুলো স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেও বিকশিত হয়, অর্থাৎ সেখানে সেনাদের বিশ্রামের জন্য এবং অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য প্রেরণ করা হত।

যেহেতু শৈল শহরগুলোর জলবায়ুর সাথে ইউরোপের ঠাণ্ডা জলবায়ুর প্রায় মিল ছিল, তাই নতুন শাসকদের কাছে এগুলো আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়। গ্রীষ্মের মাসগুলো শৈল শহরগুলোতে কাটানো যেন ভাইসরয়দের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। 1864 সালে ভাইসরয় জন লরেন্স তাঁর পরিষদকে সিমলায় সরকারিভাবে স্থানান্তরিত করেন এবং গরমকালে রাজধানী পরিবর্তনের অভ্যাসকে বন্ধ করেন। সিমলা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানের সরকারি বাসভবনেও পরিণত হয়।

চিত্র 12.13
হিমাচল প্রদেশে মানালির নিকটে একটি গ্রাম
যদিও ইংরেজগণ শৈলশহরগুলোতে ঔপনিবেশিক স্থাপত্য শৈল প্রবর্তন করেন, তবুও স্থানীয় বাসিন্দারা পূর্বের মতোই বসবাস করতে থাকে।

ইংরেজ এবং ইউরোপীয়রা শৈল শহরগুলোতে তাদের বাসস্থান পুনর্গঠন তৈরি করতে চেয়েছিল যা তাদের বাড়ির কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভবনগুলো ভেবেচিন্তে ইউরোপীয় শৈলীতে তৈরি করা হয়েছিল। পৃথক পৃথক বাড়িগুলো বিচ্ছিন্ন ভিলার ধাঁচে এবং বাগানের মাঝখানে তৈরি কুটিরের আদলে বানানো হত। বিলাতি গির্জা এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলো ইংরেজ আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত। এমনকী বিনোদনমূলক কার্যকলাপগুলো ইংরেজ সাংস্কৃতিক প্রথাগুলোর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এভাবে শৈল শহরগুলোতে সামাজিক নিমন্ত্রণ, চা-প্রাণ, বনভোজন, নৈশভোজ, ঘোড়দৌড় এবং নাটক দেখা ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের মধ্যে এক সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

রেলপথের প্রবর্তনের ফলে শৈল শহরগুলো ভারতীয় সহ বিস্তীর্ণ অংশের লোকেদের নাগালের মধ্যে চলে আসে। মহারাজা, উকিল এবং ব্যবসায়ীদের মতে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভারতীয়দের এইসব স্থানগুলোতে দেখা যায় কারণ এতে তাদের মধ্যে শাসক ইংরেজ

অভিজাতবর্গের ঘনিষ্ট হবার অনুভূতি জাগে।

শৈল শহরগুলো ঔপনিবেশিক অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে চা এবং কফি বাগান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমভূমি অঞ্চল থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের আগমন শুরু হয়। এর অর্থ হল এই যে, শৈল শহরগুলো ভারতে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া ছিটমহল আর রইল না।

চিত্র 12.14
কলকাতার একটি রাস্তায় ট্রামস্

3.4 নতুন নগরগুলোর সামাজিক জীবন

ভারতীয় জনসাধারণের জন্য নতুন নগরগুলো ছিল হেঁয়ালির মতো যেখানে মনে হয় জীবন নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। সেখানে চূড়ান্ত ধনী এবং দরিদ্রতার মধ্যে একটি নাটকীয় পার্থক্য ছিল।

ঘোড়াগাড়ির মতো নতুন পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে ট্রাম এবং বাস আসার অর্থ হল যে, মানুষ নগর কেন্দ্র থেকে দূরে বসবাস করতে পারত। সময়ের সাথে সাথে কাজের স্থান বাসস্থান থেকে ক্রমে দূরে চলে যেতে থাকে। বাড়ি থেকে কার্য্যালয়ে অথবা কারখানায় যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা।

যদিও পুরোনো শহরের একাত্মতা এবং পরিচিতি বোধ সেখানে আর রইল না। তবে সরকারি উদ্যান, নাট্যমঞ্চ এবং বিংশ শতাব্দী থেকে চালু হওয়া সিনেমা হলগুলোর মতো জনসমাগমস্থল তৈরির ফলে বিনোদন এবং সামাজিক আদানপ্রদান একটি নতুন রূপ লাভ করে।

নগরগুলোর মধ্যে নতুন সামাজিক শ্রেণি তৈরি হয় এবং মানুষের পুরোনো পরিচয়গুলোর আর গুরুত্ব রইল না। সমস্ত শ্রেণির মানুষ বড়ো শহরগুলোতে চলে যায়। সেখানে করণিক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং হিসাব রক্ষকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ছিল। ফলস্বরূপ "মধ্যবিত্ত শ্রেণির" সংখ্যা বেড়ে যায়। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগারের মতো নতুন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা প্রবেশ করেছিল। শিক্ষিত লোক হিসাবে তারা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং জনসভাগুলোতে সমাজ এবং সরকারের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারত। বিতর্ক এবং আলোচনার এক নতুন জনসমাবেশ উদিত হয়। সামাজিক রীতি নীতি, আদর্শ এবং প্রথাগুলোর উপরে প্রশ্ন উঠে আসে।

তবে সামাজিক পরিবর্তনগুলো খুব সহজে ঘটেনি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নগরগুলো মহিলাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। সাময়িক পত্রিকা, আত্মজীবনী এবং বইয়ের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলারা নিজেদের প্রকাশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক লোক চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের পরিবর্তন করার এসব চেষ্টাকে ক্ষতিকর বলে মনে করে। রক্ষণশীলদের ভয় ছিল যে, মহিলাদের শিক্ষা বিশ্বকে উল্টেপাল্টে দেবে এবং পুরো সমাজ

আমার কথা (আমার কাহিনি)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা রঙ্গশালায় বিনোদিনী দাসী (1863-1941) ছিলেন একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব (এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে)। তিনি নাট্যকার ও নির্দেশক গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (1844-1912)-এর সঙ্গে কাছে থেকে কাজ করেছেন। কলকাতায় স্টার থিয়েটার (1883) প্রতিষ্ঠার পেছনে তিনি ছিলেন অন্যতম মুখ্য প্রস্তাবক যা পরবর্তী সময় বিখ্যাত মঞ্চস্থ নাটকাদির কেন্দ্রে পরিণত হয়। 1910 থেকে 1913-এর মধ্যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' (আমার কাহিনি) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বরূপে তিনি সমাজে মহিলাদের ভূমিকা পুর্নগঠনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। তিনি একজন পেশাদার ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন অভিনেত্রী, প্রতিষ্ঠান নির্মাতা এবং লেখিকা হিসাবে কাজ করেন কিন্তু ওই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে তার দৃঢ় সামাজিক ভাবমূর্তির জন্য অবজ্ঞা করে।

চিত্র 12.15
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের এক কালিঘাট চিত্র
স্ত্রীশক্তি সম্পর্কে পুরুষদের উৎকণ্ঠাকে প্রায়ই এমন এক ছবির মাধ্যমে দেখানো হত যেখানে মহিলা এক যাদুকরির বেশে পুরুষকে শেষে রূপান্তরিত করত। মহিলারা শিক্ষিতা হতে শুরু হলে এবং বাড়ির নির্জনতা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলে জনপ্রিয় চিত্রগুলোতে মহিলাদের এরকম ছবি প্রচুর সংখ্যায় দেখানো শুরু হয়।

ব্যবস্থার ভিত্তি হুমকির সম্মুখীন হবে। এমনকী সংস্কারকগণ, যারা মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণকে সমর্থন করতেন, তারাও প্রাথমিকভাবে মহিলাদের 'মা' এবং 'স্ত্রী' চিরাচরিত ভূমিকায় দেখতেন এবং চাইতেন যে তারা যেন ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই থাকুক। সময়ের সাথে সাথে প্রকাশ্যে মহিলাদের বেশি করে দেখা যেতে থাকে। তারা ঝি এবং কারখানা শ্রমিক, শিক্ষিকা, নাট্যকর্মী এবং চলচ্চিত্র অভিনেত্রী হিসাবে শহরে নতুন পেশায় প্রবেশ করে। কিন্তু এসব মহিলারা যারা বাড়ির বাইরে প্রকাশ্য স্থানে বেরিয়ে আসে, তারা সামাজিক তিরস্কারের বস্তু হিসাবে থেকে যায়। নগরের মধ্যে অপর নতুন শ্রেণি ছিল গরিব শ্রমিক অথবা শ্রমিক শ্রেণি। বিত্তহীনরা কাজের আশায় গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে ভিড় করে। কিছু লোক শহরকে সুযোগের জায়গা হিসাবে দেখত। কিছু লোক জীবনের বিভিন্ন পথের প্রলোভনে আকর্ষিত হয়ে শহরে এসে হাজির হত। কিছু লোক ইতিপূর্বে তারা যা কখনো দেখেনি এসব বস্তু দেখার আকাঙ্ক্ষায় শহরে এসে ভিড় করতে থাকত। শহরে বসবাসের খরচ কমানোর জন্য অধিকাংশ প্রবাসী পুরুষ তাদের পরিবারবর্গের গ্রামের বাড়িতে রেখে আসত। শহরের জীবন ছিল এক সংগ্রাম যেখানে কাজ ছিল অনিশ্চিত, খাদ্য ছিল ব্যয়বহুল এবং থাকার জায়গার জন্য খরচ যোগাড় করা কষ্টকর। তবুও গরিবরা সেখানে প্রায়ই তাদের নিজস্ব জীবন্ত শহুরে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। তারা ধর্মীয় উৎসব, তামাশা (লোকনাট্য) এবং ব্যঙ্গাধর্মী নাটক প্রভৃতিতে

➲ আলোচনা করো...

তোমার বাড়ির সবচেয়ে কাছে কোন্ রেলস্টেশনটি রয়েছে? এটা কবে তৈরি হয়েছিল এবং এটা পণ্য পরিবহণ করার জন্য অথবা মানুষের যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়েছিল কিনা খুঁজে বের করো। বয়স্ক লোকেদের জিজ্ঞেস করো রেলস্টেশন সম্পর্কে তারা কী জানে? তুমি রেলস্টেশনে কতবার গিয়েছ এবং কেন?

উৎস 2

গরিব অভিবাসীদের চোখে

এটা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেলেপাড়া কলিকাতাবাসীদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ব্যঙ্গাধর্মী রচনা ছিল :

Dil-me ek bhavna se Kalkatta-me aya	হৃদয়ে এক প্রত্যাশা নিয়ে কলকাতায় আসলাম
Kaisan kaisan maja ham hiya dekhne paya	কী কী মজাদার জিনিস আমি এখানে দেখতে পেলাম
Ari-samaj, Brahma-samaj, girja, mahjid	আর্যসমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, গীর্জা, মসজিদ
Ek lota-me milta – dudh, pani, sab chij	এক ঘটিতে পাওয়া যায় — দুধ, জল, সব জিনিস
Chhota bara admi sab, bahar kar ke dat	ছোটো বড়ো সব লোক, বের করে দাঁত
Jhapat mar ke bolta hai, Angreji-me bat.	চটপট করে বলে, ইংরেজিতে কথা।

উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করত যেখানে প্রায়শই তাদের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রভুদের উপহাস করা হত।

4. স্বতন্ত্রীকরণ, নগর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য মাদ্রাজ, কলকাতা এবং বোম্বাই

মাদ্রাজ, কলকাতা এবং বোম্বাই ক্রমশ ঔপনিবেশিক ভারতের বৃহত্তম নগরী হিসেবে গড়ে ওঠেছিল। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এই শহরগুলোর কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা প্রত্যেকটি নগরের একটি বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচনা করব।

4.1 মাদ্রাজ নগরীর বসতি স্বতন্ত্রীকরণ

কোম্পানি প্রথম অবস্থায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাট বন্দরে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ শুরু করে। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা বিক্রয়যোগ্য বস্ত্রের সন্ধানে পূর্ব উপকূলে পৌঁছান। 1639 খ্রিঃ তারা মাদ্রাজপত্তমে একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র তৈরি করে। স্থানীয় ভাষায় এই জায়গাটির নাম ছিল চেনাপত্তনম। কোম্পানি স্থানীয় তেলেগু জমিদার কলহস্তির নায়ক যারা এই অঞ্চলে ব্যবসায়িক কার্যকলাপে সাহায্য করতে উৎসাহী ছিলেন তাদের কাছ থেকেই এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অধিকার ক্রয় করে নেয়। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বৈরিতার (1746-63) ফলে ব্রিটিশরা মাদ্রাজকে সুরক্ষিত করে এবং এখানকার ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের অধিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করেন। 1761 খ্রি. ফ্রান্সের পরাজয়ের পর মাদ্রাজ আরো বেশি সুরক্ষিত হয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক শহর হিসেবে গড়ে ওঠতে থাকে। এই শহরেই ব্রিটিশ আধিপত্য এবং ভারতীয় বণিকদের নিম্নতর অবস্থান প্রকট হয়ে ওঠে।

সেন্ট জর্জ দুর্গকে কেন্দ্র করেই শ্বেতাঙ্গ শহর গড়ে ওঠে, যেখানে ইউরোপীরা বসবাস করত। প্রাচীর ও গম্বুজ দ্বারা একে একটি স্বতন্ত্র ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। দুর্গ এলাকায় বসবাসকারীদের যোগ্যতা গায়ের রং ও ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হত। কোম্পানি ভারতীয়দের সাথে বিবাহ বন্ধনে অনুমতি দিত না। ইউরোপীয় এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ার ফলে ডাচ এবং পর্তুগীজরা সেখানে থাকার অনুমতি লাভ করত। প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থাও শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে ছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও ইউরোপীয়রা ছিল শাসক শ্রেণি। সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের প্রয়োজন ও সুবিধার্থে মাদ্রাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল।

দুর্গ এলাকার বাইরে ব্ল্যাক টাউন (Black Town)-এর উন্নতি ঘটেছিল। এর সরলরৈখিক (straight lines) গঠন ঔপনিবেশিক শহরগুলো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করত। তৎসত্ত্বে 1700 খ্রি. মধ্যভাগে এই শহরকে ধ্বংস করে দুর্গের চারপাশে প্রশস্ত

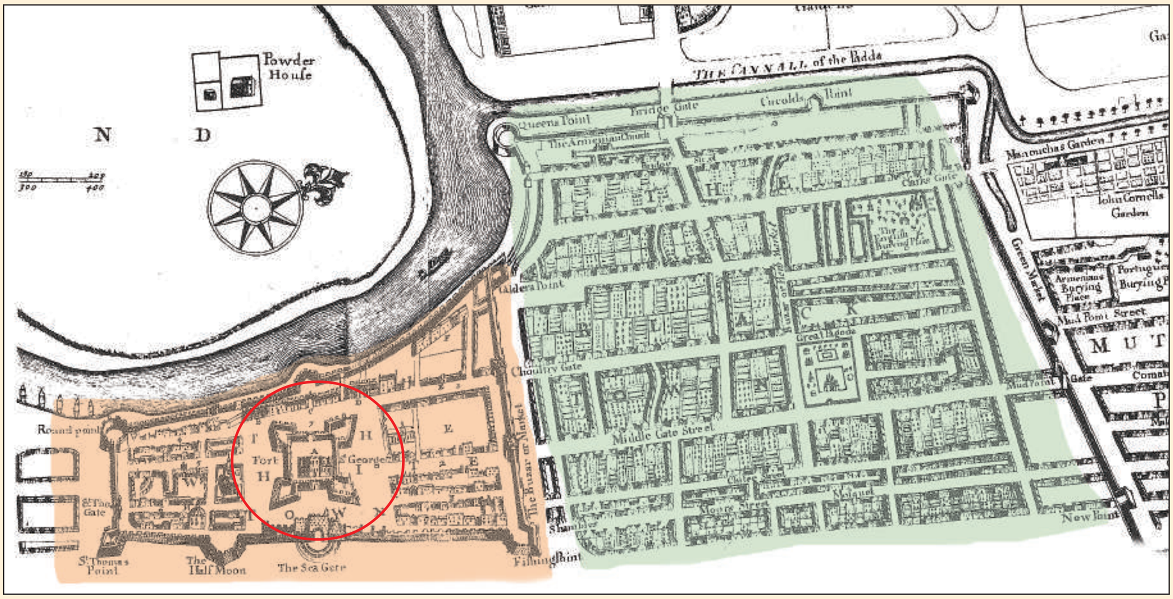

চিত্র 12.16
মাদ্রাজের নক্‌শা
সেন্ট জর্জ দুর্গের চতুর্দিকে গড়ে ওঠা শ্বেতাঙ্গ শহর বায়ে এবং পুরোনো ব্ল্যাক টাউন ডান দিকে গড়ে ওঠে। দুর্গকে বৃত্তাকারে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্ল্যাক টাউনের গঠন শৈলী লক্ষ করো।

চিত্র 12.17
1798 খ্রি. ওরিয়েন্টাল সিনারিতে প্রকাশিত ড্যানিয়েল অঙ্কিত মাদ্রাজের ব্ল্যাক টাউন
তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, এমন উন্মুক্ত স্থান তৈরি করতে পুরোনো ব্ল্যাক টাউন ভেঙে ফেলা হয়েছিল। মূলত গোলাগুলির সুবিধার জন্য স্থানটি পরিষ্কার করা হয়, খোলা মাঠটি পরে সবুজ অঞ্চল হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। দুর্গ থেকে দূরত্বে তৈরি করা নতুন ব্ল্যাক টাউনের অংশ দিনান্তে দৃশ্যমান।

সুরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। আরো দূরে উত্তর দিকে একটি নতুন ব্ল্যাক টাউন (Black Town) বিকশিত হয়েছিল। তাঁতি, কারিগর, মধ্যস্বত্বভোগী এবং দোভাষী যারা এই শহরে বসবাস করত তারা কোম্পানির বাণিজ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

মন্দির ও বাজার এলাকাকে কেন্দ্র করে পুরোনো ভারতীয় শহরগুলো গড়ে ওঠার যে ধারা ছিল নতুন ব্ল্যাক টাউনগুলো এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল (তা পরিলক্ষিত হয়) শহরের অভ্যন্তরে আঁকাবাঁকা ছোটো গলিযুক্ত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন জাতির নৈকট্য ছিল। চিন্তাড্রিপেট কেবল তাঁতীদের জন্য ছিল। ওয়াশারম্যানপেট বস্ত্র রংকারী এবং ধোপাদের কলোনী ছিল, রয়াপুরম এলাকায় কোম্পানির কাজে নিযুক্ত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মাঝিরা বাস করতেন।

পেট তামিল শব্দ যার অর্থ বসতি। যদিও *পুরুম* শব্দটি গ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত।

আশেপাশের অসংখ্য গ্রামগুলোকে একত্রিত করে মাদ্রাজ গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য স্থান ও সুযোগ তৈরি করে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মাদ্রাজে এসে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করে, এখানে বসতি স্থাপন করে। দোভাষীরা ভারতীয় ছিল যারা স্থানীয় ও ইংরেজী দুই ভাষাই কথা বলতে পারত। তারা এজেন্ট এবং বণিক হিসাবে কাজ করত এবং ভারতীয় সমাজে ও ব্রিটিশদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবেও কাজ করত। তারা সম্পদ অর্জনের জন্য সরকারে তাদের সুবিধাযুক্ত অবস্থানটি ব্যবহার করত। ব্ল্যাক টাউন তাদের পরোপকারী দানশীল কাজ এবং মন্দিরগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা সমাজে তাদের ক্ষমতাশালী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিকভাবে কোম্পানির চাকুরী ক্ষেত্রে ভল্লালার নামক একটি গ্রামীণ গোষ্ঠী লোকদের একাধিপত্য স্থাপিত হয় এবং তারা ব্রিটিশ শাসনের ফলে উদ্ভূত সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে ব্রাহ্মণরাও প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য এই গোষ্ঠীর সঙ্গো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তেলেগু কোমাটি নামে একটি ক্ষমতাবান বাণিজ্যিক গোষ্ঠী মাদ্রাজ শহরের শস্য ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। গুজরাটি মহাজনরাও (bankers) অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মাদ্রাজের ব্যবসায়িক জগতে অবস্থান করছিলেন পরিবার ও বানিয়ারা ছিলেন শ্রমজীবি গরিব শ্রেণি। আর্কটের নবাব পার্শ্ববর্তী ট্রিপলিকেন-এ বসতি স্থাপন করে, যাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। বিগত সময়ে ময়লাপুর এবং ট্রিপলিকেন ছিল হিন্দুধর্মীয় কেন্দ্র এবং সেখান থেকে অনেক সংখ্যক ব্রাহ্মণেরা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। সান থোমে এবং সেখানকার গির্জা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল। এই সমস্ত বসিতগুলো মাদ্রাজ শহরের

চিত্র 12.18
পুনামালি রোডে তৈরি একটি বাগানবাড়ি

উৎস 3

একটি গ্রামীণ শহর ?

1908 সালের ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার থেকে মাদ্রাজ সম্পর্কে উদ্ধৃতিটি পড়ো :

> ... পার্কের আকার বিশিষ্ট প্রশস্ত জমির মাঝখানে উন্নত ইউরোপীয় আবাসগুলো নির্মিত হয়। গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল ধানক্ষেত। এমনকি ব্ল্যাক টাউন এবং ট্রিপলিকেনের মতো ঘনবসতিযুক্ত দেশীয় বসতিতেও অন্যান্য শহরের তুলনায় খুব কম ভীড় পাওয়া যায়। ...

➲ প্রতিবেদনে প্রায়ই প্রতিবেদকের মনোভাব প্রকাশিত হয়। তার বিবরণে কোন্ ধরনের শহরের গুণকীর্তন করছেন বা কোন্ শহরকে হেয় করে দেখেছেন? তুমি কি এইসব ধারণার সাথে একমত?

অংশে পরিণত হয়। এইভাবে অনেক গ্রাম একত্রিত হওয়ার ফলে মাদ্রাজ একটি বিস্তৃত ও কর্ম জন ঘনত্বের শহরে পরিণত হয়। এটি ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা লক্ষ্য করেছেন এবং ইংরেজ আধিকারিকরাও এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।

ব্রিটিশরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার পর ইউরোপীয় অধিবাসীরা দুর্গের বাইরেও সরে যেতে থাকে (বাসস্থান তৈরি করতে থাকে)। দুর্গ থেকে সেনাছাউনিতে যাওয়ার রাস্তায় মাউন্টরোড ও পুনামালী রোডের ধারে সর্বপ্রথম বাগান বাড়ি (Garden houses) তৈরি হতে থাকে। সম্পন্ন ভারতীয়রাও ইংরেজদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে থাকে। ফলস্বরূপ মূল মাদ্রাজ শহরের আশেপাশের গ্রামে অনেক নতুন উপশহর গড়ে ওঠে। এটা অবশ্যই সম্ভব ছিল কারণ বিত্তবানদের নিজস্ব পরিবহণ মাধ্যম ছিল। গরিব মানুষেরা তাদের কর্মক্ষেত্রের নিকটবর্তী গ্রামে বসবাস করতে থাকে। এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলও ধীরে ধীরে নগরের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকলে ক্রমশ মাদ্রাজের নগরায়ণ ঘটে। ফলে মাদ্রাজ শহরে একটি গ্রামীণ পরিবেশও ছিল।

4.2 কোলকাতা নগর পরিকল্পনা

আধুনিক নগর পরিকল্পনা প্রথম শুরু হয় ঔপনিবেশিক শহরগুলোতে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত নাগরিক এলাকার নক্‌শা এবং নাগরিক ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সংক্রান্ত জ্ঞান। একটি শহরের বহিরঙ্গ, এর উন্নয়ণের পথ, সুসংগঠিতভাবে সমস্ত এলাকা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা - ইত্যাদি ভাবনার উপর ভিত্তি করে নগর গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী নগর জীবন এবং নগর ব্যবস্থাগুলোর উপর রাষ্ট্রশক্তির সকল প্রয়োগের উপরই নগরের উন্নয়ন নির্ভর করে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকেই নানা কারণে ব্রিটিশরা নগরের নক্‌শা তৈরির দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। প্রথম প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সুরক্ষা সম্বন্ধীয়। 1757 খ্রি. বাংলার নবাব সিরাজ উদ দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পণ্য মজুত রাখার জন্য নির্মিত ছোটো দুর্গটি ধ্বংস করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীরা নবাবের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে অনবরত প্রশ্ন তুলছিলেন, তারা নবাবকে পণ্যের জন্য আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক প্রদান করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং নবাব নির্দেশিত ব্যবসায়িক রীতিনীতি মান্য করতে অস্বীকার করেন। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সিরাজ উদ দৌল্লা তার শক্তি প্রয়োগে এগিয়ে এলেন।

পরবর্তী সময়ে 1757 খ্রি. পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ উদ দৌল্লার পরাজয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি নতুন সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করার মনস্ত করে। কলকাতা, সূতানুটী ও গোবিন্দপুর — এই তিনটি গ্রামকে একত্রিত করে কলকাতা শহর তৈরি হয়। দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের একটি বিশেষ জায়গা পরিষ্কার করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, সেখানে বসবাসকারী তাঁতি এবং ব্যবসায়ীদের স্থান ত্যাগ

করতে নির্দেশ দেয়। নবনির্মিত ফোর্ট উইলিয়ামের চারপাশের প্রশস্ত প্রান্তর স্থানীয় ভাষায় ময়দান বা গড়ের মাঠ বলে পরিচিত হয়। দুর্গের দিকে এগিয়ে আসা শত্রু বাহিনীর উদ্দেশ্য গুলি বর্ষণের পথে কোনো রকম বাধা দূর করার উদ্দেশ্যেই উন্মুক্ত অঞ্চলের ব্যবস্থা করা হয়। ব্রিটিশরা কলকাতায় তাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর দুর্গ এলাকার বাইরে ময়দানের চৌহদ্দিতে বাসগৃহ নির্মাণ করতে শুরু করে। এইভাবেই কলকাতায় ইংরেজ বসতির শুরু হয়। কলকাতায় নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দুর্গ সংলগ্ন উন্মুক্ত জায়গাটি (বর্তমানেরও বিদ্যমান) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতার নগর পরিকল্পনার ইতিহাস দুর্গ ও ময়দান তৈরির মধ্য দিয়েই শেষ হয়নি। 1798 খ্রি. লর্ড ওয়েলেসলী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি কলকাতা গভর্মেন্ট হাউস বলে খ্যাত বিশাল অট্টালিকা তার বসবাসের জন্য নির্মাণ করান। এই অট্টালিকা স্থাপনের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশের অধিকার স্থাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। তিনি শহরের ভারতীয় অংশের ঘনবসতি, অতিরিক্ত গাছপালা, নোংরা জলাধার, দুর্গন্ধযুক্ত ও দুর্বল জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হন। এই পরিস্থিতি ব্রিটিশদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল কারণ তারা ধারণা করে যে, জলাভূমি এবং বদ্ধ জলাশয় থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস নানা রকম অসুস্থতার সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্রান্তীয় (tropical) জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও শক্তিক্ষয়কারী। নগরীর মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর তৈরি করা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরী

গুলি বর্ষণের পথ

মজার ব্যাপার হল, কলকাতার দুর্গ যে নমুনায় তৈরি হয়, অন্যান্য শহরের ক্ষেত্রেও তা অনুসরণ করা হয়। 1857 খ্রি. বিদ্রোহের সময় অনেক সময় বিদ্রোহীদের দুর্গে পরিণত হয়, বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশরা সে সমস্ত শহরে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে চাইলেন। যেমন দিল্লিতে লালকেল্লায় সেনাঘাটি নির্মাণ করা হয়। এরপর কেল্লা সংলগ্ন এলাকায় ইমারত ধ্বংস করে ভারতীয় বসতি ও দুর্গের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত অঞ্চলে তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রেও 100 বছর পূর্বের কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের সময়কাল যুক্তি তুলে ধরা হয়। একটি উন্মুক্ত গোলাবর্ষণের পথ রাখা জরুরী বলে মনে করা হত; এছাড়া পুনরায় ফিরিঙ্গি রাজ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে গুলিবর্ষণের জন্য উন্মুক্ত পথ জরুরি বলে বিবেচনা করা হয়।

চিত্র 12.19
1848 খ্রি. চার্লস ডিওলী অঙ্কিত কলকাতা, গভর্মেন্ট হাউসের চিত্র।
লর্ড ওয়েলেসলীর দ্বারা নির্মিত গভর্মেন্ট হাউসকে যা গভর্নর জেনারেলের বাসভবন ছিল, ব্রিটিশ রাজত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়।

চিত্র 12.20
কলকাতার চিৎপুর রোডমুখী একটি বাজারের চিত্র।
শহরের স্থানীয় জনগণের কাছে বাজার চিত্র ব্যবসায়িক ও সামাজিক আদান প্রদানের স্থান। বাজার এলাকা ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করলেও তারা জনবসতিপূর্ণ এ অঞ্চলের অপরিচ্ছন্নতাকে অপছন্দ করতেন।

উৎস 4

"অবাঞ্ছিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিনিষেধ"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থায়ী সার্বজনীন বিধি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেন। এমনকি ব্যক্তিগত দালান বা জনগণের চলাচলের উপযোগী রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক মানসম্পন্ন বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসৃত হওয়া উচিত। কলকাতা সম্পর্কিত প্রশাসনিক আদেশে (1803) ওয়েলেসলী ব্যক্ত করেন :

> বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ দূর করার উদ্দেশ্যে, বাসগৃহ বা অন্যান্য সরকারি গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়মনীতি নির্ধারণ করে, রাস্তা, নর্দমা, জল পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুসংগঠিত নিয়ম অবলম্বন করে এই শহরের নাগরিকদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

বলে মনে করা হত। 1803 খ্রি. ওয়েলেসলী নগর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক মিনিট (প্রশাসনিক আদেশ) জারি করেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করেন। বহু বাজার, ঘাট, সমাধিস্থল এবং চামড়ার কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয় বা স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় থেকে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই ধারণা প্রচারিত হয়।

ওয়েলেসলী কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার পর সরকারের সাহায্য নিয়ে নগর পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করে লটারি কমিটি (1817), শহরের উন্নয়নের জন্য অর্থ জনসাধারণ থেকে লটারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হত বলে এই কমিটির নাম হয় লটারি কমিটি। অন্যভাবে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোকে নগর উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণভাবে জনসচেতন নাগরিকদের দায়িত্ব বলে মনে করা হত, তা কেবলমাত্র সরকারের দায়িত্ব বলে মনে করা হত না। লটারি কমিটি শহরের একটি নতুন নক্শা তৈরি করে যাতে কলকাতা শহরের একটি সর্বাঙ্গীন চিত্র পাওয়া যায়। কমিটির প্রধান কাজগুলোর মধ্যে হল নগরীর ভারতীয় অংশে সড়ক নির্মাণ এবং নদী তীরবর্তী স্থানগুলোকে দখল মুক্ত করা। কলকাতার ভারতীয় অঞ্চলগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে কমিটি অনেক ঝুপড়ি সরিয়ে ফেলে এবং শ্রমজীবি দরিদ্রদের গৃহহীন করে, যারা শেষ পর্যন্ত কলকাতার উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী দশকগুলোতে মহামারির আশঙ্কায় সরকার নগর পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। 1817 সাল থেকে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং 1896 সালে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সব রোগের কারণ এখনো স্পষ্টভাবে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে সময়ে ধারণা করা হত যে, জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে রোগের সরাসরি সম্পর্ক ছিল - এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রুস্তমজী কাওয়াজীও এই অভিমত সমর্থন করেন। তারাও উপলব্ধি

করেন যে, কলকাতাকে আরো পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তুলতে হবে। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাতে সূর্যের আলো ও বাতাস চলাচল করতে পারে না বলে এই সমস্ত এলাকা অস্বাস্থ্যকর বলে পরিগণিত হয়। শ্রমিক শ্রেণির কুঁড়েঘর ও বস্তি ভেঙে এলাকা উন্মুক্ত করার নীতি গৃহীত হয়। নগরের গরিব শ্রেণির লোক - শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, কারিগর, কুলি এবং বেকার শ্রেণি পুনরায় দূরপ্রান্তে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের প্রতিকার হিসাবেও নির্মাণ কার্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় — উদাহরণস্বরূপ 1836 খ্রি. খড় বা বাঁশের ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং টালির চাঁদ নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতা নগরীতে সরকারি বিধিনিষেধ আরো কঠোর করা হয়। নগর পরিকল্পনা তখন নাগরিক এবং সরকারের যৌথ দায়িত্ব হিসাবে পরিগণিত হত না, পরিবর্তে আর্থিক দায়িত্ব সহ নগর পরিকল্পনার সমস্ত উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছিল। এই সুযোগে (এর ফলে) আরো যথেষ্ট সংখ্যক কুঁড়েঘর বিনষ্ট করা হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে শহরের ব্রিটিশ অধ্যুষিত এলাকার বিকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। হোয়াইট টাউন (White Town) এবং ব্ল্যাক টাউন (Black Town) বিদ্যমান (জাতিগত) বিভাজনটি যথাক্রমে স্বাস্থ্যকর ও অ-স্বাস্থ্যকর অঞ্চল হিসাবে পরিচিত হয়। শহরের ইউরোপীয় অংশের উন্নতির দিকে অনৈতিক পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে মিউনিসিপলিটির ভারতের প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করেন। সরকারি নীতির বিরুদ্ধে গণ প্রতিবাদ উপনিবেশিকতা বিরোধী নীতিকে দৃঢ় করে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে ব্রিটিশরা কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মতো শহরগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। নগরীগুলোর জাকজমকতার মধ্যে দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। যে সমস্ত

➲ ওয়েলেসলী সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে কি বলেছেন? এই অংশটি পড় এবং আলোচনা কর যে, এই ধারণাগুলো বাস্তবায়িত হলে, এই শহরে বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর কী প্রভাব পড়ত?

বস্তি (বাংলা এবং হিন্দিতে) শব্দের অর্থ আশেপাশের এলাকা বা বসতি। ব্রিটিশরা এই শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ গরিব লোকদের কুঁড়েঘর হিসাবে ব্যবহার করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ব্রিটিশদের নথিতে বস্তি এবং অস্বাস্থ্যকরণ এলাকাকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

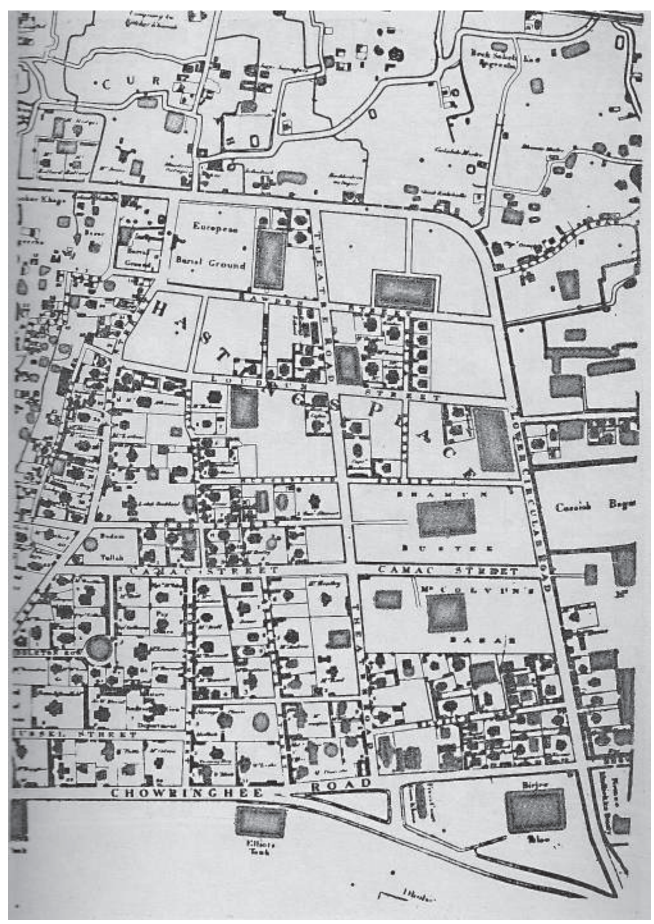

চিত্র 12.21
1825-J.A. Schalch দ্বারা নির্মিত একটি নক্শা — লটারি কমিটি দ্বারা গৃহিত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের পর নগরীর ইউরোপীয় অধ্যুষিত এলাকার একটি অংশ।
এখানে তোমরা বিশাল প্রাঙ্গনে ইউরোপীয়দের বাসগৃহে দেখতে পাবে।

চিত্র 12.22
কলকাতার একটি বস্তি এলাকা

বিষয়ে ব্রিটিশরা কৃতিত্বের দাবি করে, সেইগুলো হল যেমন যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ম কানুন, নির্ভুলকার্য নির্বাহী, প্রাশ্চাত্য দেশীয় সৌন্দর্যপ্রিয়তা প্রভৃতি তারা নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে উদ্যোগী হয়। শহরগুলোকে পরিকল্পিত, সুসংহত, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে গড়ে তোলা হয়।

4.3 বোম্বে নগরীর নির্মাণ কৌশল

সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্ন পূরণ করার একটি মাধ্যম যদি হয়, নগর পরিকল্পনা, তবে অন্য একটি মাধ্যম ছিল বিশালাকায় অট্টালিকা স্থাপন। নগরের নির্মিত অট্টালিকার মধ্য ছিল দুর্গ, সরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মস্থান, মূর্তিসৌধ, বাণিজ্যিক পণ্য মজুত ভাণ্ডার, নৌবন্দর ও সেতু। যদিও এই সকল ইমারত সুরক্ষা প্রশাসন ও বাণিজ্যের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু এইগুলো সাধারণ ইমারতের মতো ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা, ইংরেজ জাতি সত্ত্বা ও ধর্মীয় গৌরবের প্রতিফলন ঘটানো ছিল এই সৌধগুলোর উদ্দেশ্য। এখন আমরা দেখব যে, বোম্বে নগরীর ক্ষেত্রে কীভাবে তার অনুকরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় সাতটি দ্বীপের সমন্বয়ে বোম্বে নগরী গড়ে ওঠে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানাভাব দূর করার জন্য দ্বীপগুলোকে সংযুক্ত করে একটি বৃহত্তম নগরী গড়ে তোলা হয়। উপনিবেশিক ভারতে বাণিজ্যিক রাজধানী ছিল বোম্বে। পশ্চিম ভারতের মুখ্য বন্দর হিসাবে বোম্বে ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতবর্ষের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের অর্ধেক বাণিজ্য পরিচালিত হত বোম্বে নগরীর মাধ্যমে। আফিং ছিল একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য, যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিন দেশে রপ্তানি করত। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দালালরা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয় এবং আফিম সরবরাহ করে। তারা আফিম উৎপাদনকারী রাজ্য মালক, রাজস্থান এবং সিন্ধুপ্রদেশ থেকে আফিম সরবরাহ করার মাধ্যমে বোম্বের অর্থনীতির সঙ্গে এই সমস্ত অঞ্চলের অর্থনীতিকে এক সুতোয় গেঁথেছিলেন। কোম্পানির সাথে সহযোগিতা ভারতীয়দের পক্ষে লাভজনক ছিল। এর ফলে ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এই পুঁজিপতিরা ছিলেন পার্সি, মারোয়ারি, কঙ্কনি, মুসলিম, গুজরাটী, বানিয়া, বোহরা, ইহুদী এবং আর্মেনিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত।

আমরা দশম অধ্যায়ে লক্ষ করেছি 1861 খ্রি. আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে আসা তুলোর যোগান বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে মূলত দাক্ষিণাত্যে জন্মানো ভারতীয় তুলার চাহিদা বেড়েছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও দালালরা পুনরায় প্রচুর মুনাফা লাভের সুযোগ পায়। 1869 খ্রি. সুয়েজ খাল খুলে যাওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বোম্বের যোগসূত্র দৃঢ়তর হয়। বোম্বে সরকার এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে বোম্বেকে (*Urbs Prima in Indis*)

(ল্যাটিন ভাষায়) ভারতবর্ষের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নগর বলে ঘোষণা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বোম্বেতে বস্ত্রশিল্পের মতো নতুন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। তারা নগরীর নির্মাণ শিল্পেও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বোম্বের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে রেলপথ সম্প্রসারণ, নৌ পরিবহণ এবং প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সময়ে বহু নতুন ইমারত/ভবন নির্মিত হয়। মূলত ইউরোপীয় ধারার এইসব স্থাপত্যে শাসকশ্রেণির সংস্কৃতিও প্রত্যয় প্রতিফলিত হয়। এইসব ইমারতের স্থাপত্যশৈলী সাধারণত ইউরোপীয় ছিল। ইউরোপীয় ধারার আমদানিকরণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছা/স্বপ্ন নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রথমত, এর মাধ্যমে ঔপনিবেশে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা বিদেশে পরিচিত পরিবেশ গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন তা প্রকাশ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশদের বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপীয় স্থাপত্যের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রকাশ হবে। তৃতীয়ত, তারা বিশ্বাস করত ইউরোপীয় শৈলীতে তৈরি ইমারতগুলো ঔপনিবেশিক শাসক ও ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য ও দূরত্ব চিহ্নিত করবে।

প্রথমাবস্থায় এই স্থাপত্যগুলোকে চিরাচরিত ভারতীয় স্থাপত্যের পাশে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হলেও, ক্রমে ভারতীয়রাও ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিকে আয়ত্ত করে। অন্যদিকে ব্রিটিশরা ও প্রয়োজনের তাগিদে, কিছু ভারতীয় স্থাপত্য রীতি গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে বোম্বে ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি আধিকারিকদের ব্যবহৃত বাংলো (bungalow)-এর উদাহরণ দেওয়া যায়। বাংলো শব্দটি বাঙ্গালীদের চিরাচরিত কুড়েঁঘর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ঔপনিবেশিক বাংলোগুলো নির্মিত হত প্রশস্থ জমির মাঝখানে, যার উদ্দেশ্য ছিল একান্ত গোপনীয়তা এবং চারপাশের ভারতীয় সমাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। চিরাচরিত ধরনের নির্মিত ছাঁদ এবং সংলগ্ন বারান্দা গ্রীষ্মের মাসগুলোতে বাংলোকে শীতল রাখত। প্রশস্থ জমিতে গৃহ পরিচালক ও অন্যান্য কর্মীদের আবাস নির্মিত হত। সিভিল লাইনে অবস্থিত এই বাংলোগুলো জাতিগতভাবে পৃথক এলাকায় পরিণত হয় যেখানে ভারতীয়দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা না করে শাসকশ্রেণি স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারতেন।

চিত্র 12.23
ঊনবিংশ শতাব্দীর, বোম্বের একটি বাংলো

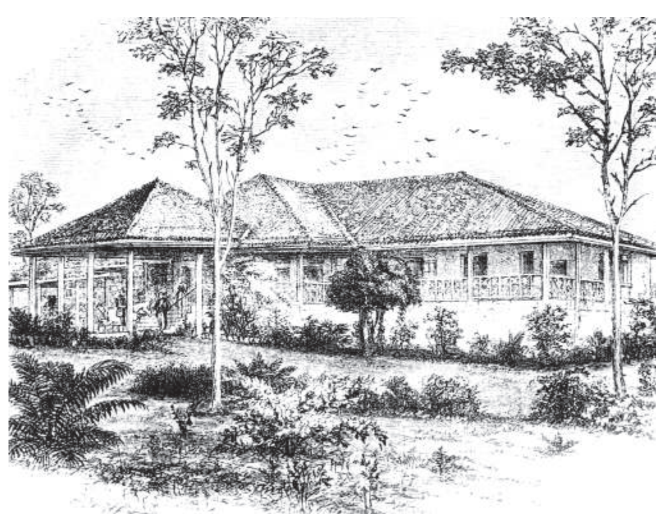

সরকারী ভবনগুলোর ক্ষেত্রে মূলত তিনটি ধারার স্থাপত্য শৈলী অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে দুটি ইংল্যান্ডে প্রচলিত গঠনশৈলী থেকে সরাসরি গ্রহণ করা হয়। প্রথমটিকে নব্য ক্ল্যাসিকেল বা নতুন ক্ল্যাসিক্যাল বলা হত। এর বৈশিষ্ট্য ছিঢ় সম্মুখভাগে সুউচ্চ থাম সমৃদ্ধ জ্যামিতিক

চিত্র 12.24
বোম্বের টাউনহল যেখানে বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বোম্বের সদর দপ্তর রয়েছে

Pitched শব্দটি স্থপতিরা ঢালু ছাদকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলোগুলোতে ঢালু ছাদের ব্যবহার কম হতে থাকে যদিও ভবন বা ইমারত তৈরির সাধারণ পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়নি।

কাঠামো। এটি প্রাচীন রোম হতে অনুসৃত স্থাপত্য আদর্শ ছিল এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময় তা এটিকে পুনরুজ্জীবিত সংশোধিত ও জনপ্রিয় করে তোলা হয়। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ধারাটিকে যথার্থ বলে মনে করা হত। ব্রিটিশ শাসকদের ধারণা ছিল যে, যে ধারা রোমান সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্বকে মূর্ত করে তুলেছিল, এখন তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব প্রকাশিত হবে। তাছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের এই স্থাপত্যরীতি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার উপযুক্ত হবে বলে মনে করা হয়। 1833 খ্রি. এই রীতি অনুসরণ করে বোম্বাইয়ের টাউন হল তৈরি করা হয় (চিত্র 12.24)। 1860-এর দশকে তুলো ব্যবসায় প্রাচুর্যের যুগে এলফিনস্টোন সার্কেল নামক আরেক শ্রেণির ব্যবসায়িক ভবন নির্মাণ করা হয়। ইটালিয় ধারার অনুসরণে গঠিত এই ভবন পরবর্তীকালে 'হ্যানিম্যান সার্কেল' নামে পরিচিত হয়। এর নামকরণ করা হয় হ্যানিম্যান নামে এক ইংরেজ সম্পাদকের নামে। যিনি সাহসিকতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেন। এই স্থাপত্যে আচ্ছাদিত তোরণকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, যা দোকানদার ও পথচারীদের বোম্বে নগরীর প্রচণ্ড সূর্যতাপ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

অন্য আরেকটি বহুল প্রচলিত স্থাপত্য রীতি ছিল নিওগথিক রীতি। এই রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল উঁচু ঢালু ছাদ, সরু তোরণ এবং বহুল সাজসজ্জা। মধ্যযুগীয় সময়ে উত্তর ইউরোপে নির্মিত ইমারতগুলোতে বিশেষত গীর্জাগুলোর মধ্যে গথিক রীতি প্রচলন লক্ষ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে এই নিও-গথিক বা নিউ গথিক শিল্পরীতি পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ শাসকরা বোম্বেতে শাসনব্যবস্থার পরিকাঠামো তৈরি করছিল এবং এক্ষেত্রে তারা নিওগথিক রীতি

চিত্র 12.25
এলফিনস্টোন পরিমণ্ডল থেকে গ্রিকো-রোমান স্থাপত্য শিল্পের প্রাপ্ত স্তম্ভগুলো বের করো।

গ্রহণ করে। এই রীতি অনুসরণ করে বোম্বেতে সমুদ্রমুখী কিছু অত্যন্ত সুন্দর অট্টালিকা যেমন - সচিবালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্ট নির্মিত হয়।

ভারতীয় কিছু ইমারত নির্মাণের জন্য অর্থদান করেছিল। স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গির রেডিমানি নামক একজন পার্সী ব্যবসায়ীর দান করা অর্থ দিয়ে ইউনিভারসিটি হল তৈরি হয়। একইভাবে ইউনির্ভাসিটি লাইব্রেরী ব্লক টাওয়ার নির্মাণের জন্য অর্থদান করেন ব্যাঙ্কার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এবং তার মায়ের নামে সৌধটির নামকরণ হয় রাজাবাঈ টাওয়ার। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা খুশি হয়ে নিওগথিক স্থাপত্যরীতি গ্রহণ করলেন, কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজদের আমদানি করা বিভিন্ন ভাবধারার মতো তাদের স্থাপত্যরীতিও ছিল আধুনিক এবং এই রীতি বোম্বেকে একটি আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিন সুলার রেলওয়ে কোম্পানি স্টেশান এবং প্রধান কার্যালয়, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল হল - নব্যগথিক রীতির সবচাইতে আকর্ষণীয় উদাহরণ। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তারের সাফল্যে গর্বিত ইংরেজরা শহরগুলোতে রেল স্টেশনের নক্সা তৈরি ও নির্মাণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে। নব্য গথিক রীতিতে নির্মিত মধ্য বোম্বের গগন চুম্বি এই সৌধগুলো বোম্বাই নগরীকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা প্রদান করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে এক নতুন দো-আঁশলী (hybrid) শিল্প রীতির সৃষ্টি হয়। এই রীতি ইন্দো-সারাসেনিয়

চিত্র 12.26
বোম্বের সচিবালয়, H. St Clair Wilkins দ্বারা নির্মিত নক্সা নির্মিতার নিকট থেকে 20 নভেম্বর 1875 খ্রি. প্রাপ্ত।

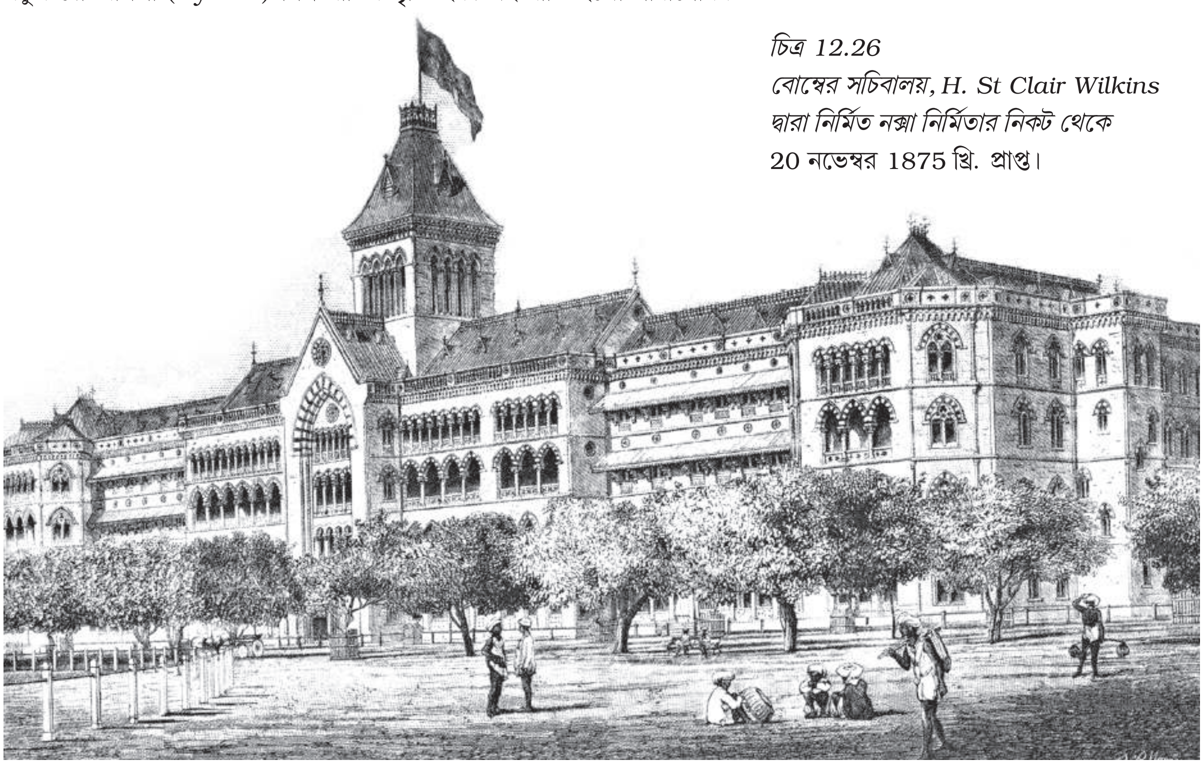

রীতি বলে পরিচিত হয়। ইন্দো-শব্দটি হিন্দু শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। আর সারসেন শব্দটি ইউরোপীয়রা মুসলমানদের বুঝতে ব্যবহার করতেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষের গম্বুজ, ছত্রি, জালি, তোরণ, সম্বলিত নির্মাণগুলো ছিল এই রীতিরই অনুপ্রেরণা। সরকারি ভবনগুলোতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ব্রিটিশরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তারা ভারতবর্ষের বৈধ শাসক 1911 খ্রি. রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গুজরাটী, ঐহিত্য অনুসরণে নির্মিত "গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া" এই রীতির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। শিল্পপতি জামসেদজী টাটা একই রীতি অনুসরণ করে তাজমহল হোটেল নির্মাণ করেন। এই হোটেল ভারতীয় উদ্যোগের চিহ্ন বহন করা ছাড়াও, এই হোটেলটি, ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত এবং শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য নির্মিত ক্লাব ও হোটেলের প্রতি ছিল এক চ্যালেঞ্জ।

চিত্র 12.27
F.W. Stevens-এর নক্সা অনুযায়ী নির্মিত ভিক্টোরিয়া টার্মিন্যাল রেলওয়ে স্টেশান।

বোম্বের ভারতীয় এলাকাতে চিরাচরিত ভারতীয় রীতির সাজসজ্জা এবং নির্মাণ বহাল থাকে। স্থানাভাব ও জনবাহুল্যের ফলে চওল (*chawl*) বলে বিশেষ এক ধরনের ইমারত বোম্বেতে গড়ে ওঠে। এই এক কক্ষবিশিষ্ট বহুতল আবাসগৃহগুলোর চারদিকে ছিল দীর্ঘ উন্মুক্ত বারান্দা বা করিডোর। এই আবাসগৃহগুলোতে একত্রে বহু পরিবারের বসবাসের ফলে পারস্পরিক পরিচিতি নৈকট্য ও সংহতি গড়ে ওঠে।

চিত্র 12.28
মাদ্রাজ আদালতটি গথিক
রীতির পুনরুজ্জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বোম্বে, মাদ্রাজে প্রসার লাভ করে ইন্দো-সারসেনিয় রীতি আদালত ভবনের নক্সা নির্মাণে পাঠান ও গথিক রীতির মিশ্রণ ঘটেছে।

5. সৌধ ও স্থাপত্য রীতিগুলো আমাদের কী বলে দেয়

স্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে একটি বিশেষ যুগের নান্দনিক রুচির পরিচয় এবং এই রুচির বিভিন্নতা প্রতিফলিত হয়। যেমন আমরা দেখেছি, ভবনগুলোতে তাদের নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে। সব জায়গাতেই শাসকরা ভবনগুলোর মাধ্যমে তাদের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময়ের স্থাপত্যশৈলী দ্বারা শাসকদের ক্ষমতা আয়ত্ত করার ধরন এবং নির্মাণ শৈলী ও তার বৈশিষ্ট্য যেমন - ইট, পাথর স্তম্ভ এবং তোরণ উঁচু গম্বুজ যা সুদৃশ্য ছাঁদ ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকদের ক্ষমতা প্রকাশের ধারা সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারি।

স্থাপত্যরীতি শুধুমাত্র সমসাময়িক রুচির পরিচায়ক নয়। এটি রুচিকে প্রভাবিত করে কোনো বিশেষ ধারাকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে। আমরা দেখেছি বহু ভারতীয় ইউরোপীয় স্থাপত্য ধারাকে আধুনিকতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন বলে গণ্য করে এই ধারাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সব ভারতীয়দের একরকম ধারণা ছিল না, অনেকে ইউরোপীয় ধারাকে বাতিল করে স্থানীয় রীতিকে বহাল রাখলে সচেষ্ট হয়েছেন, অন্য দল ইউরোপীয় যে, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে আধুনিক বলে মনে করেছেন, তা গ্রহণ করে স্থানীয় রীতির সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক ধারা হতে পৃথক আঞ্চলিক ও জাতীয় স্থাপত্যরীতি চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সুতরাং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ব্যাপক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্থাপত্যরীতি পরিবর্তিত ও উন্নত হয়েছে। স্থাপত্যরীতির মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন নানাভাবে সংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বুঝতে পারি, তেমনি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় ও আঞ্চলিক বা স্থানীয় ইত্যাদি রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বোঝা যায়।

চিত্র 12.29
বোম্বের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ভবন, যা 1818 খ্রি. F. W. Stevens-এর দ্বারা তৈরি। এখানে দেশীয় ও গথিক স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ লক্ষণীয়।

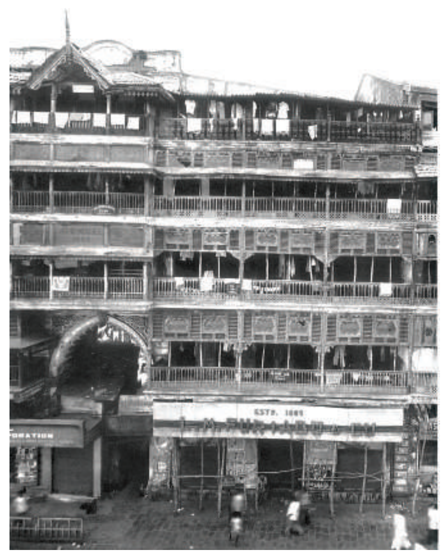

চিত্র 12.30
বোম্বে চওল (chawl)

➲ আলোচনা করো...

তোমার পছন্দ মতো একটি ঐতিহাসিক সৌধের বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ কর। একটি স্থাপত্য রীতি সম্পর্কে আলোচনা কর এবং কেন এই রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা অনুসন্ধান কর।

সময়পঞ্জি

1500-1700	ইউরোপীয় ব্যবসায়িক কোম্পানির ভারতবর্ষে ঘাটি স্থাপন। 1510 খ্রি. পানাজিতে পর্তুগিজরা, 1605 মসুলিপত্তমে ওলন্দাজরা, 1939 খ্রি. মাদ্রাজে, 1661 খ্রি. বোম্বেতে, 1690 খ্রি. কলকাতায় ব্রিটিশরা, 1673 খ্রি. পন্ডিচেরীতে ফরাসীরা তাদের ঘাটি স্থাপন করেন
1757	পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের চূড়ান্ত বিজয় ও বাংলায় শাসকের ভূমিকায়
1773	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করে
1784	স্যার উইলিয়াম জোন্স দ্বারা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা
1793	কর্ণওয়ালিস কোড প্রণয়ন
1803	কলকাতা শহরের উন্নতি বিষয়ক লর্ড ওয়েলেসলীর শাসন সংক্রান্ত ঘোষণা
1818	ব্রিটিশের দাক্ষিণাত্য দখল, বোম্বে নতুন প্রদেশের রাজধানী
1853	বোম্বে থেকে থানে পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন
1857	বোম্বেতে প্রথম বস্ত্র কারখানা স্থাপন
1857	বোম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
1870-এর দশক	মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ
1881	মাদ্রাজ বন্দরের নির্মাণ কার্যের সমাপ্তি
1896	বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে প্রথম চলচ্চিত্র প্রর্দশন
1896	প্রধান নগরীগুলোতে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব
1911	কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. ঔপনিবেশিক আমলে নগরায়ণের নিদর্শনগুলো পুর্নগঠন করতে (আদমসুমারী (census) থেকে প্রাপ্ত তথ্য কতটা কার্যকর হয়?
2. হোয়াইট টাউন ও ব্ল্যাক টাউন বলতে কী বোঝায়?
3. ঔপনিবেশিক শহরগুলোতে বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কীভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন?
4. প্রতিরক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি কলকাতা নগরী গঠনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছে তা আলোচনা কর।
5. বিভিন্ন ঔপনিবেশিক স্থাপত্য রীতির মধ্যে বোম্বেতে কোন্ ধরনের স্থাপত্য রীতি লক্ষ করা যায়?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. অষ্টাদশ শতাব্দীতে নগর কেন্দ্রগুলোতে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়?
7. ঔপনিবেশিক শহরগুলোতে গড়ে ওঠো নতুন ধরনের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলো কী ধরনের ছিল? এই গুলোর উদ্দেশ্য কী ছিল?
8. উনবিংশ শতাব্দীতে শহর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কী ধরনের ভাবনাচিন্তা প্রভাব বিস্তার করে?
9. নতুন নগরগুলোতে সামাজিক সম্পর্ক কতটা পরিবর্তিত হয়?

মানচিত্রের কাজ

10. ভারতের মানচিত্রে প্রধান নদী ও পাহাড়গুলোকে চিহ্নিত কর। বম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজসহ এই অধ্যায়ে উল্লেখিত দশটি নগরীকে চিহ্নিত কর এবং এদের মধ্যে যে-কোনো দুটি নগরের গুরুত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে কেন পরিবর্তিত হয়ে গেল সে সম্পর্কে টীকা লেখো। (একটি ঔপনিবেশিক ও একটি প্রাক্ ঔপনিবেশিক নগর)

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

11. তোমরা এই অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক নগর সম্বন্ধে পড়েছ। দীর্ঘ ইতিহাস সম্বলিত একটি ছোটো শহরের উল্লেখ কর। মন্দির শহর, বাজার শহর, প্রশাসনিক কেন্দ্র, তীর্থস্থান অথবা এইসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত যে-কোনো শহর হতে পারে। শহরটি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নীত হয় এবং আধুনিক যুগে কীভাবে এটির ইতিহাস পরিবর্তিত হয়, তা আলোচনা কর।
12. তোমার শহরের অথবা গ্রামের পাঁচটি আলাদা ধরনের ভবনের উল্লেখ কর। প্রত্যেকটি কবে নির্মিত হয় এবং কীভাবে পরিকল্পিত হয়, নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কীভাবে জোগাড় করা হয়? নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে কত সময় লাগে তা উল্লেখ কর। ভবনগুলো স্থাপত্যরীতির মাধ্যমে কী প্রতিফলিত হয়?

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Sabyasachi Bhattacharya. 1990. *Adhunik Bharat Ka Aarthik Itihas*. Rajkamal Prakashan, Delhi.

Norma Evenson. 1989. *The Indian Metropolis: A View Toward the West*. Oxford University Press, Delhi.

Narayani Gupta. 1981. *Delhi between Two Empires 1803-1931.* Oxford University Press, Delhi.

Gavin Hambly and Burton Stein. "Towns and Cities", in Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib edited, *The Cambridge Economic History of India*, (Volume I), 1984. Orient Longman and Cambridge University Press, Delhi.

Anthony King. 1976. *Colonial Urban Development: Culture, Social Power and Environment* Routledge and Kegan Paul, London.

Thomas R. Metcalf. 1989. *An Imperial Vision: Indian Architecture and Britain's Raj* Faber and Faber, London.

Lewis Mumford. 1961. *The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects*. Secker and Warburg, London.

বিষয়বস্তু
তেরো

মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে প্রায়শই একজন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্র নির্মাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন-উদাহরণস্বরূপ, ইটালি রাষ্ট্র গঠনের সাথে গ্যারিবল্ডীকে, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জর্জ ওয়াশিংটনকে এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভিয়েতনামকে মুক্ত করা সংগ্রামের সাথে হো-চি-মিন এর নাম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একইভাবে মহাত্মা গান্ধিকে ভারতীয় 'জাতির জনক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেওয়া সমস্ত নেতাদের মধ্যে গান্ধিজি সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাই তাঁকে দেওয়া উপাধিটি যথার্থই হয়েছে। ওয়াশিংটন বা হো-চি-মিনের মতো, গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবন গঠনের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাস যেমন মহান ব্যক্তি তৈরি করে তেমনি মহান ব্যক্তিরাও ইতিহাস তৈরি করে।

এই অধ্যায়ে 1915-1948 খ্রি. এর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতে গান্ধিজির ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা হবে। এখানে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সাথে গান্ধিজির যোগাযোগ এবং তাঁর প্রেরণা ও নেতৃত্বে গঠিত গণ সংগ্রামের প্রতি আলোকপাত করবে। একজন নেতার জীবন ইতিহাস এবং যে সমস্ত সামাজিক আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত তার পুনর্মূল্যায়নের জন্য ঐতিহাসিকরা যে সমস্ত উপাদানের উপর নির্ভর করেন সেগুলোর সাথে ছাত্রদের পরিচিতি করানোই ছিল এর উদ্দেশ্য।

চিত্র 13.1
1930 খ্রি. মার্চ মাসে লবণ অভিযান শুরু করার পূর্বে সবরমতী নদীর তীরে নিজের আশ্রমে সমবেত সমর্থকদের সঙ্গো আলোচনারত মহাত্মা গান্ধি।

1. নেতার আগমন বার্তা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি বিদেশে দুদশক থাকার পর 1915 খ্রি. জানুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বছরগুলোর বেশিরভাগ সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটান যেখানে তিনি আইনজীবি হিসাবে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে সেখানকার ভারতীয় সমাজকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। যেমন ঐতিহাসিক চন্দ্রন সেবানসান মন্তব্য করেন দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল মহাত্মার আঁতুরঘর। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই প্রথমে মহাত্মা গান্ধি সত্যাগ্রহ নামক অহিংস প্রতিবাদ নীতি প্রয়োগ করেন, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি বার্তা প্রচার করেন এবং উচ্চবর্ণের ভারতীয়দের নিম্নবর্ণ ও মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

1893 খ্রি. মহাত্মা গান্ধি যে ভারতবর্ষ ছেড়ে বিদেশে যান এবং 1915 খ্রি. তিনি যে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। যদিও তখনও দেশ ব্রিটিশদের উপনিবেশ। তবে রাজনৈতিকভাবে এটি এখন অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। ইতোমধ্যে ভারতের বেশির ভাগ প্রধান নগর ও শহরে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হয়। 1905-07 খ্রি. স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তাঁর আবেদন বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল - এই আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু প্রধান নেতার উদ্ভব হয় যেমন- মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এরা তিনজন 'লাল-বাল-পাল' নামে পরিচিত ছিল, এরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসী হলেও এদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পায়। এই নেতারা যেখানে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সক্রিয় বিরোধিতার পক্ষে ছিল সেখানে 'নরমপন্থীদের' একটি গোষ্ঠী যারা আরো ধীরে ধীরে এবং আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল। এই নরমপন্থীদের মধ্যে গান্ধিজির রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের সাথে মহম্মদ আলি জিন্নাহও ছিলেন যিনি গান্ধিজির মতো লণ্ডনে প্রশিক্ষিত গুজরাটী আইনজীবী ছিলেন।

চিত্র 13.2
দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে মহাত্মা গান্ধি, ফেব্রুয়ারী 1908

গোখলের পরামর্শ অনুসারে এদেশ এবং এখানকার জনগণকে জানার জন্য গান্ধিজি একবছর সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। 1916 খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনের সময় গান্ধিজি প্রথম জনসমক্ষে আসে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে রাজন্য এবং সমাজসেবীবর্গ ছিলেন যাদের

অবদানে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যানি বেসান্তের মতো কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী ও উপস্থিত ছিলেন। এই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে গান্ধিজি তুলনামূলক অপরিচিত ছিল। ভারতের অভ্যন্তরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের জন্য নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

গান্ধিজি তাঁর ভাষণে তিনি দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি উদাসীন মনোভাবের দরুন ভারতের উচচ শ্রেণির জনগণকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 'নিশ্চয় একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান'। তবে তিনি উপস্থিত 'ধনরত্নে ভূষিত অতিথিদের' সঙ্গে এখানে অনুপস্থিত 'লক্ষ লক্ষ দরিদ্র' ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গান্ধিজি বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা যদি এ সমস্ত মূল্যবান অলংকার পরিত্যাগ করে দেশবাসীর প্রয়োজনে এগুলো দান করতে পারেন তাহলেই ভারতের মুক্তি সম্ভব।" "ভারতীয় কৃষক শ্রেণির পরিশ্রমের ফসল অধিকাংশ যদি আমরা নিজেরা ভোগ করি অথবা অন্যের ভোগের জন্য তুলে দেই, স্বশাসন আমরা কোনোদিনই লাভ করতে পারব না। এদেশের মুক্তি সম্ভব একমাত্র কৃষকদের মাধ্যমেই। আইনজীবী, ডাক্তার অথবা ধনী জমিদারেরা দেশের মুক্তি এনে দিতে পারবে না।

ভারতীয়দের অর্থ ও উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয়তাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় বলে চিহ্নিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল একটি উদ্দীপনাময় ঘটনা। কিন্তু গান্ধিজির ভাষণে আত্মতৃপ্তির সুর ধ্বনিত হয়নি। অপরপক্ষে ভারতীয় জনগণের অধিকাংশ যে শ্রমজীবি ও কৃষিজীবি শ্রেণি, অনুষ্ঠানে তাদের অনুপস্থিতির প্রতি তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের সচেতন করেছেন।

চিত্র 13.3
করাচিতে মহাত্মা গান্ধি 1916 খ্রি. মার্চ মাসে

1916 খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে বেনারসে গান্ধিজি প্রদত্ত ভাষণ এই সত্যকেই তুলে ধরে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণির ভাবনার প্রকাশ, আইনজীবি চিকিৎসক এবং জমিদার শ্রেণির ভাবনার মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে সমগ্র ভারতবাসীর ভাবনাচিন্তাকে জাতীয়তাবাদের দোসর করার যে অভিপ্রায় গান্ধিজির মনে ছিল তা প্রথম এই ভাষণের মাধ্যমেই জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। এই

বছরের শেষে তার ধ্যান ধারণাকে কাজে পরিণত করার একটি সুযোগ গান্ধিজির সামনে উপস্থিত হয়। 1916 খ্রি. ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিহারের চম্পারণ থেকে একজন কৃষক গান্ধিজির মুখোমুখে হয়েছিলেন। যিনি ব্রিটিশ নীলকরদের দ্বারা কৃষকদের নিগৃহীত হবার কাহিনি গান্ধিজিকে বলেন।

➲ আলোচনা করো...

1915 খ্রি. পূর্বে ভারতে সংগঠিত জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আরো তথ্য অনুসন্ধান কর এবং গান্ধিজির মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

2. অসহযোগ আন্দোলন : শুরু এবং শেষ

মহাত্মা গান্ধি 1917 খ্রি. বেশিরভাগ সময় চম্পারণে অতিবাহিত করেন, কৃষকদের জন্য রায়তি স্বত্ব এবং নিজেদের পছন্দের ফসল চাষের অধিকার সুনিশ্চিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পরবর্তী বছর 1918-এ গান্ধিজি নিজ রাজ্য গুজরাটে দুটি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। প্রথমত তিনি বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের আরো ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করে আমেদাবাদে শ্রমিক সংক্রান্ত একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর তিনি খেদায় কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার দরুন সরকারকে কর মুকুবের জন্য আবেদন করেন।

চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেদাতে এই উদ্যোগগুলো গান্ধিজিকে দরিদ্রদের প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন জাতীয়তাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে। একই সময়ে এগুলো ছিল স্থানীয় সমস্যাকেন্দ্রিক আন্দোলন। তারপর 1919 খ্রি. ঔপনিবেশিক শাসকগণ এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাকে কেন্দ্র করে গান্ধিজি একটি বিস্তৃত আন্দোলন গড়ে তোলেন। 1914-18 বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা সংবাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং বিনা বিচারে কোনো ব্যক্তিকে বন্দী রাখার অধিকার প্রয়োগ করেন। স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশক্রমে এই কঠোর ব্যবস্থাগুলো অব্যাহত থাকে। গান্ধিজি রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের আহ্বান জানান। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের শহরগুলোতে আন্দোলনের ফলে দোকানপাট বন্ধ থাকে ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পাঞ্জাবে, বিশেষভাবে বিরোধ তীব্র হয়, সেখানকার বহু লোক যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করে এবং তার কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা করছিল। পরিবর্তে তাদের উপর রাওলাট আইন প্রয়োগ করা হয়। পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রাকালে গান্ধিজিকেও বাধা দেওয়া হয়, তার সাথে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদেরও আটক করা হয়। প্রদেশের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করে, 1919 খ্রি. এপ্রিল মাসে অমৃতসরে রক্তাক্ত পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে, যখন একজন ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার তার সৈন্যদের একটি জাতীয়তাবাদী সভায় গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এই ঘটনায় চারশ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল, যা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত।

রাওলাট সত্যাগ্রহই প্রকৃত অর্থে গান্ধিজিকে এক জাতীয় নেতায় পরিণত করে।

সত্যাগ্রহ সফল হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে গান্ধিজি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে ইচ্ছুক ভারতীয়দের কাছে স্কুল, কলেজ ও আদালত বর্জন করা এবং কর প্রদান না করার আবেদন জানানো হয়। সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের কাছে "ব্রিটিশ সরকারের সাথে সমস্ত প্রকার যোগাযোগ ছিন্ন করার আহ্বান জানানো হয়।" গান্ধিজি বলেন যদি অসহযোগকে সঠিকভাবে জারি রাখা যায় তাহলে এক বছরের মধ্যে ভারত স্বরাজ লাভ করতে সমর্থ হবে। সংগ্রামকে আরো বিস্তৃত করার জন্য তিনি খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি শাসক কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক বিলোপ করা খলিফা পদটি পুনর্প্রতিষ্ঠা, খলিফা ছিলেন মুসলমান জগতের প্রতীক স্বরূপ।

খিলাফত আন্দোলন কী ছিল?

মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় মুসলমানদের একটি আন্দোলন ছিল খিলাফল আন্দোলন (1919-1920)। এই আন্দোলনের নিম্নলিখিত দাবি ছিল - তুরস্কের সুলতানের জন্য পূর্ববর্তী অটোমান সাম্রাজ্যে অবস্থিত। মুসলমান ধর্মস্থান পরিচালনার অধিকার আদায় করা অথবা খলিফার নিয়ন্ত্রণ থাকা জাজিরাত-উল-আরব (আরব সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্তাইন) কে অবশ্যই মুসলিমদের সার্বভৌমত্বের দাবি করা; আর ইসলাম ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে খলিফার জন্য পর্যাপ্ত অধিকার দাবি করা। কংগ্রেস এই আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলনের সাথে ইহাকে সংযুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন।

2.1 একটি গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি

গান্ধিজি আশা করেছিলেন যে খিলাফতের সাথে অসহযোগকে একত্রিত করার মাধ্যমে ভারতের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে সমর্থ হবে। এই আন্দোলনে জনগণ যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে নজিরবিহীন।

ছাত্ররা সরকার চালিত স্কুল ও কলেজ বর্জন করে। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করে। বহু শহর ও নগরগুলোতে শ্রমিক শ্রেণি হরতাল শুরু করে : সরকারি তথ্য অনুযায়ী 1921-এ 396টি হরতাল হয় যেখানে 6 লক্ষ শ্রমিক শামিল ছিল এবং এতে 70 লক্ষ কর্মদিবস নষ্ট হয়। গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। উত্তর অন্ধ্রের পাহাড়ি উপজাতিরা বন আইন ভঙ্গ করে। অবধ (অযোধ্যা)-এর কৃষকরা ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের বোঝা বহন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এই ধরনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বহুক্ষেত্রে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়াও পরিচালিত হয়েছে। কৃষক শ্রমিক এবং অন্যান্যরা তাদের নিজেদের অবস্থানের সঙ্গে মানিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। উপর মহল থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনেক সময় তারা অগ্রাহ্য করেছে।

মহাত্মা গান্ধির আমেরিকান জীবনীকার লুই ফিসার লিখেছেন ভারতবর্ষের এবং গান্ধিজির জীবনে "অসহযোগ" একটি দিক চিহ্ন হয়ে রইল। অসহযোগ ছিল একদিকে শান্তিপূর্ণ কিন্তু অন্যদিকে ফলপ্রদ আন্দোলন, এর মাধ্যমে অস্বীকৃতি ত্যাগ ও নিয়মানুবর্তিতা প্রকাশিত হয়েছে। এটি ছিল প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। 1857 খ্রি. বিদ্রোহের পর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ শাসনের ভিত গড়ে ওঠে। তারপর 1922 খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে একদল কৃষক পুলিশ থানা আক্রমণ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে। (বর্তমানে

চিত্র 13.4
অসহযোগ আন্দোলন, জুলাই 1922
বহ্নি উৎসবে পোড়াতে বিদেশী কাপড় সংগ্রহ করা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলে) এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয়। এই সহিংস কাজের ফলেই গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, উত্তেজিত জনতার দ্বারা প্রতিরোধহীন এবং অসহায় ব্যক্তিদের নারকীয় হত্যা মেনে নেওয়া যায় না।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার ভারতীয়দের জেলে বন্দী করে রাখা হয়। গান্ধিজিকেও 1922 খ্রি. মার্চে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিচারকার্য চালানোর সময় প্রধান বিচারপতি C.N. Broomfield তার রায় ঘোষণার সময় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন, যে "এই বিষয়টি উপেক্ষা করা অসম্ভব, আমি আজ পর্যন্ত যাদের বিচার করেছি বা ভবিষ্যতে করব তাদের থেকে আপনি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এই তথ্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব যে আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টিতে আপনি একজন মহান দেশপ্রেমিক এবং নেতা। এমনকি রাজনীতিতে যারা আপনার থেকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর তারাও আপনাকে উচ্চ আদর্শধারী এমনকি সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপনকারী হিসেবে দেখে। যেহেতু গান্ধিজি আইন অমান্য করেছেন, তাই আদালত তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হয়। তবে বিচারক ব্রুমফিল্ড বলেছেন যদি ভারতবর্ষের ঘটনাপ্রবাহের ফলে কারাবাসের সময়সীমা হ্রাস করে সরকার আপনাকে মুক্তিদান করতে পারে, তাহলে আমার থেকে আনন্দিত আর কেউ হবে না।

2.2 একজন জননেতা

1922 খ্রি. মধ্যে গান্ধিজি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নতুন রূপ প্রদান করেন, এবং এভাবে 1916 খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ভাষণে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করেন। এটি কেবলমাত্র ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনই ছিল না; কয়েক হাজার কৃষক, শ্রমিক এবং কারিগররা এতে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে গান্ধিজিকে মহাত্মা সম্মান জানান। তারা এই বিষয়টির প্রশংসা করে যে, গান্ধিজি তাদের মতো পোষাক পড়েন, তাদের মতোই জীবনযাপন করে বেঁচেছিলেন এবং তাদের ভাষায় কথা বলতেন। অন্যান্য নেতাদের মতো তিনি সাধারণ লোকদের থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখেনি, বরং তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং নিজেকে তাদেরই একজন বলে পরিচয় দিতেন।

চিত্র 13.5
চরকার সহিত গান্ধিজির প্রতিমূর্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।
1921 খ্রি. দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করার সময় গান্ধিজি নিজের মস্তক মুণ্ডন করেন এবং গরিবদের সাথে নিজেকে একাত্ম করার জন্য একটি ধুতি পরিধান করতে শুরু করেন। তাঁর এই নতুন রূপ আধুনিক বিশ্বের ভোগবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে তপস্যা ও সংযমের প্রতীক হয়ে ওঠে।
উৎস 1

এই পরিচয়টি তার পোশাকে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। যেখানে অন্য জাতীয়তাবাদী নেতারা পশ্চিমী পোশাক অথবা ভারতীয় বন্ধগলা জাতীয় বস্ত্র পরিধান করত, সেখানে গান্ধিজি একটি সাধারণ ধুতি পরিধান করতেন। এছাড়া তিনি প্রতিদিনের কিছুটা সময় চরকায় সুতো কাটতে ব্যয় করতেন এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদেরও কাজ করতে উৎসাহী করতেন। মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রমের মধ্যে চিরাচরিত যে প্রাচীর ছিল, গান্ধিজি সুতা কাটার মাধ্যমে তা দূর করতে সচেস্ট হন।

স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও গুজবের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক শহীদ আমিন পূর্ব উত্তর প্রদেশের কৃষকদের হৃদয়ে গান্ধিজির যে স্থান ছিল, তা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেন এবং তার মনমুগ্ধকর বিবরণ দেন। 1921 খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে ওই এলাকা পরিভ্রমণকালে সর্বত্র জনতা গান্ধিজিকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা করে।

চরকা

বর্তমান যুগে যেখানে মানুষ যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছে এবং কায়িক শ্রমের অপসারণ ঘটেছে, মহাত্মা গান্ধি এর ঘোর সমালোচনা করেন। তিনি চরকাকে মানব সমাজে এমন এক প্রতীক রূপে দেখেন, যেখানে যন্ত্র এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না। চরকা গরিবদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তাদের স্ব-নির্ভর করে তুলবে।

> যন্ত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণের আমি বিরোধিতা করি। এই আকর্ষণ হল শ্রম সাশ্রয়ী যন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ। এই যন্ত্রপাতিগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রম সাশ্রয় করে চলবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে কাজের অভাবে এবং খাদ্যের অভাবে খোলা রাস্তায় মৃত্যুর জন্য ছুঁড়ে না ফেলা হবে। আমি কেবলমাত্র মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশের জন্যই নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য সময় এবং শ্রম বাঁচাতে চাই। আমি চাইছি সম্পদের কেন্দ্রীকরণ কেবলমাত্র সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই নয়, বরং সমাজের সকলের হাতেই থাকুক।
>
> ইয়ং ইন্ডিয়াতে 1924 খি. 13 নভেম্বরে প্রকাশিত

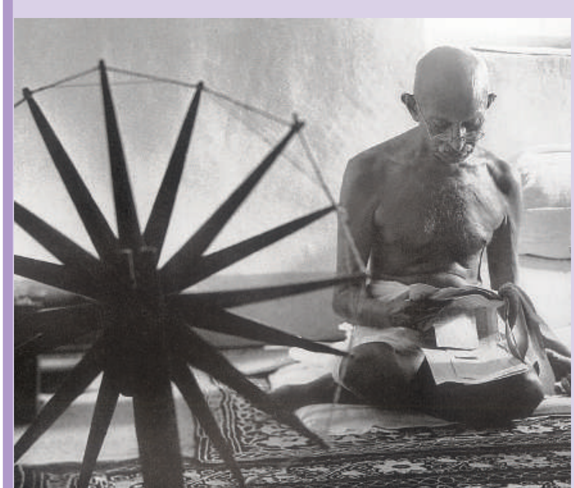
চিত্র 13.5

> খাদি বা খদ্দর যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় না, কিন্তু এটি যন্ত্রের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যথেচ্ছ বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। এর মাধ্যমে যন্ত্রকে গরিবদের কুঁড়েঘরে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। চরকার চাকা নিজেই একটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র।
>
> ইয়ং ইন্ডিয়াতে 1927 খি. 17 মার্চে প্রকাশিত

গান্ধিজির ভাষণের সময় যে পরিবেশ সৃষ্টি হত তা গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে :

> ভাটনিতে গান্ধিজি স্থানীয় জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং তারপরে ট্রেনটি গোরক্ষপুরের দিকে যাত্রা শুরু করে। নুনখার, দেওরিয়া, গৌরীবাজার, চৌরিচৌরা এবং কুসামি স্টেশনে 15,000 থেকে 20,000 লোকের কম ছিল না ... মহাত্মাজী কুসমি স্টেশনের দৃশ্য দেখে আপ্লুত হন, কারণ জঙ্গালের মাঝখানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই স্টেশনে 10,000 লোকের কম ছিল না। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে তাদের মধ্যে অনেককে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। দেওরিয়ার লোকেরা গান্ধিজিকে অনুদান দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তাদেরকে সে দান গোরক্ষপুরে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু চৌরিচৌরাতে এক মারওয়ারি ভদ্রলোক তার হাতে কিছু তুলে দিতে সক্ষম হন। তারপর ইহা আর থেমে থাকে নি। একটি চাদর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ইহাতে টাকা ও মুদ্রা বৃষ্টি শুরু হয়। এটি একটি দৃশ্য ছিল ... গোরক্ষপুর স্টেশনের বাইরে মহাত্মা একটি উঁচু গাড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন এবং লোকেরা কয়েক মিনিট ধরে ভালোভাবে তার দর্শন পায়।

গান্ধিজি যেখানেই গিয়েছিলেন তাঁর অলৌকিক শক্তির সেখানেই ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু স্থানে বলা হয়েছিল যে, তিনি কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য রাজা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন এবং সমস্ত স্থানীয় আধিকারিকদের উপর নজরদারি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। অন্যান্য জায়গায় দাবি করা হয়েছিল যে গান্ধিজির শক্তি ইংরেজ রাজাদের চেয়ে ক্ষমতাবান ছিল এবং তাঁর আগমনে ঔপনিবেশিক শাসকরা এই জেলা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মারাত্মক পরিণতির গল্পও ছড়িয়ে পড়েছে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে গান্ধিজির সমালোচনা করা গ্রামবাসীদের বাড়িঘর কীভাবে রহস্যজনকভাবে ভেঙ্গে পড়ে বা তাদের ফসল নষ্ট হয়।

'গান্ধিবাবা' 'গান্ধি মহারাজ' অথবা 'মহাত্মা' বই ভিন্ন ভিন্ন নামে খ্যাত, গান্ধিজি ভারতীয় কৃষকদের ত্রানকর্তারূপে আবির্ভূত হন, যিনি তাদেরকে উচ্চ কর ভার ও অত্যাচারী কর্মচারীদের নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করে তাদের জীবনে সম্মান ও স্বায়ত্ত শাসন ফিরিয়ে আনবেন। গান্ধিজির সংযমী জীবনযাত্রা, ধুতি ও চরকার মতো সাধারণ জিনিসের বিচক্ষণ ব্যবহারের ফলে গরিব জনগণ ও বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে গান্ধিজির আবেদন বৃদ্ধি পায়। শ্রেণিগতভাবে এক ব্যবসায়ী এবং পেশায় একজন আইনজীবী, তবে তাঁর সাধারণ জীবনযাত্রা এবং তার হাত দিয়ে

উৎস 2

গান্ধিজির অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ক্ষমতা

সংযুক্ত প্রদেশগুলোর স্থানীয় সংবাদপত্র গুলো সেই সময়ে প্রচলিত অনেক গুজব নথিভুক্ত করে। গুজব ছিল যে যারা মহাত্মার শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছেন এমন প্রতিটি ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন:

1. সাহু নামে বস্তির একজন গ্রামবাসী 15 ফেব্রুয়ারি বলেন যে, তিনি মহাত্মাজীকে তখন বিশ্বাস করবেন যখন তার কারখানায় আখের রসে পূর্ণ কড়াই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ কড়াই মাঝখান থেকে দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

2. আজমগড়ের এক কৃষক বলেছিলেন যে গম রোপণ করা তার জমিতে তিল অঙ্কুরিত হলে তিনি মহাত্মাজির সভ্যতায় বিশ্বাস করবেন। পরের দিন সেই জমির সমস্ত গম তিলে পরিণত হয়।

contd

উৎস 2 *(contd)*

গুজব ছিল যে, যারা মহাত্মা গান্ধির বিরোধিতা করেছিলেন, এরা কিছুটা দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হন।

1. গোরক্ষপুর শহরের এক ভদ্রলোক চরকা চালানোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার বাড়িতে আগুন লেগেছিল।

2. 1921 সালের এপ্রিল মাসে উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে কিছু লোক জুয়া খেলছিল। কেউ তাদের থামতে বলেছিল। গ্রুপের মধ্যে কেবল একজনই থামতে অস্বীকার করেছিল এবং গান্ধিজির উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে। পরের দিন, তার ছাগলটিকে তার নিজের চারটি কুকুর কামড়েছিল।

3. গোরক্ষপুরের একটি গ্রামে কৃষকরা মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিলেন। একজন ব্যক্তি তার প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। মদের দোকানে তার যাওয়ার পথে ইট বৃষ্টি শুরু হয়। যখনই তিনি গান্ধিজির নাম বলতে লাগলেন, তখন ইট পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

শহিদ আমিন "Gandhi as Mahatma" শবলটার্ণ স্টাডিজ *III*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লি।

➲ তোমরা 11 তম অধ্যায়ে গুজব সম্পর্কে পড়েছ এবং দেখেছ যে, একটা বিশেষ সময়ে রচিত হওয়া গুজব, সেই সময়কার জনবিশ্বাসকে তুলে ধরে। গুজবে যারা বিশ্বাস করে তাদের মানসিকতা এবং কোন্ ধরনের পারস্পরিক পরিস্থিতিতে এই বিশ্বাস সম্ভব হয়েছে, তাও অনুধাবন করা যায়। গান্ধিজি সম্পর্কে রচিত হওয়া গুজবগুলোতে কী প্রতিফলিত হয় বলে তুমি মনে কর।

কাজ করার ভালোবাসা শ্রমিজীবী গরীব মানুষের সঙ্গো একাত্ম করে তুলেছিল এবং তারাও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। যেখানে অন্যান্য বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ উচ্চাসনে থেকে তাদের সাথে কথা বলেছে, গান্ধিজি কেবল তাদের মতো পোশাক পরিচ্ছদে দেখতেই নয়, বরং তিনি তাদেরই লোক বোঝানোর চেস্টা করলেন এবং তাদের জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। গণ আবেদন ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে নজীরবিহীন হলেও একথা উপলব্ধি করা যায় যে, জাতীয়তাবাদের ভিতকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে তার সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল — সুগঠিত সংগঠন। ভারতের বিভিন্ন অংশে কংগ্রেসের নতুন শাখা তৈরি করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলোতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের জন্য একাধিক "প্রজামণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গান্ধিজি জাতীয়তাবাদীর বার্তা প্রচারের জন্য শাসকদের ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষা গ্রহণ করার উৎসাহ দিতেন। সুতরাং কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটিগুলো ব্রিটিশ ভারতের কৃত্রিম সীমারেখার ভিত্তিতে স্থাপিত না হয়ে, ভাষাগত অঞ্চলের ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে জাতীয়তাবাদকে দেশের সুদূঢ় প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যে সামাজিক দলগুলো এর থেকে অচ্ছুত ছিল, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যে এখন বেশ কয়েকজন সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি ছিলেন। ভারতীয় উদ্যোগপতিরা খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অবদান ঘটবে। জি.ডি.বিড়লার মতো উদ্যোক্তাগণ জাতীয় আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অপ্রকাশ্যে এভাবে গান্ধিজির সমর্থকদের মধ্যে, দরিদ্র কৃষক এবং ধনী শিল্পপতি উভয়ই ছিল। যদিও কৃষক ও শিল্পপতিরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে গান্ধিজিকে অনুসরণ করেছিল।

যদিও মহাত্মাগান্ধির নিজস্ব ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে গান্ধিজি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তাঁর অনুগামীদের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল। 1917 এবং 1922-এর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয়দের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের গান্ধিজির সাথে যুক্ত করেছিলেন। তাদের মধ্যে মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, জে.বি.কৃপালিনী, সুভাষ চন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং সি. রাজাগোপালাচারী ছিলেন উল্লেখ্য যে, গান্ধিজির এই ঘনিষ্ট সহযোগীরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসেন এবং তারা বিভিন্ন ধর্মের অনুগামী ছিলেন। তারা কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং এর জন্য কাজ করতে অগণিত অন্যান্য ভারতীয়দেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

মহাত্মাগান্ধি 1924 সালের ফেব্রুয়ারিতে কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং তারপর নিজের ঘরে তৈরি খাদির কাপড় এবং অস্পৃশ্যতা বিলোপের দিকে আত্ম

নিয়োগ করেন। রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা লাভের যোগ্য হওয়ার জন্য ভারতীয়দের বাল্যবিবাহ এবং অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী ভারতীয়দের মধ্যে অকৃত্রিম সহনশীলতা বোধ গড়ে তুলতে হবে। তাই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয়দের স্বাবলম্বী হতে শিখতে হবে। তাই বিদেশ থেকে আমদানি করা মিলের তৈরি কাপড়ের পরিবর্তে খাদি বস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

➲ আলোচনা করো...

অসহযোগ আন্দোলন কী ছিল? বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন উপায়ে যেভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তা আলোচনা কর।

৩. লবণ সত্যাগ্রহ একটি পর্যালোচনা

অসহযোগ আন্দোলন শেষ হওয়ার পরে বেশ কয়েক বছর ধরে, মহাত্মাগান্ধি সমাজ সংস্কার মূলক কাজের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে 1928 খ্রি. তিনি আবার রাজনীতিতে প্রবেশের কথা ভাবতে শুরু করেন। সেই বছর উপনিবেশের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রেরিত শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সদস্য সমন্বিত সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করে সারা দেশে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। গান্ধিজি যদিও নিজে এই আন্দোলনে অংশ নেননি, তবে আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন ছিল। একই বৎসরে বারদোলিতে গড়ে ওঠা কৃষক সত্যাগ্রহের প্রতিও তার সমর্থন ছিল।

1929 খ্রি. ডিসেম্বরে শেষভাগে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন দুটি দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সভাপতি হিসেবে জওহরলাল নেহরুকে নির্বাচন তরুণ প্রজন্মের কাছে নেতৃত্বের পালাবদলের ইঙ্গিত দেয় এবং "পূর্ণ স্বরাজ" ঘোষণা করা হয়। রাজনীতির আবারও একবার জোয়ার আসে। 1930 খ্রি. 26 ফ্রেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং দেশাত্মবোধক গান গেয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। কীভাবে এই দিনটি পালন করা উচিত সে সম্পর্কে গান্ধিজি নিজেই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেন। তিনি বলেছিলেন, "যদি সমস্ত গ্রাম, সমস্ত শহরে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়, তবে অত্যন্ত ভালো হয় — আরোও ভালো হয়, যদি সমস্ত জায়গায় একই সময়ে সভার আয়োজন করা হয়।"

গান্ধিজি বলেন, চিরাচরিত প্রথায় ঢোল বাজিয়ে সভার খবর প্রচার করা যায়। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদযাপন শুরু করা হবে। দিনের বাকি সময়, কোনো গঠনমূলক কাজ, যেমন-সুতা কাঁটা, অস্পৃশ্যদের সেবা, হিন্দু মুসলমানের মিলন, মদ্যপান নিবারণ সংক্রান্ত কাজ বা একসঙ্গো এসমস্ত কিছুর মাধ্যমে ব্যয় করা হবে। এ সমস্ত কারণে অংশগ্রহণকারীরা এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করবে যে, অন্য যে-কোনো জাতির মতো স্বাধীনতা ও নিজেদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা ভারতীয়দের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। যদি কোনো সরকার জনগণকে এই সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের নিষ্পেষণ করে, তবে সেই সরকারের পরিবর্তন বা অবলুপ্তি ঘটানোর অধিকার জনগণের আছে।

3.1 ডান্ডি

"স্বাধীনতা দিবস" উদ্‌যাপনের পর খুব শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধি ঘোষণা করেন যে, তিনি ব্রিটিশ ভারতে সবচেয়ে বেশি অপছন্দের লবণ আইন ভঙ্গ করতে একটি পদযাত্রার নেতৃত্ব দিবেন। যে আইনের দ্বারা লবণ উৎপাদন তথা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশদের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে গান্ধিজির রণকৌশলগত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের জন্য, লবণ এক অপরিহার্য বস্তু। তবুও লোকেরা এমনকি ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য লবণ তৈরি করতে পারত না। তারা উচ্চমূল্যে দোকান থেকে লবণ ক্রয় করতে বাধ্য হত। লবণের উপর ব্রিটিশদের একাধিপত্য জনসাধারণের একেবারে অপছন্দ ছিল। আর একেই লক্ষ করে গান্ধিজি, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার প্রত্যাশা করেছিলেন।

অধিকাংশ ভারতীয়রা গান্ধিজির এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা তা অনুধাবন করতে পারেনি। যদিও গান্ধিজি তার লবণ অভিযান তথা 'ডান্ডি অভিযান'-এর সম্পর্কে অগ্রিম সূচনা ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে দিয়েছিলেন। তবে

চিত্র 13.6
1930 সালের মার্চ মাসে ডান্ডি অভিযান।

আরউইন বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। 1930 খ্রিস্টাব্দের 12 মার্চ গান্ধিজি সবরমতীস্থিত নিজ আশ্রম থেকে সমুদ্র অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। তিন সপ্তাহের পর তিনি গন্তব্যস্থলে পৌঁছান। সেখানে তিনি এক মুষ্টি লবণ তৈরি করে নিজেকে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী প্রতিপন্ন করেন। ইতোমধ্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে অভিযান সংঘটিত হয়।

চিত্র 13.7
1930 খ্রিস্টাব্দের 6 এপ্রিল, ডাণ্ডি অভিযানের শেষে সত্যাগ্রহীরা সমুদ্রের তীর হতে লবণ সংগ্রহ করছেন।

উৎস 3

লবণ সত্যাগ্রহ কেন করা হয়েছিল?

লবণ কেন প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধি লিখেছেন :

প্রতিদিন প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, কীভাবে অন্যায় পূর্বক লবণ করের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিনা শুল্কের লবণের (যার মূল্য কোনো কোনো সময় তার মূল্যের চোদ্দো গুণ বেশি হত) ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সরকার লাভজনক মূল্যে বিক্রি না করতে পেরে, সেই লবণ নষ্ট করে দিত। এভাবে এটি রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কর আরোপ করে। জনসাধারণকে তা তৈরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং কোনো ধরনের প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রাকৃতিকভাবে তৈরি লবণকে ধ্বংস করে। সরকারের এই অনিষ্টকারী নীতির সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি ভারতের সমস্ত অঞ্চলে এই জাতীয় সম্পত্তি স্বেচ্ছামূলকভাবে ধ্বংসের কথা শুনতে পাই। কঙ্কণ উপকূলে এক টন পরিমাণ না হলেও, কয়েক মন লবণ নষ্ট করা হয়েছে বলে জানা যায়। ডাণ্ডি থেকেও একই প্রকার খবর পাওয়া যায়। যে সমস্ত জায়গায় প্রাকৃতিক লবণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করার সম্ভাবনা আছে, সেইসব স্থানে কেবলমাত্র লবণ বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে লবণ আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হয়। এভাবে জাতীয় অর্থে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হয় এবং জনগণের কাছ থেকে লবণ ছিনিয়ে আনা হয়।

এভাবে লবণের উপর একচেটিয়া অধিকার চতুর্মুখী অভিশাপ নিয়ে আসে। একটি সহজ অথচ মূল্যবান গ্রামীণ শিল্প থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হয়। প্রকৃতির অঢেল সম্পদকে নির্বিচারে বিনষ্ট করা হয়। এই বিনষ্ট কার্য সম্পাদিত হয় জাতীয় অর্থে এবং সর্বোপরি একজন অনাহারী ভারতবাসীর উপর এক হাজার শতাংশেরও অধিক অজ্ঞাত রাজস্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণত জনগণের উদাসীনতার কারণে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই রাজস্ব আদায় কার্য চলতে থাকে। এখন জনগণ সজাগ হয়েছে। সুতরাং, এই কর উঠিয়ে দিতে হবে। জনগণের শক্তির উপরই নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি লবণ কর বিলোপ হবে।

দ্যা কালেক্টেড ওয়ার্কর্স অফ মহাত্মাগান্ধি (CWMG), 49 তম খণ্ড

➲ ঔপনিবেশিক সরকার কেন লবণ ধ্বংস করতো? অন্যান্য করের তুলনায় লবণ করকে মহাত্মা গান্ধি কেন অধিক শোষণকারী বলে মনে করতেন?

উৎস *4*

"আগামীকাল আমরা লবণ আইন ভঙ্গা করবো"

1930 খ্রিস্টাব্দের 5 এপ্রিল, মহাত্মাগান্ধি ডান্ডিতে বলেন :

যখন আমি আমার সঙ্গীদের সাথে সবরমতী ত্যাগ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী ডান্ডি গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম, তখন আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না যে, আমাদের এই জায়গায় পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়া হবে। এমনকি আমি যখন সবরমতীতে ছিলাম, তখনও একটি গুজব রটেছিল যে, সম্ভবত আমাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম সরকার সম্ভবত আমার দলের লোকদেরকে ডান্ডি আসতে দেবে, তবে অবশ্যই আমাকে নয়। যদি কেউ বলে যে এটি আমার বিশ্বাস আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবে আমি ওই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করব না। আমি যে এখানে এসে পৌঁছেছি তার পেছনে শান্তি ও অহিংসার অবদান কম ছিল না। এই শক্তি সর্বত্র অনুভূত হয়। সরকার পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সেইজন্য তারা নিজেদের অভিনন্দন জানাতে পারে। কারণ সরকার চাইলে আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারত। এই শান্তিপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণকারী জনগণকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা তাদের ছিল না বলে সরকার যে মন্তব্য করেছে, আমরা তার প্রশংসা করি। এই জনগণকে গ্রেপ্তার করতে সরকার লজ্জা অনুভব করেছে। তিনিই একজন সভ্য ব্যক্তি যিনি, তার প্রতিবেশীরা যে পদক্ষেপকে সমর্থন করবে না সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ করেন। যদি সরকার শুধুমাত্র বিশ্ব জনমতে সমীহ করে আমাদের গ্রেপ্তার না করে থাকেন, তবুও তারা অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

আগামীকাল আমরা লবণ আইন ভঙ্গা করতে যাচ্ছি। সরকার তা মেনে নেবে কিনা - তা ভিন্ন প্রশ্ন। তারা এটি নাও মেনে নিতে পারে। কিন্তু তারা আমাদের এই অভিমতের ব্যাপারে যে ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য তাদের অভিনন্দিত করা যায়।

যদি গুজরাটের সমস্ত নেতৃবৃন্দ সহ আমাকে এবং দেশের অন্যান্য বিখ্যাত নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় তবে কী হবে? এই আন্দোলন এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয় যে, যখন সমগ্র জাতীয় উত্থান ঘটে, তখন আন্দোলনের জন্য কোনো নেতার প্রয়োজন হয় না।

দ্যা কালেক্টেড ওয়ার্কর্স অফ মহাত্মাগান্ধি (CWMG), 49 তম খণ্ড

➲ এই বক্তৃতা হতে ঔপনিবেশিক সরকার সম্পর্কে গান্ধিজির দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিচয় পাওয়া যায়?

অসহযোগ আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নির্দেশিত জাতীয়তাবাদী অভিযান ছাড়াও প্রতিবাদের আরো অনেক ধারা ছিল। ভারতের বিশাল অংশ জুড়ে কৃষকরা ঘৃণ্য ঔপনিবেশক বন আইন লঙ্ঘন করে এই আইনের বলে একদা তাদের গবাদি পশু বিচরণ ভূমি ছিল যে অরণ্য তার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কোনো কোনো শহরে কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হয়। আইনজীবীরা ব্রিটিশ আদালত বর্জন করেন এবং শিক্ষার্থীরা সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অস্বীকার করে। 1920-22 সালের মতো এখনো গান্ধিজির আহ্বান সকল শ্রেণির ভারতীয়রা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তাদের নিজস্ব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে এগিয়ে আসে। শাসকেরা বিরোধীদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। লবণ সত্যাগ্রহ চলাকালীন গান্ধিজি সহ প্রায় 60,000 ভারতবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সমুদ্রতীরে গান্ধিজির পদযাত্রার গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখার জন্য যে পুলিশ আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হয় তাদের গোপন প্রতিবেদন থেকে এই অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। চলার পথে গ্রামগুলোতে গান্ধিজি যে বক্তৃতার মাধ্যমে স্থানীয়

আধিকারিকদের সরকারি চাকরি পরিহার করে স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানান তার উল্লেখ এই প্রতিবেদনে আছে। বাসনা নামক গ্রামে গান্ধিজি উচ্চবর্ণের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা যদি স্বরাজ লাভে ইচ্ছুক তাহলে আপনারা অস্পৃশ্যদের সেবা করুন, শুধুমাত্র লবণ কর বা অন্যান্য রাজস্ব আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে লাভ করা যাবে না। স্বরাজ লাভ করার জন্য আপনারা অস্পৃশ্যদের প্রতি এতকাল যে অন্যায় করেছেন তার সংশোধন করতে হবে। স্বরাজের জন্য হিন্দু, মুসলমান, পার্সী এবং শিখদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলো স্বরাজ লাভের সহায়ক।" পুলিশের গুপ্তচরেরা তাদের প্রতিবেদনে জানান যে, গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ - পুরুষ ও মহিলায় গান্ধিজির সভাগুলো ছিল জনাকীর্ণ। তাঁরা লক্ষ করেছেন যে, কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাদের কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে অনেক প্রাক্তন আধিকারিক ছিলেন যাঁরা ঔপনিবেশিক সরকারের চাকরি থেকে ইস্তফা দান করেন। জেলার পুলিশ আধিকারিক সরকারকে লিখিতভাবে জানান "মি. গান্ধিকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত এবং স্থির বলে মনে হয়। তিনি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আরো বেশি শক্তি সংগ্রহ করেছেন।" লবণ পদযাত্রার অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য অন্য উৎস থেকেও পাওয়া যায় : আমেরিকান নিজউ ম্যাগাজিন টাইম পত্রিকা প্রথম অবস্থায় গান্ধিজির বহিরঙ্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাঁর টাকুর মতো শরীর ও মাকড়সার মতো কোমরের প্রতি ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ করে।

এভাবে মার্চে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদনে টাইম গান্ধিজির নেতৃত্বে এই অভিযানের গন্তব্যে পৌঁছানোর বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা দাবি করে দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রার শেষে গান্ধিজি "মাটিতে পড়ে যান" পত্রিকাটি বিশ্বাস করতে পারে নি যে এই কৃশকায় সন্ত আরো অনেক বেশি এগিয়ে যেতে শারীরিকভাবে সক্ষম হবেন।" কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই পত্রিকার ভাবধারার পরিবর্তন আসে। টাইম লিখেছিল যে, এই

চিত্র 13.8
1931 সালের জানুয়ারিতে মহাত্মা গান্ধি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতারা এলাহাবাদে বৈঠক করেন। চিত্রে ডানদিক থেকে বাদিকে দেখ। জওহরলাল নেহেরু, জমনালাল বাজাজ, সুভাষ চন্দ্র বসু, মহাদেব দেশাই সামনে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।

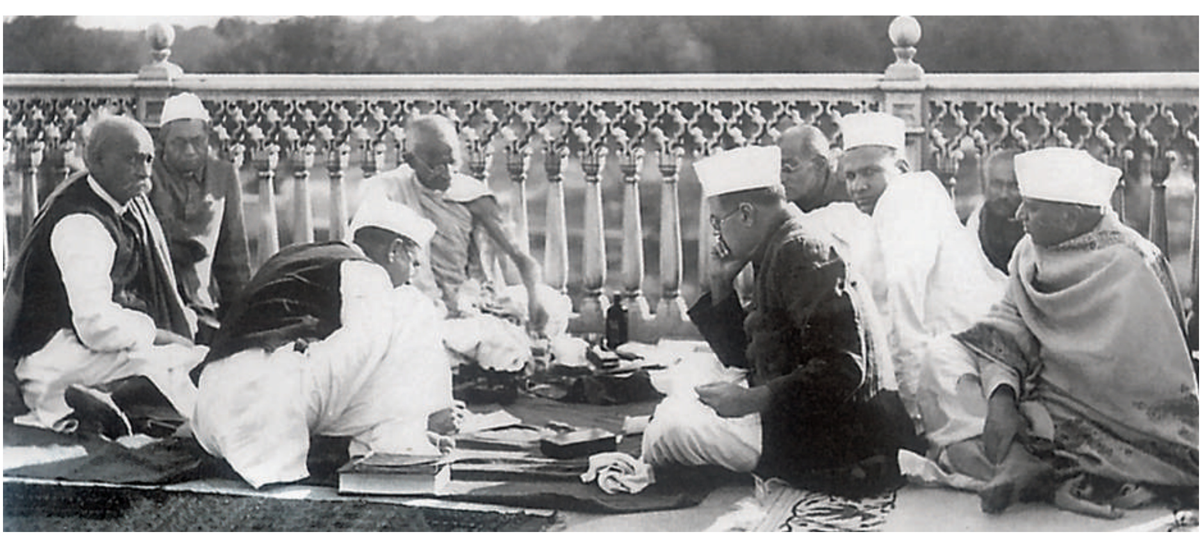

উৎস *5*

পৃথক নির্বাচনি সংক্রান্ত সমস্যা

গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনি ক্ষেত্রের নীতির বিরোধিতা করে তার যুক্তি উত্থান করেন :

> অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনি ক্ষেত্র তাদের চিরকালীন অবদমনের পথ প্রশস্ত করবে ... আপনারা কি অস্পৃশ্যদের চিরকাল অস্পৃশ্য করে রাখতে চান? পৃথক নির্বাচনি ক্ষেত্র গ্রহণ করার ফলে সেই পরিস্থিতি স্থায়ী হবে। অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন প্রয়োজন। আর তা বিলুপ্তি হলে দাম্ভিক ঊর্ধ্বতন শ্রেণি কর্তৃক অধস্তন শ্রেণির উপর আরোপ করা অসৎ নীতিও বিনষ্ট হবে। শ্রেণিগত বৈষম্য দূর হলে কাদের জন্য পৃথক নির্বাচনি ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে?

পদযাত্রা যে ব্যাপক জনসমর্থন পেতে সক্ষম হয় তাতে ইংরেজ শাসকরা "অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।" পত্রিকাটি গান্ধিজিকে একজন "সন্ত" এবং রাজনীতি হিসাবে অভিবাদন জানায়, যিনি "খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে খ্রিস্ট ধর্মে আচারিত রীতি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।"

3.2 কথোপকথন

লবণ সত্যাগ্রহ অন্ততপক্ষে তিনটি কারণে উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রথমত, এই ঘটনার মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধি প্রথমে বিশ্বের নজরে আসে। এই অভিযানের বর্ণনা ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সম্প্রচার করে। দ্বিতীয়ত, এটিই প্রথম জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি যেখানে বিপুল পরিমাণে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। সমাজকর্মী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় আন্দোলনকে শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য গান্ধিজিকে অনুরোধ করেন। অসংখ্য মহিলা যারা লবণ বা মাদক আইন ভঙ্গা করে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমলা দেবী। তৃতীয়ত, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যে, এই অভিযানের মাধ্যমে ইংরেজদের উপলব্ধি হয় এখন তাদের রাজত্ব চিরকাল টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না এবং ভারতবাসীদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই ভাবধারা থেকে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে একের পর এক "গোল টেবিল বৈঠকের" আয়োজন করে। প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় 1930 খ্রি. নভেম্বর মাসে, কিন্তু ভারতের কোনো সর্বোচ্চ নেতা এতে অংশগ্রহণ করেনি, ফলে এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 1931 সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধিজিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পরের মাসে ভাইসরয়ের সঙ্গো তাঁর একাধিক দীর্ঘ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকগুলোর পরেই "গান্ধি-আরউইন চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তার শর্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়, সব বন্দীদের মুক্তিদান এবং উপকূলবর্তী এলাকায় লবণ তৈরির অনুমতি প্রদান করা হয়। এই চুক্তিটি উগ্র জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হয়। কারণ তাঁরা মনে করেন গান্ধিজি ভাইসরয়ের কাছ থেকে ভারতীয়দের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেন নি; শুধুমাত্র এই মর্মে তিনি আলোচনার জন্য বৈঠকের আয়োজন সুনিশ্চিত করেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 1931 খ্রি. শেষের দিকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে গান্ধিজি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও গান্ধিজি দাবি করেন যে, তাঁর দল সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাঁর এই দাবিকে অন্যান্য তিনটি দল আপত্তি জানায়। মুসলিম লিগ যারা নিজেদের সংখ্যালঘু মুসলিমদের স্বার্থরক্ষাকারী বলে দাবি করত। রাজন্যবর্গ যাঁরা দাবি করতেন যে, তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কংগ্রেসের কোনো প্রভাব নেই এবং খ্যাতনামা আইনজীবী বি.আর.আম্বেদকর যুক্তি দিয়েছিলেন যে, গান্ধিজি এবং কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি কোনো মীমাংসায় পৌঁছতে পারেনি, তাই গান্ধিজি ভারতে ফিরে এসে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। নতুন ভাইসরয় লর্ড

চিত্র 13.9
1931 সালের নভেম্বরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে "নিম্নবর্গের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী" - কে মহাত্মা গান্ধি বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই দাবি সংহতিকে বিনষ্ট করবে এবং সমাজের মূলস্রোত থেকে নিম্নবর্গকে পৃথক করবে — যা অনভিপ্রেত।

উইলিংডনের গান্ধিজির প্রতি কোনো সমবেদনা ছিল না। নিজের বোনকে লেখা ব্যক্তিগত পত্রে উইলিংডন লিখেন, "যদি গান্ধি না থাকত তাহলে এটি একটি সুন্দর স্থান হত ... তিনি যেসব পদক্ষেপ সর্বদা গ্রহণ করেন তা তিনি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে থাকেন, আসলে এর পেছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বর্তমান। আমি দেখেছি আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম তাঁকে একজন আশ্চর্যজনক ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার বাস্তব বোধহীন রহস্যবাদী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী গান্ধিকে একজন পবিত্র ব্যক্তি বলে মনে করেন ...."

তবে, 1935 খ্রিস্টাব্দে নতুন ভারত শাসন আইনে ভারতীয়দের কাছে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারি ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়। দুই বছর পর একটি সীমিত ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয়লাভ করেছিল। ফলে 11টি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে কংগ্রেস "প্রধানমন্ত্রী" ব্রিটিশ গভর্নরের তত্ত্বাবধানে শাসনভার গ্রহণ করে।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছর পরে 1939 খ্রি. সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধি এবং জওহরলাল নেহেরু উভয়ই হিটলার ও নাৎসীদের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা হিটলার বিরোধী যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, এর পরিবর্তে তাঁরা যুদ্ধ অবসানে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশা করেন।

উৎস 6

পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র সম্পর্কে আম্বেদকরের চিন্তাধারা

নীচু শ্রেণির পৃথক নির্বাচনী ক্ষেত্রের দাবির প্রতি মহাত্মাগান্ধির বিরোধিতা প্রসঙ্গে আম্বেদকর লেখেন :

> এ এমন একটি শ্রেণি যারা নিঃসন্দেহে অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারবে না। যে ধর্মমতের সাথে তারা যুক্ত, সেই ধর্ম তাদের সম্মানজনক অবস্থান থেকে বঞ্চিত করে কুষ্ঠ রোগীর মতো সাধারণ জীবনযাপনের অনুপযুক্ত মনে করে। কোনো পৃথক জীবনযাপনের উপায় না থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে এই শ্রেণি প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল। এমন নয় যে, শুধুমাত্র হিন্দুদের সামাজিক বিশ্বাসের জন্য অনুন্নত শ্রেণির উত্তরণের পথ অবরুদ্ধ, এদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে সমস্ত হিন্দু সমাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করতে দেখা যায়।
>
> এ পরিস্থিতিতে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সহমত হবেন যে, এ ধরনের একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পক্ষে তাদের উপর সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্ব যার সাহায্যে তারা নিজেদের সুরক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হবে।

ড: বি.আর.আম্বেদকরের "WHAT CONGRESS AND GANDHI HAVE DONE TO THE UNTOUCHABLES" থেকে নেওয়া। খণ্ড 9, পৃষ্ঠা 312

চিত্র 13.10
ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর সাথে আলোচনা সভায় যাওয়ার পথে মহাত্মা গান্ধি এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ, 13 অক্টোবর 1939
আলোচনা সভায় যুদ্ধে ভারতের যোগদানের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ভাইসরয়ের সাথে আলোচনা ব্যর্থ হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী ইস্তফা প্রদান করে।

তাদের প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার নাকচ করে দেয়। এর প্রতিবাদে 1939 খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে কংগ্রেস মন্ত্রীরা ইস্তফা দেন। যুদ্ধের পরে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব শাসক পক্ষ থেকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার জন্য 1940 এবং 1941 সাল ব্যাপী কংগ্রেস সহ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ সংগঠিত করে।

ইতোমধ্যে 1940 খ্রি. মার্চ মাসে মুসলিম লিগ উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করে। ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমি জটিলতর হয়ে উঠেছিল : এটি আর ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের সংঘর্ষই ছিল না; বরং এটি কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং ব্রিটিশ শাসকের এই ত্রিপাক্ষিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই সময়ে ব্রিটেনে একটি সর্বদলীয় সরকার ছিল যেখানে শ্রমিক দলের সদস্য ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, কিন্তু রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী উইনসটন চার্চিল ছিলেন একজন কঠোর সাম্রাজ্যবাদী, তাঁর অভিমত ছিল ইংল্যান্ডের রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙ্গানে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন নি। 1942 খ্রি. বসন্তকালে চার্চিল গান্ধিজি এবং কংগ্রেসের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টার জন্য তাঁর একজন মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করেন। আলোচনায় কংগ্রেস দাবি করে যে, অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিরক্ষা সদস্য হিসাবে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা ভাইসরয়ের কর্তব্য। এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার সম্মত না হওয়ায় আলোচনা ব্যর্থ হয়।

চিত্র 13.11
স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধি, মার্চ 1942

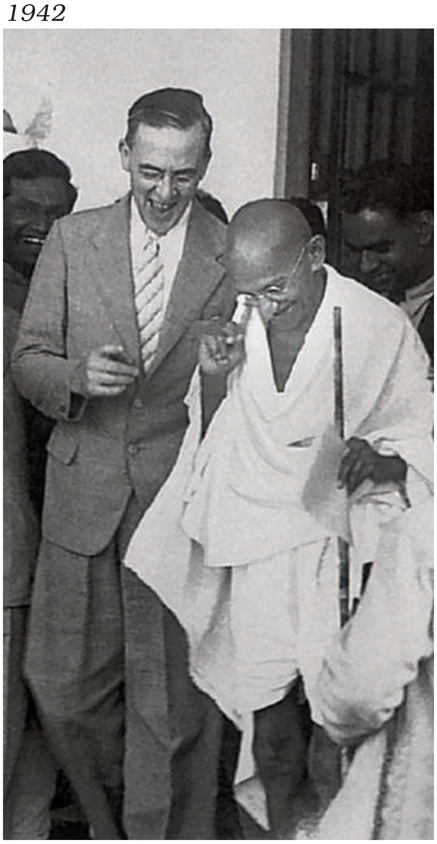

➲ আলোচনা করো...

উৎস 5 এবং 6 পড়। নিচু শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আম্বেদকর এবং মহাত্মাগান্ধির মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ লেখো।

4. ভারত ছাড়ো আন্দোলন

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর মহাত্মা গান্ধি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তৃতীয় বৃহৎ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 1942-এর আগস্ট মাসে এই ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। যদিও আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধিজিকে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু সারাদেশে (যুবা) যুবক সম্প্রদায়ের কার্যকর্তারা দেশব্যাপী ধর্মঘট, নাশকতামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে আন্দোলন চালাতে থাকে। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো কংগ্রেস সমাজবাদী সদস্যরা গোপন কার্যকলাপে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমের সাঁতারা এবং পূর্ব ভারতের মেদিনীপুরের মতো অনেক জেলায় 'স্বাধীন সরকার' গঠনের ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলনের মোকাবিলা করলেও তা দমন করতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগে।

অগণিত সাধারণ ভারতবাসীর অংশগ্রহণে ভারতছাড়ো আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলন বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে অত্যন্ত উৎসাহিত করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় যুবকরা কলেজ ছেড়ে কারাবরণ করে। কংগ্রেস নেতারা যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, জিন্না ও তার মুসলিম লিগের সহকর্মীরা (ধৈর্য্যের সঙ্গে / একাধারে অকাতরে) তখন তাদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মুসলিম লিগ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়, উল্লেখ্য এ সমস্ত অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত লিগের কোনো প্রভাব অনুভব হয়নি / লক্ষ্য করা যায় নি।

1944 খ্রি. জুন মাসে যুদ্ধ থেমে যাবার পর গান্ধিজিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ

সাঁতারা, 1943

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মহারাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথা ও জমিদারি প্রথা বিরোধী একটি অ-ব্রাহ্মণ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। 1930 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

1943খ্রি. মহারাষ্ট্রের সাঁতারা জেলার কিছু যুবক নেতা সেবা দল এবং তুফাল দল-এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি সমান্তরাল সরকার (প্রতি সরকার) প্রতিষ্ঠা করে। তারা জন আদালতের আয়োজন করে এবং গঠনমূলক কার্য্য পরিচালনা করেন কুনবি কৃষকদের আধিপত্য এবং দলিতদের সমর্থন পুষ্ট এই সমান্তরাল সরকার (প্রতি সরকার) সরকারী দমন নীতি সহ্য করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতিত 1946 সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল।

চিত্র 13.12
ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় বোম্বেতে মহিলাদের মিছিল।

বছরের শেষের দিকে তিনি কংগ্রেস ও লিগের মত পার্থক্য দূর করার উদ্দেশ্যে জিন্নার সঙ্গো অনেকবার আলোচনা করার জন্য মিলিত হন।1945 খ্রি. ইংল্যান্ডে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে ফিরে এসে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে আলোচনার জন্য একাধিক সভার আয়োজন করেন।

1946 খ্রি. প্রথমদিকে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন নতুন করে করা হয়। সাধারণ শ্রেণির আসনগুলোতে কংগ্রেস জয়লাভ করে। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে লিগ বিপুলভাবে জয়লাভ করে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মেরুকরণ সম্পূর্ণতা লাভ করে। 1946 খ্রি. গ্রীষ্মকালে ইংল্যান্ড থেকে প্রেরিত কেবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্বশাসন দান করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলে এ দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা। কিন্তু কংগ্রেসও লিগ মতানৈক্যে পৌঁছুতে না পারায় কেবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর মুসলিম লিগের পাকিস্থান দাবি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জিন্না 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসের ডাক দেন। 1946 সলের 16 আগস্ট নির্ধারিত দিনে কলকাতায় রক্তাক্ত দাঙ্গা শুরু হয়। হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রথমে বাংলার গ্রামাঞ্চলে, পরে বিহারে এবং পরবর্তীতে যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো জায়গায় মুসলিমরা, কোনো জায়গায় হিন্দুরা দাঙ্গার বলি হয়।

1947 খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসেবে ওয়াভেলের স্থলাভিষিক্ত হন। মাউন্টব্যাটেন শেষবারের মতো আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু যখন তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তখন তিনি ঘোষণা করেন ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে তবে এটি বিভক্তও হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য 15 আগস্ট দিনটি স্থির করা হয়। এই বিশেষ দিনটি দেশের বিভিন্ন অংশে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঙ্গো পালিত হয়। দিল্লিতে সংবিধান সভার অধ্যক্ষ যখন মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধিকে 'জাতির জনক' উপাধি দিয়ে সংবিধান সভার বৈঠক শুরু করেন তখন 'দীর্ঘ করতালি' হতে থাকে, সভার বাইরে জনতা 'মহাত্মা কি জয়' ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে।

চিত্র 13.13
জওহরলাল নেহেরু (ডানে) সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের (বায়ে) সঙ্গো আলোচনারত মহাত্মা গান্ধি। নেহেরু ও প্যাটেল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যথাক্রমে সমাজতন্ত্রী ও রক্ষণশীল এই দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন। গান্ধিজি দুই দলের মধ্যে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করতেন।

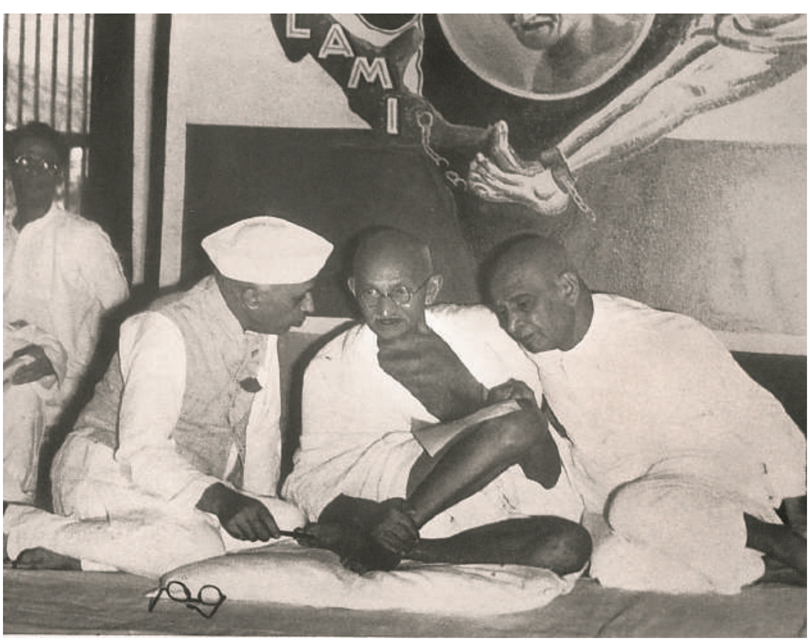

5. শেষের বীরোজিত (বীরত্বপূর্ণ) দিনগুলো

মহাত্মা গান্ধি 1947-এর 15 আগস্ট রাজধানী দিল্লিতে আনন্দ উদ্‌যাপনের শরিক হননি। তিনি সে সময় কলকাতায় ছিলেন, যেখানে তিনি কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেননি বা কোথাও পতাকাও উত্তোলন করেননি। সেই দিনটি তিনি 24 ঘণ্টা অনশনের মাধ্যমে পালন করেন। তিনি এতদিন যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তা দেশের খণ্ডীকরণ ও হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের মতো চরম মূল্যের বিনিময়ে আসে।

গান্ধিজির জীবনীকার ডি.জি.তেন্ডুলকর লিখেছেন, "সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসব্যাপী গান্ধিজি বিপর্যস্ত জনগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল ও শরণার্থী শিবির পরিভ্রমণ করেন'। তিনি "শিখ, হিন্দু ও মুসলমানদেরকে অতীত ভুলে, কষ্টকে জয় করে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে শান্তিতে বাস করার পরিবেশ তৈরির আবেদন জানান ...."

গান্ধিজিও নেহেরুর উদ্যোগে কংগ্রেসে 'সংখ্যালঘুদের অধিকার' সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস দল কখনো দ্বি-জাতি তত্ত্বকে গ্রহণ করেনি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলেও কংগ্রেস দল বিশ্বাস করে যে, ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি অধ্যুষিত দেশ এবং এদেশে এই ধারাই বহমান থাকবে। পাকিস্থানে যে পরিস্থিতিই হোক, ভারত এক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেখানে প্রত্যেক নাগরিক সমস্ত অধিকার ভোগ করবে এবং ধর্মীয় আচার আচরণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা লাভ করত। কংগ্রেস দেশের সংখ্যালঘুদের এই মর্মে নিশ্চিত করতে চেয়েছে যে এই দল সর্বশক্তি দিয়ে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের নাগরিক অধিকার সুরিক্ষত রাখবে।

অনেক লেখকরা ব্যক্ত করেছেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ছিল গান্ধিজির জীবনের সর্বোৎকৃস্ট সময়। বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রয়াসের পর গান্ধিজি দিল্লিতে যান, সেখান থেকে তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত পাঞ্জাবে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। রাজধানীতে থাকাকালীন শরণার্থীরা কোরান পাঠে আপত্তি জানিয়ে তার সভায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, গান্ধিজি কেন তখনও পাকিস্থানে বসবাসরত হিন্দু ও শিখদের দুর্দশা সম্বন্ধে নীরব তা জানতে চেয়ে সভাস্থলে শ্লোগান দিতে থাকে। ডি.জি. তেন্ডুলকর লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে গান্ধিজি পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাদের উদ্ধারের জন্য (সাহায্যের) সেখানে যেতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে মুসলমানদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ আয়োজন না করে পাকিস্থানে যেতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

চিত্র 13.14
1947 খ্রি. দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে যাওয়ার পথে।

চিত্র 13.15
মহাত্মার মৃত্যুদৃশ্যের একটি জনপ্রিয় চিত্ররূপ। জাতীয় আন্দোলনে তার একীকরণের প্রয়াস স্মরণ করে জনগণ গান্ধিজিকে দেবতারূপে বর্ণনা করে। এখানে কংগ্রেসের দুই ধারার প্রতিনিধি জওহরলাল নেহেরু ও সর্দার প্যাটেল গান্ধিজির চিতার দুইপাশে দণ্ডায়মান। চিত্রের কেন্দ্রে স্বর্গালোক থেকে গান্ধিজি তাদের আশীর্বাদ করছেন।

1948 খ্রিস্টাব্দের 20 জানুয়ারি গান্ধির প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অকুতোভয়। 26 জানুয়ারি তার প্রার্থনাসভায় গান্ধিজি অতীতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে এই বিশেষ দিনটি পালনের কথা বর্ণনা করেন। যদিও স্বাধীনতা আসে, কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রথম কয়েকটি মাস ছিল তীব্র হতাশাব্যঞ্জক। তবুও তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, 'খারাপ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে' এবং 'ভারতীয়রা এখন একতাবদ্ধভাবে সমস্ত শ্রেণি এবং সব ধর্মাবলম্বী জনগণের সমতার জন্য কাজ করবে এবং সংখ্যা ও প্রভাবের দিক থেকে যতই গুরুত্বহীন হোক না কেন সংখ্যালঘুদের ওপর সংখ্যাগুরুদের আধিপত্য ও প্রাধান্য কখনোই স্থাপিত হবে না। এছাড়াও তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যদিও ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কিন্তু অন্তরে আমরা চিরকাল পরস্পরের ভাই ও বন্ধু হয়ে থাকব, একে অন্যকে সাহায্য ও সম্মান করব এবং বহির্বিশ্বের কাছে আমরা এক - এই পরিচয় তুলে ধরব।

গান্ধিজি মুক্ত এবং একতাবদ্ধ ভারতবর্ষের জন্য সারা জীবনব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, তথাপি যখন দেশ দ্বিখণ্ডিত হয় তিনি (ভারত, পাকিস্তান) দুই অংশকেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখার আবেদন জানান।

অন্য ভারতীয়রা এই ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন না। তার প্রাত্যহিক প্রার্থনাসভায় 30 জানুয়ারি অপরাহ্নে এক অল্পবয়স্ক ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হন। হত্যাকারী নাথুরাম গডসে পুণার একজন ব্রাহ্মণ, পরবর্তীতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তার সম্পাদিত হিন্দু চরমপন্থী সংবাদপত্রে গান্ধিজিকে 'মুসলমান তোষণকারী' বলে অভিযুক্ত করেছেন।

গান্ধিজির মৃত্যুতে শোকের বিষম বহির্প্রকাশ ঘটে, ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে তাকে প্রচুর শ্রদ্ধা জানানো হয়, জর্জ ওরওয়েল এবং এলবার্ট আইনস্টাইনের মতো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও তাঁর উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী প্রশংসাসূচক সম্মান জ্ঞাপন করেন। এক সময়ে গান্ধিজির শারীরিক গঠন এবং আপাতদৃষ্টিতে তার অযৌক্তিক ধারণাগুলোকে নিয়ে যে টাইম ম্যাগাজিন উপহাস করেছিল, এখন সেই পত্রিকা গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডকে আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে; জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানবজাতি এক ধারণা লালন করার অপরাধে একজন গোঁড়া আমেরিকান যেমন লিঙ্কনকে হত্যা করেন, তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় বলে বিশ্বাস করেন। আর তাই একজন ধর্মান্ধ হিন্দু ভারতীয় গান্ধিজিকে হত্যা করেন। এই প্রসঙ্গে টাইম লেখে, সমস্ত পৃথিবী যেমন লিঙ্কনের মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছিল, তেমনি উপেক্ষা করেছে গান্ধিজির মৃত্যুকে, কারণ এ থেকে অত্যন্ত গূঢ়, অত্যন্ত সরল শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা পৃথিবীর নেই।"

6. গান্ধিজিকে জানা

বিভিন্ন সূত্রে রয়েছে যা থেকে আমরা গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পুনর্গঠন করতে পারি।

6.1 জনগণের কণ্ঠস্বর এবং ব্যক্তিগত দলিল

একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল গান্ধিজির সহযোগী ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সহ, তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের রচনা ও বক্তৃতা। এই লেখা বা রচনাগুলোর মধ্যে আমাদের পার্থক্য করতে হবে। কোন্‌গুলো জনসাধারণের জন্য রচনা আর কোন্‌টি অন্য উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা একজন ব্যক্তির প্রকাশ্য চিন্তাধারার আভাস পাই। এই চিঠির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির রাগ, দুঃখ, আতঙ্ক, উদ্বেগ, হতাশা ইত্যাদির প্রকাশ আমরা যেভাবে দেখতে পাই, প্রকাশ্য উক্তিতে তারা নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তবে আমাদের একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্যের এই প্রভেদ অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকে না। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি ব্যক্তিগত হয় তবে যেগুলো জনসাধারণের জন্য হয়। এই চিঠিগুলোর বয়ান কখনো প্রকাশ্যে আসতে পারে, এই সম্ভাবনা থেকে রচিত হয়। বিপরীত দিকে চিঠির প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা অনেক সময় রচয়িতাকে মুক্ত মনে মতামত প্রকাশ করতেন না। মহাত্মা গান্ধি তাকে লিখিত অন্যের চিঠি নিয়মিতভাবে তার হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। নেহেরু জাতীয় আন্দোলনের সময় তার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাবলি সম্পাদনা করে একগুচ্ছ পুরনো চিঠি (*A Bunch of Old Letters*) প্রকাশ করেন।

উৎস 7

চিঠির মাধ্যমে একটি ঘটনা প্রকাশ

1920-এর দশকে জওহরলাল নেহেরু ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং 1928 খ্রি. সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, এন.জি.রঙ্গা ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সঙ্গো কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ায় কংগ্রেসের ভিতর সমাজতান্ত্রিক ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরে (মতবিরোধ সৃষ্টি হয়)। 1936 খ্রি. কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর জওহরলাল নেহেরু প্রচণ্ডভাবে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করেন এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির দাবিসমূহ সমর্থন করেন।

নেহেরুর সমাজবাদী চিন্তাধারায় আশঙ্কিত হয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে রক্ষণশীলরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুমকি দেয় এবং বোম্বের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি নেহেরুর উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক উক্তি (প্রকাশ) করে। প্রসাদ এবং নেহেরু দুজনেই মহাত্মা গান্ধির শরণাপন্ন হন এবং ওয়ার্ধা আশ্রমে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধিজি আগের মতো (অন্যান্য বারের মতো) এখানেও মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি একদিকে নেহেরুকে সংযত রাজনৈতিক মতবাদ (উগ্রবাদী) পোষণ করতে বলেন ও অন্যদিকে প্রসাদ ও অন্যান্যদের নেহেরুর নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে নির্দেশ দেন।

তার সম্পাদিত পুরোনো পত্রিকাগুচ্ছে (1958) নেহেরু সেই সময়ে বিনিময় করা বহু পত্র পুনর্মুদ্রণ করেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠাতে পুরোনো পত্রগুলোর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

উৎস 7 (contd)

একগুচ্ছ পুরোনো চিঠি থেকে উদ্ধৃত

আমার প্রিয় জওহরলালজী, *ওয়ার্ধা, 1 জুলাই, 1936*

গতকাল আপনার নিকট হতে চলে আসার পর আমরা মহাত্মাজীর সঙ্গো দীর্ঘ আলোচনা করি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের গ্রহণ করা পথ আপনাকে আঘাত করেছে এবং বিশেষ করে আমাদের চিঠির ভাষা আপনার জন্য বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাকে বিব্রত করা বা আঘাত দেওয়া কোনো অবস্থাতেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং আপনি যদি প্রস্তাব করেন বা এই চিঠি আপনার মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আপনি যদি ইঙ্গিত করেন, আমরা বিনা দ্বিধায় চিঠিটি সংশোধন বা পরিবর্তন করব। কিন্তু আমরা সমস্ত পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করে এই চিঠিটি এবং ইস্তফা প্রত্যাহার করার সিধান্ত গ্রহণ করেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
রাজেন্দ্র প্রসাদ

প্রিয় বাপু, *এলাহাবাদ, 5 জুলাই, 1936*

আমি গতরাতে এখানে পৌঁছেছি। ওয়ার্ধা ত্যাগ করার পর থেকে আমি শারীরিকভাবে দুর্বল বোধ করছি এবং মানসিক কষ্ট অনুভব করছি। ... ইউরোপ হতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে আমি অনুভব করছি যে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি, সভাগুলো আমার জীবনীশক্তি হ্রাস করে এবং প্রতিটি সভার পর আমার নিজেকে বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত বলে মনে হয় ....।

সমস্ত বিষয়ের সকল সমাধান করার জন্য এবং সংকট এড়াতে সাহায্য করার জন্য আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি, রাজেন্দ্র বাবুর পাঠানো (দ্বিতীয় পত্র) আবার পড়েছি এবং আমার প্রতি তার ভয়ানক অভিযোগ ... যতটা ভদ্রতার সঙ্গোই বলা হোক না কেন, এটি স্পষ্ট যে আমি একজন অসহনীয় উপদ্রব এবং যে সমস্ত গুণের আমি অধিকারী কিছু পরিমাণ সামর্থ্য, শক্তি, আন্তরিকতা, অস্পষ্ট আবেদন সম্বলিত ব্যক্তিত্ব ভুল রথে (সমাজতন্ত্র) যুক্ত হওয়ার ফলে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এ সমস্ত কিছুর পরিণাম অত্যন্ত স্পষ্ট।

আমার বই-এ এবং অন্যান্য জায়গায় আমি আমার বর্তমান ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আমাকে যাচাই করার ক্ষেত্রে তথ্যের কোনো অভাব নেই। আমার এ সমস্ত ধারণা আকস্মিক ছিল না, এ আমার অস্তিত্বের অংশ এবং যদিও ভবিষ্যতে আমি এর পরিবর্তন ঘটাতে পারি বা এর সঙ্গো পার্থক্য অনুভব করতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এ ধারণায় বিশ্বাস করি, ততক্ষণ অবশ্যই আমি তা প্রকাশ করব। যেহেতু আমি বৃহত্তর ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করি, সেহেতু আমি সম্ভাব্য কোমলতম ভাষায় এবং স্থির সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, চিন্তা উদ্রেগকারী আমন্ত্রণ হিসেবে আমার ধারণাকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা করেছি। এই আবেদন এবং কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে আমি কোনো দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিনি, নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, আমার আবেদন জনগণকে উৎসাহিত করতে পারে বলে তা ছিল আমাদের কাছে নিশ্চিতই সম্পদ (লাভজনক বিষয়)। কিন্তু আমার আবেদন কোমল ও অস্পষ্ট হওয়ায় আমার সহকর্মীদের কাছে তা ভয়ানক এবং ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে। বেকারি এবং দারিদ্রতার উপর আমি সর্বদা যে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, তা অনুচিত বলে আমাকে বলা হয়েছে, অথবা যেভাবে আমি তা প্রকাশ করে থাকি তা ভুল...

আপনি আশায় বলেছিলেন যে আপনি কোনো প্রকার বার্তা (বা বিবৃতি) প্রকাশ করার বিষয়ে ইচ্ছা (চিন্তা) করেছিলেন। আমি তাতে স্বাগত জানাই কারণ আমি বিশ্বাস করি দেশের সমস্ত ধরনের মতামত তুলে ধরা উচিত।

আপনার স্নেহধন্য
জওহরলাল

প্রিয় জওহরলাল,

সেগাঁও, 15 জুলাই, 1936

তোমার পত্র হৃদয়স্পর্শকারী। তুমি সবচাইতে বেশি বেদনাগ্রস্ত। প্রকৃতপক্ষে তোমার সহকর্মীদের তোমার মতো সাহসিকতা ও উদারতা নেই। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। আমি সবসময় তাদের নির্ভীকভাবে খোলামনে তোমার সাথে আলোচনা করতে বলেছি। কিন্তু সাহসিকতার অভাবে যখনই তারা আলোচনা করেছে তা অস্পষ্টভাবে করেছে এবং তুমি তাতে বিরক্তিবোধ করেছ। আমি তোমায় বলতে পারি তাদের প্রতি তোমার বিরক্তি ও অধৈর্য্য মনোভাবের জন্য তারা তোমায় ভয় করছে। তোমার ধমক (কড়া সমালোচনা) ও আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি তাদের কাছে প্রতিভাত তোমার অভ্রান্ততা এবং প্রজ্ঞা (knowledge) এবং তোমার অন্যায় দাবিতে তারা বিরক্তিবোধ করছে। তারা মনে করে যে, তুমি তাদের সাথে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করনি এবং সমাজতন্ত্রীবাদীরা তাদের মতবাদের অপব্যাখ্যা করে তাদের নিয়ে যে তামাশা করেছেন সেক্ষেত্রেও তুমি তাদের পাশে দাঁড়াও নি।

সমস্ত ঘটনাটিকে আমার একটি দুঃখজনক প্রহসন বলে মনে হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাকে সমস্ত বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে বলব।

আমি তোমার নাম কাটার মুকুটের (Presidentship of the Congress) জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। মস্তক চূর্ণ হয়ে গেলেও এগিয়ে যাও। কমিটি সভায় তোমার রসিকতাপূর্ণ ব্যবহার জাগিয়ে তোলো। এটাই তোমার সবচেয়ে (সর্বাধিক) সাধারণ ভূমিকা। সযত্নে লালিত বিরক্ত, যে-কোনো মুহূর্তে সামান্য কারণে ক্ষোভে ফেটে পড়বার মতো ব্যক্তিত্ব তোমার নয়।

আমি আশা রাখি যে, তুমি আমাকে তার যোগে জানাবে যে, লাহোরে নুতন বৎসরের প্রথম দিন তুমি যেরকম খুশি হয়েছিলে, জানা যায় তুমি সেদিন তিরঙ্গা পতাকার চারপাশে নৃত্য করেছিলে, তেমনই আনন্দ তুমি অনুভব করছ।

ভালোবাসা সহ
বাপু

➲

(a) সময়ের সাথে সাথে কংগ্রেসের আদর্শ গড়ে ওঠার ব্যাপারে আমরা চিঠিগুলো থেকে কী ধারণা লাভ করতে পারি?

(b) জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধির ভূমিকা সম্পর্কে চিঠিগুলো কী প্রকাশ করে?

(c) কংগ্রেসের কাজকর্ম এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে চিঠিগুলো কোনো বিশেষ আলোকপাত করে কি?

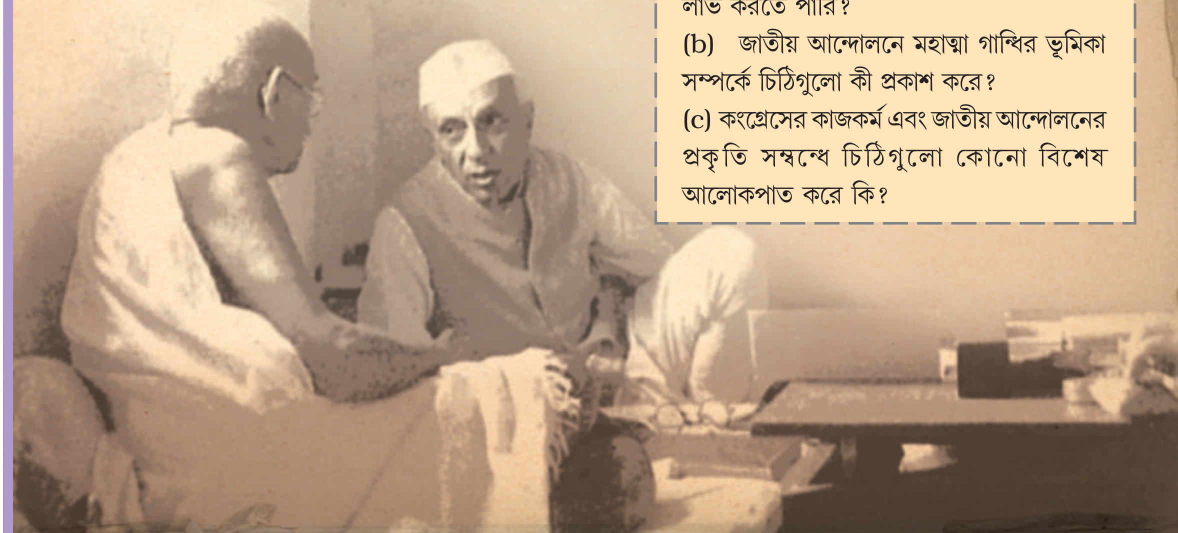

6.2 ছবির চিত্রায়ণ

আত্মজীবনীও আমাদের মানবিক বিবরণে পূর্ণ অতীত সম্বন্ধীয় বহু তথ্য প্রদান করে। কিন্তু পুনরায় আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গো আত্মজীবনীগুলোকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে এখানে অতীতের বিবরণ স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আত্মজীবনীতে লেখক যা স্মরণ করতে সমর্থ হয়েছেন, যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা স্মরণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, বা অন্যকে তার জীবন যেভাবে দেখাতে চান বলে মনে করেছেন, সেভাবেই তিনি তার রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আত্মজীবনী রচনাকে এক অর্থে নিজের ছবি বা চিত্র চিত্রণ করা বলা যায়। সুতরাং, এই বিবরণগুলো পাঠের সময় লেখক এখানে কি বলেন নি — সেই সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসু হওয়া প্রয়োজন : লেখক স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে স্মৃতি বিভ্রমের জন্য যেসব ক্ষেত্র বিশেষে নীরব থেকেছেন - তার কারণ আমাদের অনুধাবন / উপলব্ধি করতে হবে।

6.3 পুলিশের নজরে

অন্য একটি সূত্র হল সরকারি নথি ঔপনিবেশিক শাসকেরা যাদেরকে তাদের সমালোচক বলে মনে করতেন তাদের সম্বন্থে তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। পুলিশ বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি কর্মীদের লিপিবদ্ধ করা চিঠিপত্র বা প্রতিবেদন সে সময়ে গোপন থাকলেও বর্তমানে সরকারি মহাফেজখানায় তা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য (জানার জন্য/উপলব্ধির জন্য) অবস্থায় রক্ষিত আছে।

চিত্র 13.16
আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বোম্বাই-এ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ।

➲ তুমি কি এই ছবি এবং পুলিশের পাক্ষিক রিপোর্টে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাও ?

এসো আমরা এ জাতীয় / ধরনের একটি তথ্যসূত্র দেখি : বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বরাষ্ট্র বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত পাক্ষিক প্রতিবেদন এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে এ সমস্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত হলেও অনেক ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার যা দেখেছিলেন বা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ তাদের মতামত সন্নিবেশিত করতেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা নিজেরাই সে সম্ভাবনাকে অমূলক বলে প্রতিপন্ন করতে চাইতেন। লবণ সত্যাগ্রহের সময়কাল পাক্ষিক প্রতিবেদন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধির কর্মকাণ্ড জনমনে যে উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, স্বরাষ্ট্র বিভাগ তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিল। এই অভিযানকে নাটকীয়, কৌতুকপূর্ণ (অদ্ভুত) এবং ব্রিটিশ শাসনে সুখী, নিজস্ব জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ, সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে অনিচ্ছুক জনগণকে প্ররোচিত করবার বেপরোয়া প্রয়াস বলে দেখানো হয়।

উৎস 8

স্বরাষ্ট্র বিভাগের পাক্ষিক প্রতিবেদন
(গোপনীয়)

1930 সালের মার্চ মাসের প্রথমার্ধে

গুজরাটের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে এবং কতটা প্রভাবিত হবে তা বর্তমানে অনুমান করা কঠিন। এ সময়ে কৃষকরা রবি চাষের কাজে ব্যস্ত। ছাত্রেরা আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে মগ্ন।

মধ্য অঞ্চল ও বেরার

বল্লভভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেস গোষ্ঠীর বাইরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু গান্ধিজির অভিযানের আরম্ভে তাকে অভিনন্দিত করার জন্য নাগপুর কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নাগপুরে আয়োজিত সভায় 3000-এরও বেশি লোক যোগদান করে।

বাংলাদেশ

গত পক্ষকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলন। শ্রীযতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত অল বেঙ্গাল সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কাউন্সিল (All-Bengal Civil Disobedience Council) নামক সংগঠন এবং বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (Bengal Provincial Congress Committee) অল বেঙ্গাল কাউন্সিল অব ডিসওবিডিয়েন্স নামক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই পরিষদগুলো গঠন করা ছাড়া আইন অমান্য ব্যাপারে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি।

জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, আয়োজিত সভাগুলো কোনো ধরনের উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি বা সাধারণ জনমানসেও এর কোনো প্রভাব পড়ে নি, তবে এটি লক্ষনীয় যে, মহিলারা এই সভাগুলোতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় অংশ নিচ্ছেন।

বিহার এবং উড়িষ্যা

এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ তেমন কিছু জানা যায়নি। চৌকিদারী কর প্রদানের বিরুদ্ধে অভিযান গড়ে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা হলেও এখনো পর্যন্ত তা কার্যকরি করার জন্য কোনো স্থান নির্বাচন করা হয়নি। গান্ধিজির গ্রেপ্তার সম্পর্কে প্রকাশ্যে আগাম আলোচনা হলেও অনুমান মতো কাজে পরিণত না হওয়ায় পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

মাদ্রাজ

গান্ধির আইন অমান্য অভিযানের ফলে অন্যান্য ঘটনা গুরুত্ব হারিয়েছে, জনগণ এই অভিযানকে নাটকীয় ও পরিণতি লাভের অসাধ্য বলে মনে করলেও হিন্দু জনগণের মনে গান্ধি শ্রদ্ধার আসেন প্রতিষ্ঠিত, তার ফলে তার ইচ্ছাকৃত গ্রেপ্তার বরণ এবং তা থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

12 মার্চ আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্বোধনের দিন হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। বোম্বেতে সকালবেলা জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

বোম্বাই

কেশরী পত্রিকা তার স্বভাব সুলভ আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে লিখেছে, সরকার যদি সত্যাগ্রহের শক্তি পরীক্ষা করতে চান, তবে এর সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা দুই-ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি সরকার গান্ধিকে গ্রেপ্তার করেন, তা সমস্ত জাতির অসন্তুষ্টির কারণ হবে, যদি সরকার তা না করেন, আইন অমান্য আন্দোলন বিস্তার লাভ করবে। আমরা সেজন্য মনে করি যে, যদি সরকার শ্রী গান্ধিকে শাস্তি প্রদান করেন, তা জাতীয় জয় সূচিত করবে, যদি সরকার তা না করেন, তা আরো বৃহত্তর জয় সূচিত করবে।

অন্যদিকে নরমপন্থী পত্রিকা বিবিধকৃত এই আন্দোলনের অসাড়তা নির্দেশ করে এর লক্ষ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাকে বাতিল করে। তবে পত্রিকাটি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দমনমূলক নীতি এর উদ্দেশ্যকে বিফল/পরাস্ত করবে।

contd

উৎস 8 (contd)

মার্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ, 1930

বাংলাদেশ

গান্ধির সমুদ্রমুখী অভিযান এবং আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য তিনি যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলো গান্ধিজির কর্মকাণ্ড ও বক্তৃতা এবং সমস্ত বাংলাদেশে আয়োজিত সভা ও সেখানে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ করে। কিন্তু গান্ধি নির্দেশিত আইন অমান্য কর্মসূচির প্রতি জনগণের উৎসাহ লক্ষ করা যায় না ...।

সাধারণত জনগণ গান্ধিজির সাথে কি হবে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং যদি তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে বাংলার বারুদ স্তূপে অগ্নিসংযোগ ঘটবে তবে এই মুহূর্তে কোনো গুরুতর সংঘাতের সম্ভাবনা কম।

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার

12 মার্চ গান্ধিজির অভিযানের সূচনা উপলক্ষ্যে নাগপুরের বৈঠকগুলোতে যথেষ্ট জন সমাগম হয় এবং স্কুল কলেজগুলোও প্রায় নির্জন ছিল।

মদের দোকান বয়কট এবং বন আইন লঙ্ঘন আক্রমণের / সংঘাতের সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে।

পাঞ্জাব

ঝিলম জেলায় লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়। সুলতানে জলকর বিরোধী আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং গুজরানওয়ালাতে জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত আন্দোলন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সংযুক্ত প্রদেশ

বিগত পক্ষকালে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের উৎসাহ টিকিয়ে রাখার জন্য কোনো আকর্ষণীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত বলে কংগ্রেস দল অনুভব করে। বিভিন্ন জেলায় / জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের নামভুক্তি, গ্রামে প্রচার কার্য, গান্ধিজির নির্দেশে লবণ আইন ভাঙ্গার প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি কর্মপন্থা গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়।

1930 সালের এপ্রিল মাসের প্রথম পক্ষ

সংযুক্ত প্রদেশ

পক্ষকালের মধ্যে ঘটনার দ্রুত অগ্রগতি হয়। রাজনৈতিক, সভা মিছিল স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ছাড়াও আগ্রা, কানপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, মীরাট, রায়বেরেলি, ফারুকাবাদ, এটোয়া, বালিয়া এবং মইনপুরীতে প্রকাশ্যে লবণ আইনের বিরোধিতা করা হয়।

যুব লিগের সভায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মধ্যঅঞ্চলে (Central Provinces) যাওয়ার সময় 14 এপ্রিল ভোরবেলা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে চিওকি রেলস্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে নৈনী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিচারে তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়।

বিহার এবং উড়িষ্যা

কিছু জায়গায় অবৈধভাবে ছোটো হলেও লবণ উৎপাদনের আকর্ষণীয় প্রচেষ্টা করা হচ্ছে ....

মধ্যঅঞ্চল

জব্বলপুরে শেঠ গোবিন্দ দাস পরিষ্কৃত লবণের বাজার মূল্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি মূল্যে রাসায়নিক লবণ তৈরির প্রচেষ্টা করেন।

মাদ্রাজ

সমুদ্রের জল ফুটিয়ে তৈরি করা লবণ বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করা হলে বিশাখাপত্তনমে পুলিশ ব্যাপক বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু অন্যত্র লবণ বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে সীমিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশ

বিশেষভাবে 24 পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার মফস্বল এলাকাতে অবৈধ লবণ তৈরির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

এভাবে তৈরি অল্প পরিমাণ লবণের অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বাসন বিনষ্ট করা হয়।

➲ পাক্ষিক প্রতিবেদনগুলো মনোযোগ সহকারে পড়। এগুলো স্বরাষ্ট্র বিভাগের গোপন প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি। বিভিন্ন জায়গা থেকে পুলিশের পাঠানো তথ্য এই প্রতিবেদনগুলোতে সবক্ষেত্রে গৃহীত হয় নি।

(1) সংবাদ সূত্রের ধরণ কীভাবে প্রতিবেদনের বিষয়কে প্রভাবিত করে বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামতকে ব্যাখ্যা করে উপরোক্ত প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃতিসহ একটি টীকা লেখো।

(2) মহাত্মা গান্ধির গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনগণের ভাবনাচিন্তা ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র বিভাগ কেন ক্রমাগত প্রতিবেদন পাঠাচ্ছিল বলে তুমি মনে কর। 1930 খ্রি. 5 এপ্রিল গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গে ডাণ্ডিতে গান্ধিজির বক্তব্য পুনরায় পাঠ কর।

(3) কেন গান্ধিজিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে তুমি মনে কর?

(4) গান্ধিজির অভিযান জনগণের মধ্যে কোনো সাড়া ফেলতে সমর্থ হয়নি বলে স্বরাষ্ট্র বিভাগ কেন বলে আসছিল? এই বিষয়ে তোমার কী ধারণা?

6.4 সংবাদপত্র থেকে

অন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত সংবাদপত্র। এ সমস্ত সংবাদপত্র মহাত্মা গান্ধির আন্দোলন ও তাঁর অন্যান্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরত এবং মহাত্মা গান্ধি সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের ধারণাও সেখানে প্রতিফলিত হত। তবে সংবাদপত্রের বিবরণকেও নিরপেক্ষ বলে গ্রহণ করা যায় না। যারা সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন তাদেরও নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত ও ধারণা ছিল। তাদের চিন্তাধারা প্রভাবিত করত এবং কীভাবে সংবাদ প্রকাশিত হবে, তাদের প্রকাশিত সংবাদ এবং কোন্ ঘটনার বিবরণে তাদের ধারণা ও মতামতের প্রভাব পড়ত, লন্ডনে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের পার্থক্য হত।

সংবাদপত্রের এই সমস্ত প্রতিবেদন তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করলেও এগুলো বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এখানে উল্লিখিত সমস্ত ঘটনার সাথে বাস্তবে সংঘটিত হওয়া ঘটনার সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে। আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ এবং এর বিস্তার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন সরকারি কর্মীদের ভয় এবং আশঙ্কা অনেকক্ষেত্রে এ সমস্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে তাদের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং গ্রেপ্তারের ফলাফল কী হবে সে সম্বন্ধেও তাদের কোনো ধারণা ছিল না। ভারতীয় জনগণ এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক সরকার যত বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল, তাদের শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে ততই তাদের মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল।

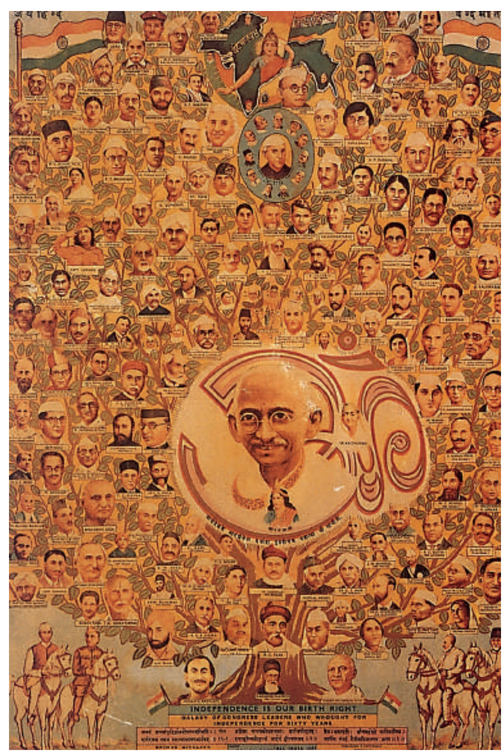

চিত্র 13.17
এ ধরনের চিত্রের মাধ্যমে জনমানসে মহাত্মাগান্ধির কী ভূমিকা ছিল তা ধারণা করা যায়।
জনপ্রিয় এই চিত্রে অংকিত জাতীয়তাবাদী বৃক্ষের কেন্দ্রস্থলে মহাত্মা গান্ধির চিত্রকে পরিবেষ্টন করে অন্যান্য নেতা ও মনীষীদের ছোটো ছোটো চিত্র প্রদর্শিত / লাগানো হয়।

সময়পঞ্জি

1915	মহাত্মা গান্ধির দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন
1917	চম্পারণ আন্দোলন
1918	খেদাতে (গুজরাট) কৃষক আন্দোলন এবং আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলন
1919	রাওলাট সত্যাগ্রহ (মার্চ-এপ্রিল)
1919	জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (এপ্রিল)
1921	অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন
1928	বারদৌলিতে কৃষক আন্দোলন
1929	লাহোর কংগ্রেসে, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ (ডিসেম্বর)
1930	আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা, ডান্ডি অভিযান (মার্চ-এপ্রিল)
1931	গান্ধি-আরউইন চুক্তি (মার্চ) : দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (ডিসেম্বর)
1935	গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের আশ্বাস দেওয়া হয়
1939	কংগ্রেস মন্ত্রীদের ইস্তফা প্রদান
1942	ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাত (আগস্ট)
1946	মহাত্মা গান্ধি সাম্প্রদায়িক হিংসা রোধ করার জন্য নোয়াখালি ও অন্যান্য দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিভ্রমণ করেন।

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. গান্ধিজি কীভাবে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হতে চেষ্টা করেছেন?
2. কৃষকেরা মহাত্মা গান্ধিকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন?
3. লবণ আইন কেন সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেছিল?
4. জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সংবাদপত্র কেন তথ্যসূত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
5. *চরকাকে* কেন জাতীয়তাবাদের চিহ্ন হিসেবে বাছাই করা হয়?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. অসহযোগ কীভাবে প্রতিবাদের রূপ ধারণ করে?
7. গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা কেন অমীমাংসিত ছিল?
8. মহাত্মা গান্ধি কীভাবে জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রে পরিবর্তন আনেন?/ ঘটালেন?
9. ব্যক্তিগত পত্র এবং আত্মজীবনী থেকে একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা কী জানতে পারি? এই তথ্যসূত্রের সাথে / সঙ্গে সরকারি বিবরণের কী পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

মানচিত্রের কাজ

10. ডাণ্ডি অভিযানের পথ নির্দেশ কর। গুজরাটের একটি মানচিত্রে অভিযানের পথরেখা নির্দেশ করে এই পথে বড়ো বড়ো শহর ও গ্রাম নির্দেশ কর।

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

11. দুজন জাতীয়তাবাদী নেতার আত্মজীবনী পড়। তাদের জীবন, সময় এবং জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে লেখকদের মতামত পাঠ করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা লক্ষ্য কর। তোমার পঠিত বিষয়গুলোর একটি বিবরণ লেখো।
12. জাতীয় আন্দোলনের সময় সংঘটিত কোনো ঘটনার উল্লেখ কর। সমসাময়িক নেতাদের বক্তৃতা ও চিঠি পাঠ কর। বর্তমানে বহু চিঠি ও বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় নেতারা রাষ্ট্রীয় নেতাদের কার্যকলাপ কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন? তোমার পঠিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আন্দোলন সম্পর্কে লেখো।

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Sekhar Bandyopadhyay. 2004. *From Plassey to Partition: A History of Modern India.* Orient Longman, New Delhi.

Sarvepalli Gopal. 1975. *Jawaharlal Nehru: A Biography, Volume I, 1889-1947.* Oxford University Press, Delhi.

David Hardiman. 2003. *Gandhi in His Time and Ours*. Permanent Black, New Delhi.

Gyanendra Pandey. 1978. *The Ascendancy of the Congress in Uttar Pradesh. 1926-34.* Oxford University Press, Delhi.

Sumit Sarkar. 1983. *Modern India, 1885-1947.* Macmillan, New Delhi.

You could visit:
http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html
(for Collected Works of Mahatma Gandhi)

বিষয়বস্তু
চতুর্দশ

বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশবিভাগ

রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

চিত্র 14.1
দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য করা হয়েছিল নতুন জায়গায় নতুনভাবে জীবন শুরু করতে।

আমরা জানি যে, ঔপনিবেশিকদের হাত থেকে 1947 সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতার আনন্দ লাভ করেছিল, তাই এটা ছিল দেশ বিভাগের বর্বরতা ও হিংস্রতার কলঙ্কিত অধ্যায়। ব্রিটিশ ভারতকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি সার্বোভৌম রাষ্ট্রে ভাগ করেছিল (এইগুলো হল পশ্চিম ও পূর্বভাগ) এবং এই অবস্থায় অনেক জরুরী উন্নতির প্রয়োজন ছিল। হাজার হাজার বাসস্থান ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, অনেকে নাটকীয়ভাবে অবস্থান্তরিত হল। নতুন দেশ জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বহু শহরের পরিবর্তন ঘটল এবং নজীরবিহীনভাবে গণহত্যা ও হিংস্রতার কারণে অনেকে দেশান্তরিত হল।

এই অধ্যায়ে দেশ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে : কেন এবং কেমন করে ঘটনাগুলো ঘটল। একই সাথে 1946-50, এই সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা আলোচনা করবে। এটি আরও আলোচনা করবে কেমন করে ইতিহাসের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে

লাগিয়ে পুনরুদ্ধার এবং সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে মৌখিক ইতিহাস ব্যবহার করা যায়। একই সময়ে এই মৌখিক ইতিহাসের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতাগুলো নির্দেশ করবে। সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি অতীত সমাজ যেটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব কম অথবা অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু তারা অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ করে না, তাদের ইতিহাস, যাদের ইতিহাস আমরা অন্যান্য উপকরণ থেকে আমাদের প্রয়োজন মতো তৈরি করতে পারি। আমরা এই সমস্যাগুলো এই অধ্যায় শেষে আলোচনা করবো।

চিত্র 14.2
আমরা ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সেই সময়ের হিংস্রতা সম্পর্কে আভাষ পাই।

1. দেশ বিভাগ সম্পর্কিত কিছু অভিজ্ঞতা (Some Partition Experiences)

1993 সালে একজন গবেষকের কাছে যারা দেশ বিভাগের চেষ্টা করার সময়টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাদের দ্বারা বর্ণিত তিনটি ঘটনা এখানে উপস্থাপন করা হল। তথ্য প্রদানকারী লোকগুলো ছিলেন পাকিস্থানের এবং গবেষক ছিলেন ভারতীয়। এই গবেষকের কাজটি হল 1947 সালের, ওই অভিজ্ঞ লোকগুলো যারা কয়েক প্রজন্ম ধরে কম-বেশি শান্তি সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছিলেন তারা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত এনেছিলেন।

উৎস 1

আমি সাধারণভাবে আমার পিতার ঋণ পরিশোধ (ফেরত) করছি।

গবেষকরা যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা হল :

1992 সালের শীতকালে আমার লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার পরিদর্শনের সময়, গ্রন্থাগারিক আবদুল লেতিফ নামে একজন মধ্য বয়সি ধর্ম পিপাসু ব্যক্তি আমাকে অসামান্য সাহায্য করেছেন। তিনি তার কর্তব্য কর্মের বাইরেও আমার অনুরোধ অনুসারে আমাকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সমূহ প্রদানের জন্য যত্ন সহকারে এইগুলোর ফটোকপি করে পরদিন সকালে আমার উপস্থিত হবার আগেই প্রস্তুত করে রাখতেন। আমার কাজের প্রতি উনার দৃষ্টিভঙ্গি এতই ব্যতিক্রম মূলক ছিল যে, একদিন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলাম যে, লতিফ সাহেব আপনি আপনার কর্তব্য কর্মের বাইরে গিয়ে আমাকে কেন এত সাহায্য করছেন? লতিফ সাহেব তার ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং নামাজের টুপি হাতে নিলেন এবং বললেন, "আমি এখন নামাজ পড়তে যাবো কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি নামাজ থেকে ফিরে এসে দেব।" আধ ঘণ্টা পরে তিনি তার অফিসে ফিরে এলেন এবং বলতে লাগলেন,

"হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নের উত্তর, আমি ... আমি মানে, আমার বাবা জম্মু জেলার ছোটো একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এইটা ছিল একটি হিন্দু প্রভাবিত গ্রাম এবং 1947 সালের অগাস্টে এই এলাকার হিন্দু দুর্বৃত্তরা গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর হত্যালীলা চালিয়েছিল। একদিন পড়ন্ত বেলায় যখন উচ্ছৃঙ্খল হিন্দু জনতা তাদের উন্মত্ত ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিলেন, আমার বাবা উপলব্ধি করেছিলেন (আবিষ্কার করিয়াছিলেন) যে, সম্ভবত তিনিই একমাত্র মুসলিম যুবক ওই গ্রামে জীবিত আছেন। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন নিষ্ঠুর হত্যালীলায় এবং তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পলায়ন করার রাস্তা খুঁজছিলেন। এক প্রতিবেশী প্রবীন হিন্দু ভদ্র মহিলার কথা স্মরণ করে তিনি তাঁকে তাঁর জায়গায় আশ্রয় দিয়ে তাকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ভদ্র মহিলা তাকে (পিতাকে) সাহায্য করতে সম্মতি হলেন, এবং বললেন, 'পুত্র যদি তুমি এখানে আত্মগোপন করো তারা আমাদের উভয়কেই পেয়ে

যাবে।' এতে কোনো কাজ হবে না। তারা যেখানে মৃতদেহ স্তূপাকৃত করে রেখেছে সে জায়গার দিকে, তুমি আমাকে অনুসরণ করো। তুমি মৃত মানুষের মতো সেখানে শুয়ে পড়ো যেন তুমি মৃত এবং আমি কয়েকটি মৃতদেহ তোমার উপরে স্তূপাকৃত করে রাখব। পুত্র, তুমি সেখানে মৃতদেহগুলোর মাঝখানে শুয়ে পড়ো, সারারাত ধরে মরার মতো শুয়ে থাকো এবং আগামীকাল ভোর হওয়ার সাথে সাথে শিয়ালকোট-এর দিকে ছুটতে থাকবে তোমার জীবন বাঁচানোর জন্য।"

"আমার বাবা এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। তারা ঘটনার জায়গাতে গেলেন, আমার বাবা সেখানে মাটিতে শুয়ে পড়লেন এবং বৃদ্ধ মহিলা আমার বাবার দেহের উপর কয়েকটি মৃতদেহ স্তূপ করে রেখেছিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে একদল সশস্ত্র হিন্দু দুর্বৃত্ত সেখানে উপস্থিত হল। তাদের মাঝখান থেকে একজন চিৎকার করে বলল, — "এখানে কেও কি জীবিত আছে?" এবং অন্যরা তাদের লাঠি ও বন্দুক দিয়ে খুঁজতে শুরু করল, ওই স্তূপের মধ্যে কোনো জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। একজন চিৎকার করে বলল, "ওই দেহটার মধ্যে একটা হাতঘড়ি আছে' এবং আমার বাবার আঙ্গুলগুলোতে তার বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করল। বাবা আমাদের বলতেন পরিধেয় হাতঘড়ির নীচে হাতের তালুকে পুরোপুরি সোজা রাখা তার কাছে কতটা কষ্টদায়ক ছিল। যে-কোনো ভাবেই হোক কয়েক সেকেণ্ড তিনি সহ্য করেছিলেন যতক্ষণ না একজন বলে উঠল, — ও এটি তো একটি ঘড়িমাত্র। এসো, আমরা চলে যাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। আব্বাজীর জন্য সৌভাগ্য, তারা চলে গেল এবং আমার বাবা সারারাত্র সেখানে শুয়ে থাকল জীবন বাঁচানোর জন্য। পরদিন ভোর থেকে দৌড়াতে আরম্ভ করল এবং থামল না কোনো জায়গাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিয়ালকোট পৌঁছল।

"আমি তোমাকে সাহায্য করছি কারণ হিন্দুমাতা আমার বাবাকে সাহায্য করেছিলেন। আমি সাধারণভাবে আমার বাবার ঋণ শোধ করছি।

"আমি বলেছিলাম আমি হিন্দু নই" আমি একজন শিখ পরিবারের লোক, বড়ো জোর একজন মিশ্র হিন্দু-শিখ।"

"আমি জানি না নিশ্চিত করে তোমার ধর্ম কী? তুমি চুল কাটো না এবং তুমি মুসলমান নয়। তাই তুমি আমার কাছে একজন হিন্দু এবং আমি তোমার জন্য সামান্য কিছু করছি কারণ একজন হিন্দু মা আমার বাবাকে বাঁচিয়েছিল।"

উৎস 2

বেশ কয়েক বছর ধরে আমি কোনো পাঞ্জাবি মুসলমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করিনি।

গবেষক এর দ্বিতীয় গল্পটি হল, লাহোরে একটি যুব হোস্টেলের ম্যানেজার সম্পর্কে।

আমি হোস্টেলে গিয়ে থাকার জায়গা খুঁজছিলাম এবং শীঘ্রই আমি আমার নাগরিকত্ব ঘোষণা করেছিলাম, ম্যানেজার বললেন, "আপনি ভারতীয় সুতরাং আমি আপনাকে থাকার জন্য কোনো ঘর দিতে পারি না। কিন্তু আমি আপনাকে চা পান করাতে এবং গল্প শোনাতে পারি।" — আমি এই ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। ম্যানেজার বলতে শুরু করলেন, "1950-এর দশকের গোড়ার দিকে আমি দিল্লিতে কর্মরত ছিলাম" আমি সব শুনতেছিলাম :

"আমি পাকিস্থানী দূতাবাসে করণিকের কাজ করেছিলাম এবং আমার এবং লাহোরি বন্ধু তার এক পূর্ব প্রতিবেশীকে একটি রুক্কা (চিরকুট) দেওয়ার কথা আমাকে বলে। যে এখন দিল্লির পাহাড়গঞ্জে বসবাস করে, তাকে একদিন আমি বাইসাইকেল চড়ে পাহাড়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিলাম এবং যখন কেন্দ্রীয় সচিবালয়-এর পাশের ক্যাথিড্রাল চার্চ অতিক্রম করছি তখন একজন শিখ সাইকেল আরোহীকে পাঞ্জাবি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, "সর্দার জী পাহাড় গঞ্জের রাস্তা কোন্ দিকে, অনুগ্রহ করে বলবেন?"

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি শরণার্থী?"

"না, আমি লাহোর থেকে এসেছি, আমার নাম ইকবাল আহমেদ।'

"ইকবাল আহমেদ ... লাহোর থেকে? থামুন!"

"ওই থামুন!" আমার কাছে একটি কর্কশ আদেশের মতো মনে হল এবং তৎক্ষণাৎ আমি অনুভব করলাম এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়া উচিত। এই শিখ আমাকে শেষ করবে। কিন্তু পলায়ন করা সম্ভব নয় বলে আমি থামলাম। বলিষ্ঠ শিখ লোকটি আমার দিকে দৌড়ে এলো এবং আমাকে জড়িয়ে আলিঙ্গান করল, জল ভরা চোখে সে আমাকে বলল, বেশ কয়েক বৎসর হয়ে গেল কোনো পাঞ্জাবি মুসলমানের সঙ্গো আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমি এরকম একজনের সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আপনি এখানে কোনো পাঞ্জাবি ভাষী মুসলমান খুঁজে পাবেন না।

চিত্র 14.3
1 কোটিরও বেশি মানুষ তাদের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল।

উৎস 3

"না, না! তুমি কখনোই আমাদের হতে পার না"

গবেষকের তৃতীয় গল্পটি হল :

স্পষ্টভাবে এখনো আমার মনে পড়ে 1992 সালে লাহোরে একজন মানুষের সঙ্গো আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে ভুল করে বিদেশে পড়াশোনা করা পাকিস্থানী বলে ভেবেছিলেন। কোনোও কারণে তিনি আমাকে পছন্দ করেছেন। পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি আমাকে জাতীর সেবা করতে দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান। আমি তাকে বলেছি, আমি তাই করব। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর যখন আমি বললাম, আমি ভারতীয় নাগরিক। তখন হঠাৎ তার সুর বদলে যায় এবং যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত করলেও তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে

" ও ভারতীয়! আমি ভেবেছিলাম আপনি পাকিস্থানী।"

আমি তাকে প্রভাবিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং আমি সব সময় নিজেকে দক্ষিণ এশীয় লোক বলে মনে করি। না, না! আপনি কখনোই আমাদের লোক হতে পারেন না, আপনাদের লোকেরা 1947 সালে আমার পুরো গ্রামটি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, আমরা শপথ করা শত্রু এবং সর্বদা তাই থাকব।"

➲

(1) এই তথ্যসূত্রগুলোর প্রত্যেকটি একে অপরের সাথে কথা বলা মানুষদের মনোভাব সম্পর্কে কী ধারণা দেয়?

(2) বিভাজনের বিষয়ে মানুষের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে এই গল্পগুলো কী ধারণা প্রকাশ করে বলে তুমি মনে করো?

(3) কীভাবে মানুষেরা নিজেদেরকে এবং একে অপরকে শনাক্ত করেছিল?

➲ আলোচনা করো...

বিভাজন সম্পর্কে লেখার ক্ষেত্রে এই গল্পগুলোর গুরুত্ব মূল্যায়ণ কর।

2. ঘটনার ঐতিহাসিক মোড় (A Momentous Marker)

2.1 দেশ বিভাজন ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ?

বর্ণনাগুলো কেবল বিস্তৃত হিংসার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছিল যা বিভাজনকে চিহ্নিত করে, কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং অসংখ্য নারী ধর্ষিত ও অপহরিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে এবং বিদেশে শরণার্থীতে পরিণত হয়। হতাহতের সঠিক অনুমান করা সম্ভব নয়; পণ্ডিতদের অনুমান অনুসারে হতাহতের সংখ্যা 200,000 থেকে 500,000 এর মধ্যে হতে পারে। সম্ভবত, প্রায় 15 মিলিয়ন ভারতীয় এবং পাকিস্থানীকে তড়িঘড়ি নির্মিত সীমান্ত অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল। যখন তারা এই "ছায়া রেখা" অতিক্রম করে, হোঁচট খায় : আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরবর্তী দুদিন পর্যন্ত দুই দেশের সীমারেখা সরকারিভাবে নির্ধারিত হয়নি, — তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হারাতে হল এবং তাদের বেশির ভাগ অস্থাবর সম্পদ, পাশাপাশি তাদের অনেক আত্মীয় এবং বন্ধুদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের ভিটে মাটি থেকে, তাদের বাড়ি থেকে, জমিজমা এবং ভাগ্য থেকে,

চিত্র 14.4
1947 সালে গরুর গাড়িতে করে পরিবার এবং জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে দেশত্যাগ।

তাদের শৈশব স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এইভাবে তাদের স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই তারা প্রথম থেকেই নতুনভাবে তাদের জীবন সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হয়েছিল।

এটি কি কেবল একটি বিভাজন অথবা কম-বেশি সুশৃঙ্খল সাংবিধানিক ব্যবস্থা, নাকি অঞ্চল ও সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা ছিল? অথবা এটিকে ষোলমাস ব্যাপি গৃহযুদ্ধ বলা উচিত। উভয়পক্ষেই সুসংগঠিত বাহিনী ছিল, একে অপরকে শত্রু হিসাবে নিশ্চিহ্ন করে সামগ্রিকভাবে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হয়েছিল? যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা প্রায়শই 1947 সালকে অন্যভাবে যেমন-মার্শাল-ল (সামরিক আইন) 'মারামারি' (হত্যা) এবং রুলা বা হুলার (অশান্তি, গোলযোগ, গণ্ডগোল) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করত। দেশবিভাগের ফলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদিকে সমসাময়িক পণ্ডিতরা অনেক সময় বিপর্যয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যার প্রাথমিক অর্থ হল ধ্বংস বা গণহারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড।

এই আচরণগুলো কি সঠিক ছিল?

তোমরা অবশ্যই নবম শ্রেণিতে নাৎসিদের আমলে জার্মানিতে সংঘটিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পড়েছ? হোলোকাস্ট শব্দটির মধ্য দিয়ে 1947-এ ভারতীয় উপমহাদেশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি কিছুটা অনুমান করা যায় যা দেশ বিভাগ শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় না। দেশ বিভাগ কেন আমাদের সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, জার্মানির "হোলোকাস্ট" শব্দটির মাধ্যমে তা প্রতীয়মান হয়। তবুও এই দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্যগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। 1947-48 সালে উপমহাদেশে রাষ্ট্রশক্তির উদ্যোগে জনগণকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি, যেমনটি জার্মানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের নানারকম আধুনিক কৌশল ও সংগঠনকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভাজনকে চিহ্নিতকারী "জাতিগত পরিশুদ্ধিকরণ" ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্ব-ঘোষিত নেতাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে, এতে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা ছিল না।

2.2 চিরাচরিত ধারণার প্রভাব

পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষী এবং ভারতে পাকিস্তান বিদ্বেষীদের সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো কিছু লোক ভুল করে বিশ্বাস করেন যে ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানিদের প্রতি অনুগত। ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে তাদের অতিরাষ্টিক মনোভাবের এবং ইসলামের প্রতি অতি আনুগত্যের যে চিরাচরিত ধারণা, তার সঙ্গে অন্য আরো কিছু আপত্তিকর ধারণাও যুক্ত হয়। যেমন-মুসলমানরা নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ, অপরিষ্কার, হানাদারদের বংশধর, সেখানে হিন্দুরা বিনয়ী-উদার, খাঁটি এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সন্তান। সাংবাদিক আর-এম, মুরফি দেখিয়েছেন যে একই ধরনের বিশ্বাস পাকিস্তানেও দেখা যায়। তাঁর মতে, কিছু পাকিস্তানী মনে করে যে, মুসলমানরা সৎ, সাহসী, একেশ্বরবাদী এবং মাংস

ভক্ষনকারী, যদিও হিন্দুরা অসৎ, কাপুরুষ, বহুদেবতায় বিশ্বাসী ও নিরামিষ ভোজী, এই ধরনের কিছু ধারণা দেশ বিভাগের পূর্ব থেকেই জনগণ পোষণ করলেও নিঃসন্দেহে 1947-এ সংঘটিত ঘটনাগুলো এই ধারণার ভিতকে আরও শক্তিশালী করেছে। ঐতিহাসিকরা এই ধরনের কল্পনাপ্রসূত ধারণার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু উভয় দেশে ঘৃণার মনোভাব প্রশমিত হয়নি।

দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট হওয়া স্মৃতি, ঘৃণা, ধারণা এবং পরিচিতি আজও সীমান্তের দুপাশে বসবাসকারীদের ইতিহাসকে প্রভাবিত করছে। আন্তঃসম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব চলাকালীন এই ঘৃণার মনোভাব প্রকাশিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতগুলো অতীতের সহিংসার স্মৃতিগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বিভাজনের সহিংসতার ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভাজনকে আরও গভীরভাবে বর্ণনা করেছে, যা মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগকে দৃঢ় করে, হিন্দু, শিখ এবং মুসলমান, সম্প্রদায়ের মনে বদ্ধ ধারণা তৈরি হয় যে, তারা পরস্পর বিরোধী স্বার্থ সমন্বিত সম্পূর্ণ পৃথক জাতিগোষ্ঠী।

দেশ বিভাগজনিত প্রাপ্তি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেই সময়ের পরস্পর বিরোধী স্মৃতির উপর ভিত্তি করে উভয় সম্প্রদায়ের মানসিকতা গড়ে উঠে।

➲ আলোচনা করো...

তোমার জানা দেশ বিভাগ সংক্রান্ত কোনো ঘটনা স্মরণ করো। বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে কীভাবে তোমার ধারণা গড়ে তোলে। চেষ্টা কর এবং কল্পনা কর, একই ঘটনা কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্ণনা করবে।

চিত্র 14.5
শারীরিকভাবে যা বহন করতে পারে কেবল তাহাই জনগণ তাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছে। বাস্তুচ্যুত কথার অর্থ, ব্যাপক ক্ষতি, বহু প্রজন্ম ধরে তারা যে জায়গাতে বাস করছিল তার সাথে বিচ্ছেদ।

3. কেন এবং কীভাবে বিভাজন ঘটেছে? (WHY AND HOW DID PARTITION HAPPEN)

3.1 একটি দীর্ঘ ইতিহাসের চূড়ান্ত মতামত?

ভারত ও পাকিস্তানের কিছু ঐতিহাসিকের মতে, উপনিবেশিক ভারতে হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি সত্ত্বা বলে মহম্মদ আলি জিন্নার যে তত্ত্ব, এর শিকড় মধ্যযুগের ইতিহাসে নিহিত। 1947 সালের সংগঠিত ঘটনাবলির সাথে মধ্যযুগ ও আধুনিককালের হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের যে দীর্ঘ ইতিহাস তার যোগাযোগ আছে বলে তারা মনে করেন। পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিগুলো যে, জনগণের ভাবনা চিন্তাকে প্রভাবিত করে এটাও তারা স্বীকার করে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয় - তারই চূড়ান্ত পরিণতি হল এই দেশ বিভাগ। তারা মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা 1909 খ্রিঃ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং 1919 খ্রিঃ সম্প্রসারিত করা হয় যা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে জটিল করে তোলে। পৃথক গণভোটের অর্থ হল, মুসলমানরা এখন থেকে নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে। এটি রাজনৈতিক নেতাদের এই ব্যবস্থায় কাজ করার জন্য প্রলোভিত করে তাদের পক্ষে সমর্থন আদায় করে এবং তারা গোষ্ঠীগত দাবি-দাওয়া তুলে ধরার জন্য নিজেদের ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে, অনুগত শ্রেণি তৈরি করার নীতি গ্রহণ করে। এইভাবে ধর্মীয় পরিচয়গুলো আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি কার্যকরি রূপ পেল এবং নির্বাচনী রাজনীতি এইগুলোকে আরও গভীর ও দৃঢ়তর করে তুলে। সাম্প্রদায়িক পরিচিতি শুধুমাত্র ধর্ম ও বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতো না, এই পরিচয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয় বিরোধীতা ও শত্রুতার ইঙ্গিত বহন করত। তথাপি পৃথক নির্বাচনীক্ষেত্র ভারতীয় রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাই এই তাৎপর্যকে আমাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত। অথবা আমরা দেশ বিভাগের এই ব্যবস্থার পরিণতি বলেও বর্ণনা করব না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সংঘটিত নানা ঘটনাবলি সাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে দৃঢ়তর করে। 1920 এবং1930-এর দশকের গোড়ার দিকে নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল, মসজিদের সামনে সংগীত, গো-সুরক্ষা আন্দোলন নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য আর্য সমাজের প্রবর্তিত শুদ্ধি প্রক্রিয়া ইত্যাদি মুসলমানদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াল। 1923-এর পর তাবলিগ (Tabligh) (প্রচার) এবং

লক্ষ্ণৌ চুক্তি

1916 সালের ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত লক্ষ্ণৌ চুক্তিটি ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে একটি সমঝোতা (ইউ-পির-তরুণ দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) যার মাধ্যমে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রস্তাব মেনে নেয়। চুক্তিটি মূলত নরমপন্থী, চরমপন্থী ও মুসলিম লিগের জন্য একটি যৌথ রাজনৈতিক মঞ্চের অংশীদার হয়ে উঠে।

আর্য সমাজ

ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে বিশেষভাবে পাঞ্জাবে সক্রিয় একটি হিন্দু সংস্কার পন্থি সংগঠন যা বৈদিক শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষার সাথে এর মেল বন্ধন ঘটাতে চেয়েছে।

মসজিদের সম্মুখে সংগীত : মসজিদে নামাজের সময় অন্য সম্প্রদায়ের আয়োজিত সংগীত সহ বাজানো হিন্দু-মুসলমানদের সহিংসতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানরা মনে করতেন এইসব তাদের আল্লার সঙ্গো শান্তিপূর্ণ যোগাযোগের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

তামজিম (Tanzim) (সংগঠনের) দ্রুত বিস্তার লাভ হিন্দুদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচারকরা এবং সাম্প্রদায়িক কর্মীরা অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে প্ররোচিত করার মাধ্যমে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করে ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিভেদকে আরো গভীরতর করে এবং হিংসার দুঃখজনক স্মৃতি তৈরি করে।

তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র উত্তেজনার ফলশ্রুতিতে দেশ বিভাগের মতো ঘটনা ঘটেছিল, তা ভাবলে ভুল হবে। দেশ বিভাজন সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্র “গরম হাওয়া” তে নায়কের উক্তি — “আগেও সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছে তবে এটি কখনো তাদের বাড়িঘর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে পারেনি”, পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে দেশ বিভাজন ছিল বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা এবং এটি বুঝতে আমাদের ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকের সংঘটিত ঘটনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িকতা কি ? (What is communalism?)

আমাদের পরিচয়ের অনেক দিক রয়েছে। আমরা মেয়ে বা ছেলে, তোমরা সবাই যুবক, যুবতী, তোমরা কোনো নির্দিষ্ট গ্রাম, শহর, জেলা বা একটি রাজ্যে বসবাস কর অথবা একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বল। তোমরা ভারতীয় কিন্তু বিশ্বেরও নাগরিক। আয়ের পরিমাণ এক এক পরিবারে এক এক রকম, তাই তোমরা সকলেই কোনো না কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণির অর্ন্তগত। আমাদের বেশীর ভাগেরই একটি ধর্ম রয়েছে এবং বর্ণ আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায় আমাদের পরিচিতির অসংখ্য জটিল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময় বিশেষে জনগণ পরিচিতির কোনো বিশেষ দিক যেমন ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এই ভাবনাকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

একতাবদ্ধ করার রাজনীতিই হল সাম্প্রদায়িকতা। এই রাজনীতিতে ধর্মীয় পরিচয়কে মৌলিক এবং স্থায়ী বলে মনে করা হয়। জনগণ এই পরিচিতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল এবং এই সমস্ত পরিচিতি বহু বছরের ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেনি — এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করে ধর্মীয় পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা করা এবং একে স্বাভাবিক বলে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়। একটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতা এর অন্তর্গত বিভেদকে লুকিয়ে রাখে এবং অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দেয়।

সাম্প্রদায়িকতা একটি চিহ্নিত অন্যপক্ষ তারা যেমন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঘৃণার রাজনীতি পোষণ করে বলে বলা যায়। এই ঘৃণা থেকে হিংসার রাজনীতি পুষ্ট হয়।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পরিচিতি ও আদর্শের যে বিশেষ ধরনের রাজনীতিকরণ, তাকে সাম্প্রাদায়িকতা বলা যেতে পারে। বহুধর্মীয় দেশের ক্ষেত্রে “ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ” শব্দটি একই অর্থ বহন করে। এই জাতীয় একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে একটি জাতি হিসাবে দেখার যে-কোনো প্রচেষ্টার অর্থ হল অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করা।

3.2 1937 সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

1937 সালে প্রথমবারের মতো প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনসংখ্যার শুধুমাত্র 10 থেকে 12 শতাংশ লোক ভোটদানের অধিকার ভোগ করেন। কংগ্রেস নির্বাচনে এগারোটি প্রদেশের মধ্যে পাঁচটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং এর মধ্যে সাতটিতে সরকার গঠন করে। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলোতে কংগ্রেস ভালো ফল করতে সমর্থ হয়নি। মুসলিম লিগও আশানুরূপ ফলাফল করতে অসমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সমগ্র মুসলিম ভোটের মাত্র 4.4 শতাংশ ভোট তাদের পক্ষে যায়। লিগ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (NWFP) একটি আসনও লাভ করতে পারেনি এবং পাঞ্জাবের 84টি সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দুটিতে এবং সিন্ধু প্রদেশের 33টির মধ্যে তিনটি আসন লাভ করে।

যুক্ত প্রদেশে মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সাথে যৌথভাবে সরকার গঠন করতে চায়। কংগ্রেস সে প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় লিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কোনো কোনো পণ্ডিত মত পোষণ করেন যে, প্রত্যাখানের ফলে লিগ পন্থিদের মনে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, ভারত যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তা হলে সংখ্যালঘুদের পক্ষে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। লিগ অনুমান করেছিল যে, কেবলমাত্র একটি মুসলিম দলই মুসলিম স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে কারণ কংগ্রেস মূলত হিন্দুদের দল। কিন্তু জিন্না যেভাবে লিগকে মুসলমানদের একমাত্র “মুখপাত্র” বলে প্রতিষ্ঠিত করার গোঁ ধরেছিলেন, খুব কম সংখ্যক লোকই সেই সময় তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুক্ত প্রদেশগুলো, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও লিগের জন্য সামাজিক সমর্থন তখনও তিনটি প্রদেশের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বল ছিল। কিন্তু সেখান থেকে মাত্র দশ বছর পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল। এইদিকে বাংলাদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাব, এমনকি সিন্ধু প্রদেশেও মুসলিম লিগ সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। এই সময় থেকে জিন্না জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তার প্রয়াস দ্বিগুণ আকারে বাড়িয়ে দেয়।

দুইদলের মধ্যে মত পার্থক্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্ত্রিসভারও ভূমিকা ছিল। সেইজন্য যুক্ত প্রদেশে এই দলটি জোট সরকারে থাকা মুসলিম লিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, কারণ লিগ জমিদার প্রথাকে সমর্থন করে। কংগ্রেস বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল, যদিও বাস্তবে কংগ্রেস তখন পর্যন্ত এই প্রথার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস কর্তৃক গ্রহণ করা ‘মুসলিম গণসংযোগ’ প্রকল্প ও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এমন কি কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ এবং উগ্র বক্তব্য মুসলমান জনগণের মন জয় করতে পারেনি, বরং রক্ষণশীল মুসলমানও জমিদার শ্রেণির মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিল। তদুপরি, 1930-এর শেষের দিকে

মুসলিম লিগ

প্রাথমিকভাবে 1906 সালে ঢাকায় মুসলিম লিগ গঠিত হয়। শীঘ্র এটি উত্তর প্রদেশের অভিজাত মুসলিমদের দ্বারা গৃহীত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম অধ্যুষিত অংশের জন্য স্বায়ত্ব শাসন দাবি করে এবং 1940 দশকে পাকিস্তানের দাবি তুলে।

হিন্দু মহাসভা

1915 সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা একটি হিন্দুবাদী দল, যার কার্যকলাপ উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা জাতিগুলোর বিভেদ ভুলে হিন্দু সমাজকে একতাবদ্ধ করতে চায়। হিন্দু পরিচয়কে মুসলিম পরিচিতির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতৃবৃন্দ ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর আগের থেকেও বেশি জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু দলের নিচু স্তরের, এমন কি কিছুক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্ত্রীরাও এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, মৌলানা আজাদ 1937 সালে বলেন যে, তখন কংগ্রেসের সদস্যদের লিগে যোগ দিতে বাধা দেওয়া হত। তবুও কংগ্রেসের লোকেরা অন্তত কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলোতে (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে) হিন্দু মহাসভার সক্রিয় কর্মী ছিল। কেবলমাত্র 1938 সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করেছিল যে কংগ্রেস সদস্যরা হিন্দু মহাসভার সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। ঘটনাচক্রে এই সময়েই হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর.এস.এস.) শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এরপরে 1930-এর দশকে সংঘ নাগপুরকে মূলকেন্দ্র করে যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। 1940-এর মধ্যে আর.এস.এস. এক লক্ষেরও বেশি প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কর্মী গড়ে তুলেছিল, যারা ভারতকে হিন্দুদের ভূমি বলে মনে করতো।

সংঘ — আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় এটি কেন্দ্রীয়ভাবে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী স্বায়ত্ব শাসিত এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটি ইউনিয়নকে বোঝায়।

3.3 পাকিস্তান প্রস্তাব

পাকিস্তানের দাবি সংঘটিত আকার ধারণ করে। 1940 সালের 23 মার্চ লিগ উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর জন্য স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা করার দাবিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই অস্পষ্ট প্রস্তাবটিতে দেশ বিভাজন বা পাকিস্তান সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না। পাঞ্জাব প্রিমিয়ার এবং ইউনিউনিস্ট দলের নেতা সিকান্দার হায়াত খান এই প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করেন। 1941 সালের 1 মার্চ পাঞ্জাব বিধানসভার এক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন পাকিস্তানের বিরোধিতা করেন যেখানে স্থান ভেদে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা এবং বাকি সমস্ত জায়গায় হিন্দু শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকবে যদিও পাকিস্তান অর্থে পাঞ্জাবে খাঁটি মুসলিম রাজত্ব বুঝায়, তবে তাতে আমার সম্মতি নেই। তিনি অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য কিছু পরিমাণ স্বাধীকার সহ একটি যুক্তরাজ্য গঠনের প্রস্তাব একাধিক বার তুলে ধরেন।

পাকিস্তান দাবির সূত্রপাত করেন "সারে জাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" — কবিতার রচয়িতা উর্দু কবি মোহম্মদ ইকবাল। 1930 সালে মুসলিম লিগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ইকবাল "উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাজ্য" গঠনের প্রয়োজনের কথা বলেন, ইকবাল অবশ্য সেই ভাষণে একটি নতুন রাষ্ট্রের উত্থানের কথা কল্পনা করেন নি, বরং ভারতীয় যুক্ত রাজ্য ব্যবস্থার মধ্যে থেকে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলোকে স্ব-শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার ভাবনাও তার চিন্তা ধারায় স্থান পেয়েছে।

'পাকিস্তান' নামাকরণ

পাকিস্তান অথবা পাকস্তান শব্দটি এসেছে, পাঞ্জাব, আফগান, কাশ্মীর সিন্ধু এবং বালুচিস্থান থেকে। ক্যামব্রিজের মুসলমান শিক্ষার্থী চৌধুরী রহমন আলি 1933 ও 1935 সালে লিখিত বিভিন্ন পুস্তিকাতে প্রকাশ করে এবং এই নতুন পরিচয় সম্পূর্ণ এলাকার জন্য পৃথক জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 1930-এর দশকে রহমত আলীর ভাবনাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লিগ এবং অন্যান্য মুসলিম নেতারা তাঁর ধারণাটিকে এক তরুণ ছাত্রের স্বপ্ন বলে ধরে নিয়েছেন।

3.4 বিভাজনের আকস্মিকতা

আমরা দেখেছি যে, 1940 সালে লিগের সুনির্দিষ্ট কোনো দাবি ছিল না। লিগের পক্ষ থেকে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য কিছু স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং দেশ বিভাগ সংগঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত কম, মাত্র সাত বছর। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে এবং ভবিষ্যতে জনগণের জীবন যাত্রার উপর তার কী প্রভাব পড়তে পারে সে সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল না। 1947 সালে যারা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন সেই উদ্বাস্তুদের ধারণা ছিল সাময়িক অশান্তির পর শান্তি ফিরে এলেই তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে সক্ষম হবেন।

প্রথম দিকে জিন্নার কাছেও পাকিস্তান প্রস্তাবটি দাবি আদায়ের জন্য সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছে — একদিকে যেমন এই প্রস্তাব উত্থাপন করে কংগ্রেসকে নানা সুযোগ সুবিধা দান থেকে ব্রিটিশকে বিরত রাখা যাবে, অন্যদিকে মুসলমানদের পক্ষে বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য এই প্রস্তাবকে ব্যবহার করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রদান সংক্রান্ত আলোচনার কিছু সময় বিলম্বিত হয়। 1942 সালে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন চরম দমন মূলক নীতি প্রয়োগ করেও আন্দোলনকারীদের নিবৃত্ত করা যায়নি এবং এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এই দেশের ক্ষমতার হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

3.5 যুদ্ধোত্তর ঘটনাবলি

1945 সালে আবার যখন আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশরা পূর্ণ স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভাইসরয় ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদ ছাড়া একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হয়। এরই মধ্যে জিন্নার কারণে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা ভেঙে যায়, কারণ জিন্না দাবি করেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সমস্ত মুসলমান সদস্য মনোনয়ন করার ব্যাপারে লিগের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং কার্য নির্বাহী পরিষদে একটি সাম্প্রদায়িক ভেটো প্রথা থাকবে যার ফলে মুসলমানদের বিরোধিতা করার যে-কোনো প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে লিগের প্রথম দাবিটি ছিল অস্বাভাবিক, কারণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন (আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মৌলানা আজাদ) এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে ইউনিয়নবাদী দলের সদস্যরা বেশির ভাগ মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন।

উৎস 4

1940 খ্রিঃ মুসলিম লিগ-এর প্রস্তাব

1940 সালে লিগ তাদের প্রস্তাবের স্বপক্ষে দাবি করেছিল যে ভৌগোলিকভাবে নিকটস্থ অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করা হোক। যা তৈরি করতে প্রয়োজনে অঞ্চলগুলোর পুনর্গঠন করতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থানগত নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যকে একত্রিত করে স্বাধীন রাজ্য ঘটিত হবে এবং রাজ্যগুলোতে স্ব-শাসন ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

➲ লিগ কী দাবি করেছিল? তারা কি আজকের পাকিস্তান দাবি করেছিলেন?

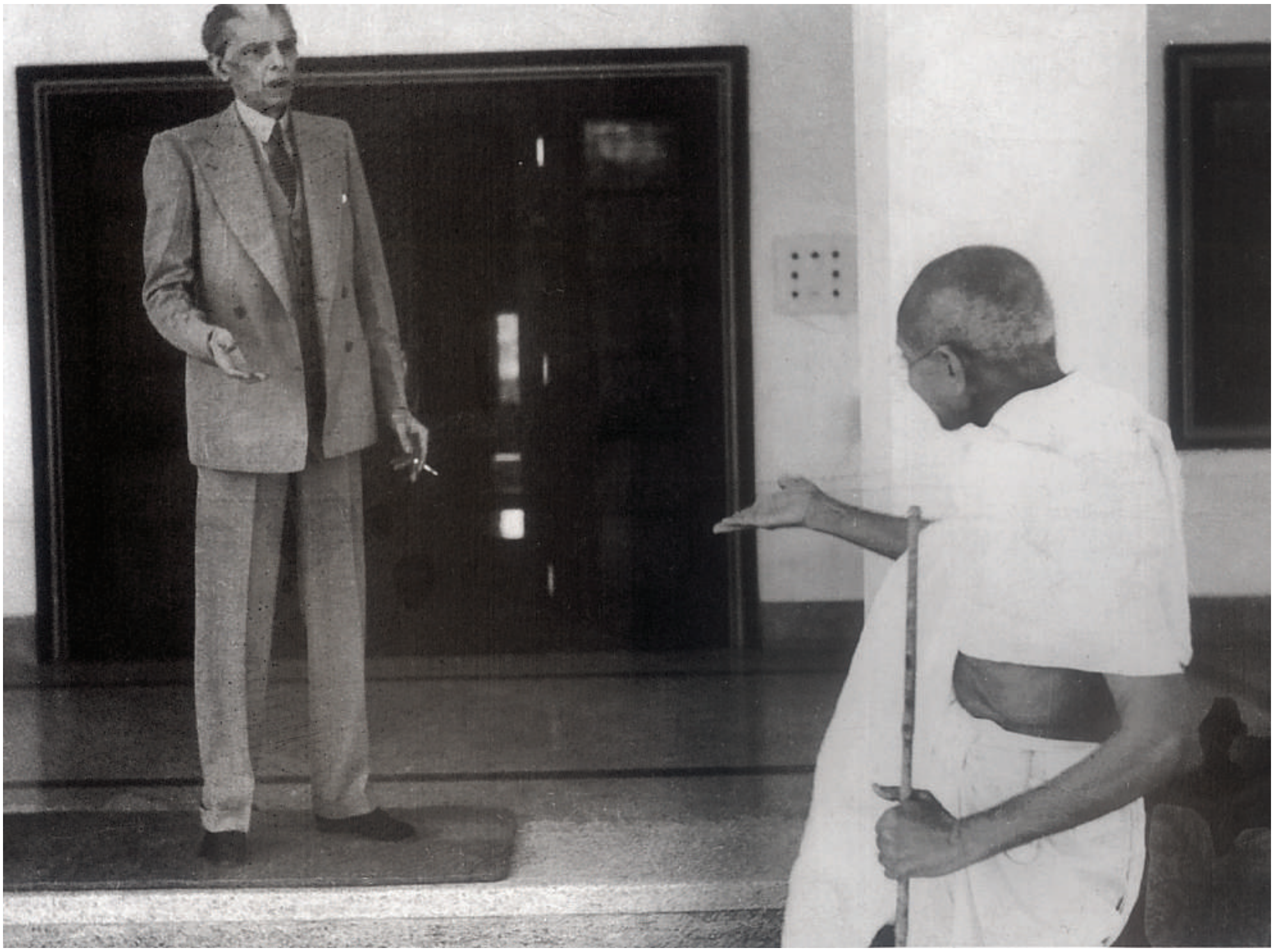

চিত্র 14.6
1939 সালের নভেম্বরে ভাইসরয়ের সাথে বৈঠকের আগে মহাত্মা গান্ধি ও মোহম্মদ আলি জিন্না।

পাঞ্জাব সরকারকে নিয়ন্ত্রণকারী এবং ধারাবাহিকভাবে ব্রিটিশদের অনুগত থাকা ইউনিয়নবাদীদের কোনো রকম বিরক্ত করার ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না।

1946 সালে আবার প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলোতে 91.3 শতাংশ অমুসলমান ভোট পেয়ে বিপুলভাবে জয় লাভ করেন। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রগুলোতেও লিগ সাফল্য লাভ করে। 30টি সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রে 86.6 শতাংশ ভোট পায় এবং প্রাদেশিক 509টি আসনের মধ্যে 442টি আসনে লিগ জয়লাভ করে। সুতরাং, 1946 সালের লিগ মুসলিম ভোটদাতাদের কাছে নিজেদেরকে প্রভাবশালী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র “মুখপাত্র” হিসাবে নিজেদের দাবি করেন। কিন্তু তোমরা মনে রাখবে সে সময়ে ভোটদান ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রায় 10 থেকে 12 শতাংশ জনগণ প্রাদেশিক নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের মাত্র এক শতাংশ।

ইউনিয়নবাদী দল

পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলিম ও শিখ-জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক দল। বিশেষত দলটি 1923-47 সময়কাল পর্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল।

3.6 বিভাজনের সম্ভাব্য বিকল্প

1946 সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা লিগের সদস্যদের দাবি যাচাই করতে এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক কাঠামোর পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিন সদস্যের একটি মিশন দিল্লিতে প্রেরণ করে। মন্ত্রী মিশন তিন মাস ধরে দেশ সফর করেছিল এবং একটি তিন স্তরের ঢিলে ঢালা সংঘের সুপারিশ করেছিল। ভারত ঐক্যবদ্ধই থাকবে, এটি ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবলমাত্র বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা এবং বিদ্যমান প্রাদেশিক সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে গণপরিষদ নির্বাচন করা-'এ' বিভাগ ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের জন্য; 'বি' এবং 'সি' বিভাগ যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব (সাথে আসাম) মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। প্রদেশগুলোর বিভাগ বা গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন আঞ্চলিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যবর্তী স্তরের নির্বাহী ও আইনসভাগুলো স্থাপনের ক্ষমতা থাকবে।

শুরুতে সমস্ত প্রধান দলগুলো এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু চুক্তিটি স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, কারণ এই পরিকল্পনাটি পারস্পরিক বিরোধী ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ছিল। লীগ চাইছিল গ্রুপটি বাধ্যতামূলক করা হোক। 'বি' এবং 'সি' বিভাগটি ভবিষ্যৎ ইউনিয়ন থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার সহ শক্তিশালী সত্তায় পরিণত হয়েছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে প্রদেশগুলোকে একটি দলে যোগদানের অধিকার দেওয়া হোক। প্রথমে জোট (গ্রুপিং) বাধ্যতামূলক হবে, মিশনের এই স্পষ্টিকরণের সাথে কংগ্রেস সন্তুষ্ট হতে পারে নি, তবে সংবিধান চূড়ান্ত হওয়ার পরে এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রদেশগুলোকে বহিষ্কার করার অধিকার থাকবে। শেষ পর্যন্ত, মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে লীগ এবং কংগ্রেস কেউই রাজি হয় নি। এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ছিল। কারণ এই বিভাজনের পরে মন্ত্রি মিশনের প্রস্তাবগুলো কমবেশি মেনে নেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠে। তাই বেশির ভাগ কংগ্রেস নেতারা দেশ বিভাজনে সম্মত হয়েছিল এবং এটাকে দুঃখজনক কিন্তু অনিবার্য হিসাবে দেখেছে। একমাত্র মহাত্মা গান্ধি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গফফর খান দেশ বিভাজনের ধারণাটির দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে চলেছিল।

Secede এর অর্থ কোনো সমিতি বা সংস্থা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য পদ প্রত্যাহার করা।

চিত্র 14.7
1938 -এর অক্টোবরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (NWFP) মহাত্মা গান্ধির সাথে খান আবদুল গফফর খান (যিনি সীমান্ত গান্ধি হিসাবে পরিচিত ছিলেন), সুশীলা নায়ার এবং আমতুস সালেম।

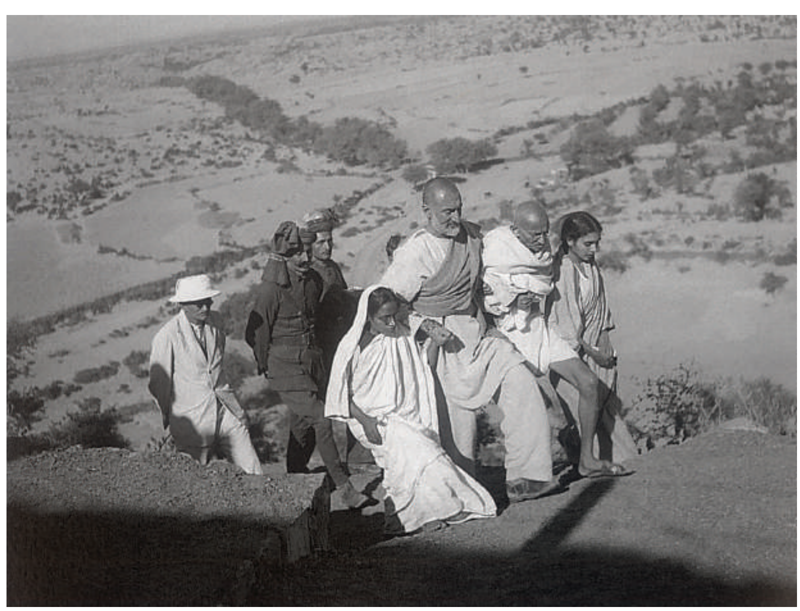

মানচিত্র 1
তিনটি বিভাগ সহ একটি ভারতীয় ফেডারেশনের জন্য মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব।

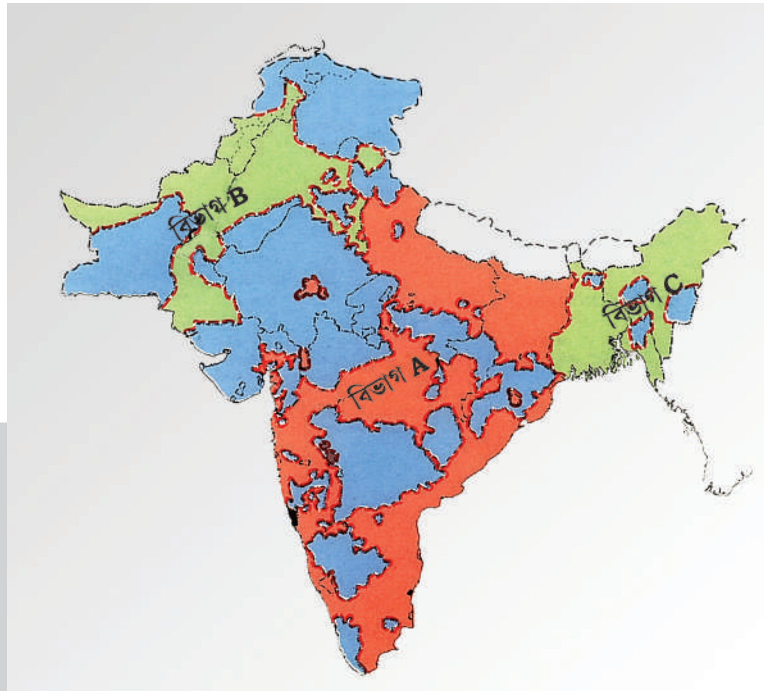

- *1941 সালে মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো*
- *1941 সালে হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলো*
- *রাজন্য শাসিত যেসব রাজ্যে মিশনের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে সরবরাহ করা হয়নি।*

উৎস 5

অরণ্য রোদন

মহাত্মা গান্ধি জানতেন তাঁর আবেদন ‘অরণ্য রোদনের মতো কিন্তু তবু তিনি দেশভাগের ধারণার বিরোধিতা করে চলেছিলেন।

কিন্তু কী এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আজ আমরা দেখি। আমি আশা করি সেই দিনটি আবার ফিরে আসুক যখন হিন্দু ও মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শ ব্যতিত কিছুই করবে না। “এই দিনটি তাড়াতাড়ি আসতে আমি কী করতে পারি” — এই প্রশ্নটি দিনরাত আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আমি লীগের কাছে আবেদন করেছি যেন কোনো ভারতীয়কে তারা শত্রু না মনে করে ...। হিন্দু এবং মুসলমানরা একই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের একই রক্ত, একই খাবার খায়, একই জল পান করে এবং একই ভাষায় কথা বলে।

প্রার্থনা সভার বক্তৃতা, 7 সেপ্টেম্বর 1946, CWMG, VOL. 92, পৃষ্ঠা 139

কিন্তু আমি দৃঢ়রূপে নিশ্চিত যে মুসলিম লীগ যেভাবে পাকিস্তানের দাবি পেশ করেছে তা ইসলামিক নয় এবং আমি এটাকে পাপ বলতে দ্বিধা করি না। ইসলাম মানবতার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, মানব পরিবারের একত্বকে ধ্বংস করেনি। সুতরাং, যারা ভারতকে সম্ভাব্য যুদ্ধ বিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে চান তারা হল ইসলাম ও ভারতের শত্রু। তারা আমাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে পারে তবে তারা আমাকে এমন কিছুতে সম্মতি করাতে পারবে না যা আমি ভুল বলে মনে করি।

হরিজন, 26 সেপ্টেম্বর 1946, CWMG, VOL. 92, পৃষ্ঠা 229

➲ পাকিস্তানের ধারণার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধি কী যুক্তি উপস্থাপন করেন?

চিত্র 14.8
কলিকাতার রাস্তায় লোহার রড ও লাঠি নিয়ে সশস্ত্র দাঙ্গাকারীরা। আগস্ট 1946

3.7 বিভাজনের দিকে

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি জয়ের জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লীগ ঘোষণা করেছিল 1946 সালের 16 আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন করা হবে। ওই দিন কলকাতায় দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল। কয়েক দিন এই দাঙ্গা স্থায়ী ছিল। বেশ কয়েক হাজার মানুষ এই দাঙ্গায় মারা গিয়েছিল। 1947 সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই হিংস্রাশ্রয়ী দাঙ্গা উত্তর ভারতের বেশ কিছু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

1947 সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতারা পাঞ্জাবকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য ভোট গ্রহণ করেন। একটি হল মুসলিম প্রধান অঞ্চল এবং অপরটি হল হিন্দু/শিখ প্রধান অঞ্চল এবং বাংলা বিভাগে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই সময় বিভাজন নিয়ে অনেক খেলা চলছিল। পাঞ্জাবের অনেক শিখ নেতা এবং কংগ্রেস নেতারা এই দুর্ভাগ্যজনক বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। অন্যথায় তারা (হিন্দু বা শিখরা) মুসলিম প্রাধান্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাবে নতুবা তাদের উপর মুসলিম নেতারা বিভিন্ন শর্ত চাপাবে। বাংলাদেশেও ভদ্রলোক বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ, যারা রাজনৈতিক শক্তি তাদের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন, তারা 'মুসলমানদের স্থায়ী অভিভাবকত্ব'কে (তাদের একজন নেতা ইহা দিয়েছিল) ভয় করতে শুরু করে। যেহেতু তারা একটি সংখ্যালঘু সংখ্যায় ছিলেন, তাই তারা অনুভব করেছিলেন যে কেবলমাত্র প্রদেশের বিভাজন (বিভাগ) তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারে।

➲ আলোচনা করো...

3 নং অনুচ্ছেদটি পড়ে বোঝা যায় যে, বিভাজনের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। এর মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো এবং কেন?

4. আইন শৃঙ্খলা প্রত্যাহার (The Withdrawal of Law and Order)

চিত্র 14.9
1946 সালের রক্ত ঝড়া মাসগুলোতে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।

1947 সালের মার্চ থেকে প্রায় এক বছর পর্যন্ত রক্তপাত অব্যাহত ছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পতন, পেণ্ডেরেল মুন যিনি সেই সময়ে বাহাওয়ালপুরে (বর্তমানে পাকিস্তান) প্রশাসক ছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন, 1947 সালের মার্চ মাসে অমৃতসরে অগ্নি সংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন পুলিশ কীভাবে একটি গুলি চালাতেও ব্যর্থ হয়েছিল।

1947 সালের শেষ দিকে যখন শহরে কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে তখন অমৃতসর জেলা রক্তপাতের দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা পরিস্থিতি কীভাবে পরিচালনা করবেন তা জানতেন না। তারা সিদ্ধান্ত নিতে যেমন অনিচ্ছুক ছিল। তেমনি হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। আতঙ্কিত মানুষ যখন সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল, ব্রিটিশ কর্মকর্তারা তাদের মহাত্মা গান্ধি, জওহর লাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল অথবা এম.এ. জিন্নার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। কেউ জানত না কে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। যখন ক্ষতিগ্রস্থ প্রদেশের অনেক ভারতীয় বেসামরিক কর্মচারীরা তাদের নিজের জীবন ও সম্পদের ভয়ে ভীত ছিলেন, তখন মহাত্মা গান্ধিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় দলগুলোর শীর্ষ নেতারা স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্রিটিশরা তখন ভারত ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

সমস্যাগুলো আরো জটিল হয়েছিল কারণ ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশরা হিন্দু, মুসলমান বা শিখ বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এই কাজে যোগ দিতে এসেছিল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে একই সৈন্যদলে যারা ছিল তাদের পেশা

উৎস 6

গুলি চালানো ছাড়া

মুন যা লিখেছিলেন —

চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দাঙ্গাকারী জনতারা নির্বিবাদে ও বিনা বাধায় এই বিশাল বাণিজ্যিক শহরটির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কোনো গুলি না চালিয়ে অদৃশ্য আগ্নেয় বোমার সাহায্যে সুন্দর বাজার গুলোকে (অর্থাৎ যারা বিরোধ চালিয়েছিল) মাটিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার (বৃহত্তর পুলিশ) বাহিনী নিয়ে শহরে অভিযান চালান এবং কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না করেই আবার অভিযান চালায়।

দায়িত্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যায়নি। অনেক স্থানে পুলিশরা কেবল তাদের সহধর্মবাদীদের সহায়তাই করেনি বরং তারা তাদের ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের আক্রমণও করেছিল।

4.1 মহাত্মা গান্ধি — একজন সৈনিক

এই সমস্ত অশান্তির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারে এক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ফল পেয়েছিল। 77 বছর বয়সী গান্ধীজি তাঁর আজীবন সংশ্লিষ্ট অহিংসার নীতিকে প্রতিপন্ন করার জন্য তার সমস্ত কিছু অংশীদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হতে পারে। তিনি পূর্ব বাংলার নোয়াখালির (বর্তমান বাংলাদেশ) গ্রাম থেকে বিহারের গ্রামে চলে এসেছিলেন এবং তারপরে কলকাতা এবং দিল্লির দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বস্তিতে এসেছিলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্ঠায় হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। সর্বত্র সতর্কতার সাথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। 1946 সালে অক্টোবরে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদেরকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে স্থির করেছিল। গান্ধিজী এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে গ্রামগুলো ভ্রমণ করেছিলেন এবং স্থানীয় মুসলমানদের হিন্দুদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। একইভাবে, দিল্লির মতো অন্যান্য জায়গায় তিনি হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের

চিত্র 14.10
নোয়াখালির গ্রামবাসিরা মহাত্মা গান্ধির আভাসের আশায়।

চিত্র 14.11
দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামের জনগণ গান্ধিজির উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছে।

মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। শহীদ আহমদ দেহলভী, দিল্লির একজন মুসলমান, তিনি উল্লেখ করেছেন নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য তারা কীভাবে পালিয়ে এসেছেন এবং পুরানো কিলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। 1947 সালের 9 ই সেপ্টেম্বর গান্ধিজি দিল্লিতে আসেন। তাঁর দিল্লির আগমনকে বিশেষত দীর্ঘ ও কঠোর গ্রীষ্মের পরে বৃষ্টিপাতের আগমনের সাথে তুলনা করেছেন। দেহলভী তাঁর স্মৃতি চারণে স্মরণ করেছিলেন যে, কীভাবে মুসলমানরা একে অপরকে বলেছিল "দিল্লি এখন রক্ষা পাবে।" / "দিল্লি এখন নিরাপদ হবে।"

1947 সালের 28 নভেম্বর গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে গান্ধিজি যখন সিসগঞ্জে গুরুরদ্বারে শিখদের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন তখন তিনি লক্ষ করলেন, পুরানো দিল্লির মূল কেন্দ্রে অবস্থিত চাঁদনীচক্ রাস্তায় একজন মুসলমানও নেই। ওই দিন সন্ধ্যায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন "এর থেকে লজ্জাকর আমাদের আর কী হতে পারে?" এটা ঘটনা যে চাঁদনীচকে একজন মুসলমানকেও পাওয়া যায়নি? যারা দিল্লি শহর থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে পাকিস্তানী হিসাবে দেখিয়ে তাদের বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতার সাথে লড়াই করে, গান্ধিজি দিল্লিতেই ছিলেন। তিনি যখন হৃদয়ে পরিবর্তন আনার জন্য অনশন শুরু করলেন, আশ্চর্যরূপে, বহু হিন্দু এবং শিখ অভিবাসী তাঁর সাথে অনশন করেছিলেন।

মৌওলানা আজাদ লিখেছেন, "অনশনের প্রভাব ছিল বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। লোকেরা শহরটিতে যে সহিংসতা চালিয়েছিলেন তার বোকামি তারা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে কেবল গান্ধিজির শাহাদাতই হিংসার এই নৃশংস নাটকটি অবশেষে শেষ হয়েছিল। "পৃথিবী বাস্তবিকই পরিবর্তন হয়েছে।" সেই সময়ের অনেক দিল্লির মুসলমান পরে তা স্মরণ করেছিলেন।

➲ আলোচনা করো...

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার সময় শান্তি বজায় রাখতে কী করেছিল? এবং সেই চেষ্টার সময় মহাত্মা গান্ধি কী করেছিলেন?

5. লিঙ্গ সচেতনতা ও দেশ বিভাজন (Gendering Partition)

5.1 মহিলাদের পুনরুদ্ধার করা

গত দেড় দশক ধরে ঐতিহাসিকরা দেশভাগের সময় সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যাচাই করেছেন। পণ্ডিতরা এই হিংসাত্মক সময়ে মহিলাদের ভয়ানক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন, নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল, অপহরণ করা হয়েছিল, বিক্রি করা হয়েছিল, প্রায়শই বহুবার অজানা পরিস্থিতিতে, অচেনা লোকের সাথে এক নতুন জীবনে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা যা করেছে তার দ্বারা সবাই গভীরভাবে আঘাত পেয়েছিল।

কেউ কেউ তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন পারিবারিক জীবনযাপন করতে শুরু করেছিল। তবে ভারত ও পাকিস্তান সরকারগুলো মানব সম্পর্কের জটিলতার প্রতি সংবেদনশীল ছিল না। মহিলাদের সীমান্তের অন্যদিকে থাকার কথা বিশ্বাস করে তারা এখন তাদের নুতন আত্মীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের পূর্বের পরিবারগুলোতে বা জায়গায় ফেরত পাঠিয়েছিল। তারা তাদের নিজের জীবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের সাথে পরামর্শ করেনি। একটি তথ্য অনুসারে 1954 সালের শেষের দিকে যে অভিযান তারা শেষ করেছিল তাতে ভারতে 22,000 মুসলিম মহিলা এবং পাকিস্তানের 8,000 হিন্দু ও শিখ মহিলা মোট 30,000 মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

চিত্র 14.12
মহিলারা তাদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর কথা শুনে একে অপরকে সান্ত্বনা দেয়। দাঙ্গার সহিংসতায় পুরুষরা বেশি সংখ্যায় মারা গিয়েছিলেন।

উৎস 7

মহিলা / নারী পুনরুদ্ধার কী ?

প্রকাশ ট্যান্ডন তাঁর আত্মজীবনীমূলক সামাজিক ইতিহাস ‘পাঞ্জাবী শতক’ এ উপনিবেশিক পাঞ্জাবের এক দম্পত্তির অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা/স্মরণ করেছেন:

> একটি উদাহরণ, দেশ বিভাগের সময় এক শিখ যুবক এক সুন্দরী মুসলিম মেয়েকে নিয়ে পলায়ন করতে গিয়ে এই গণ হত্যাকে প্ররোচিত করেছিল। তারা ধীরে ধীরে একে অপরের প্রতি প্রেমে পড়েছিল এবং বিয়ে করেছিল। ধীরে ধীরে তার বাবা মার স্মৃতি, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার আগের জীবন ম্লান হয়ে যায়। তারা একসাথে সুখী হয়েছিল এবং একটি ছোট্ট ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। শীঘ্রই, তবে সামাজিক কর্মীরা এবং পুলিশ, অপহরণ করা মহিলাদের পুনরুদ্ধার করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং এই দম্পতির সন্ধান করতে শুরু করে। তারা জলন্ধর জেলায় শিখদের বাড়ি তল্লাসী করেছিল। নবদম্পতি এই খবরটা পেয়েছিল এবং পরিবারটি খবর পেয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। সামাজিক কর্মীরা কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিল। এদিকে, দম্পতির বন্ধুরা আদালতের কাছ থেকে স্থগিতাদেশ পাওয়ার চেস্টা করেছিল কিন্তু আইনটি তার কঠোর পথ অবলম্বন করেছিল। পুলিশ তাদের ছায়াকেও ধরতে পারবে না, এই আশায় কলকাতা থেকে এই দম্পতি পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের কাছে তারা ধরা পড়ে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। তার স্ত্রী আবার প্রত্যাশা করছিলেন যে এখন তার সময় এগিয়ে আসছে। শিখ ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার স্ত্রীকে একটি আঁখের জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দুক নিয়ে গর্তে শুয়ে থাকার সময় সে তাকে যতটা পেরেছে ততটা আরামদায়ক করে তুলেছিলেন, তারা পুলিশদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি দৃঢ় সংকল্প নিলেন যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি তাকে মরতে দেবে না। গর্তের মধ্য থেকে তিনি তার নিজের হাতে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। পরের দিন তার প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল এবং তিন দিন পর সে মারা গেল। সে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস করেন নি। সে এত ভয় পেয়েছিল যে তার কাছে মনে হয়েছিল সমাজকর্মীরা এবং পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে।

5.2 'সম্মান' সংরক্ষণ

পণ্ডিতরাও দেখিয়েছেন যে কীভাবে এই চরম শারীরিক ও মানসিক বিপদের সময়ে জনগোষ্ঠীর সম্মান সংরক্ষণের ধারণাগুলো কার্যকর হয়েছিল। সম্মানের এই ধারণাটি জান (মহিলা) এবং জমিন (ভূমি) এর মালিকানা হিসাবে সংজ্ঞায়িত পুরুষত্বের ধারণার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি উত্তর ভারতীয় কৃষক সমাজের যথেষ্ট প্রাচীনতম ধারণা বিশ্বাস করা হয়েছিল যে পৌরূষ আপনার সম্পত্তি — জান এবং জমিন - বহিরাগতদের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই দুটি প্রধান 'সম্পত্তি' নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায়শই মহিলারা এই অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধকে নিজেদের আত্মসাত করে নিত।

কখনো কখনো, যখন পুরুষরা ভয় পেয়েছিল যে 'তাদের' স্ত্রী, কন্যা, বোনরা 'শত্রু' দ্বারা লাঞ্ছিত হবে, তখন তারা নিজেরাই মহিলাদের হত্যা করেছিল। উর্বশী বুটালিয়া তার বই '*The Other Side of Silence*'-এ রাওয়ালপিণ্ডি জেলার 'থোয়াখালা' গ্রামের এমন এক ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেশ বিভাগের সময় এই শিখ গ্রামে নব্বই জন মহিলা 'শত্রু' হাতে পড়ার পরিবর্তে 'স্বেচ্ছায়' একটি কূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়। এই গ্রামের স্থানান্তরিত শরনার্থীরা এখনও এই ঘটনাটিকে দিল্লির গুরুদ্বোয়ার স্মরণ করে এবং মৃত্যুকে আত্মহত্যা নয়, শাহাদাত বলে উল্লেখ করে। তারা বিশ্বাস করে যে, তখন পুরুষদের সাহসের সাথে মহিলাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এমনকি কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা নিজেরাই হত্যার জন্য রাজি হত। প্রতি বছর 13ই মার্চ, যখন তাদের 'স্মরণসভা' / শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়, তখন ঘটনাটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশু শ্রোতাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করা হয়। মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল তাদের বোনদের ত্যাগ এবং সাহসিকতাকে মনে রাখতে এবং একই ছাঁচে নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বেঁচে থাকা সম্প্রদায়ের জন্য, স্মরণীয় অনুষ্ঠান স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই জাতীয় রীতিনীতিগুলো যাঁরা মরতে চায় না এবং এর বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে যাঁদের জীবন শেষ করতে হয়েছিল, তাঁরা সকলেই এই গল্পগুলোকে আর স্মৃতিতে আনতে চায় না।

➲ আলোচনা করো...

দেশ বিভাগের সময় অনেক নিরীহ মহিলার মৃত্যু এবং কষ্ট ভোগের কারণ কী ছিল?

কেন ভারত এবং পাকিস্তানের সরকারগুলো তাদের মহিলাদের বিনিময় করতে রাজি হয়েছিল?

তুমি কি মনে কর যে তারা এটি করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল?

6. আঞ্চলিক বিভিন্নতা (REGIONAL VARIATIONS)

আমরা এতক্ষণ যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছি তা উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশের সাথে সম্পর্কিত ছিল। বঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মতো অঞ্চলগুলোর জন্য দেশ ভাগ কী ছিল? 1946 সালে কলকাতা ও নোয়াখালিতে যখন হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তখন এই বিভাজনটি পাঞ্জাবের সবচেয়ে রক্তাক্ত ও ধ্বংসাত্মক ছিল। 1946 এবং 1948 এই দুই বছরে তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতের পূর্বদিকে হিন্দু ও শিখদের সর্বাধিক স্থানচ্যুত এবং সম্পূর্ণ পাঞ্জাবী ভাষী মুসলমানদের পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

1950 সাল থেকে 1960 সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত অনেক মুসলিম পরিবার উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ থেকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। যদিও অনেক মুসলিম পরিবার ভারতেই থাকতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের মুহাজিরস্ (স্থানান্তরিত) নামে পরিচিত উর্দু ভাষী বেশির ভাগ লোকেরা সিন্ধ অঞ্চলের হায়দ্রাবাদও করাচিতে চলে গিয়েছিলেন। বাংলাদশে মাইগ্রেশন (স্থানান্তর) আরও বেশি দীর্ঘায়িত হয়েছিল। জনগণকে সীমানা পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। এর অর্থ এও ছিল যে বাঙালি বিভাগ এমন এক যন্ত্রণার প্রক্রিয়া তৈরি করেছিল যা সম্ভবত কম ঘনীভূত ছিল তবে বেশ যন্ত্রনাদায়ক ছিল। তদুপরি, পাঞ্জাবের বিপরীতে, বাংলায় জনসংখ্যার আদান প্রদান কাছাকাছি ছিল না। অনেক বাঙালি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছিল এবং অনেক বাঙালি মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে বাস করে চলেছিল। অবশেষে, বাঙালি মুসলমানরা (পূর্ব পাকিস্তান) জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের রাজনৈতিক পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 1971-72 সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি সাধারণ ধর্ম পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে একসাথে ধরে রাখল না।

তবে, পাঞ্জাব ও বাংলার অভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে একটি বিশাল মিল ছিল। উভয় বাজ্যেই নারী ও মেয়েরা অত্যাচারের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। আক্রমণকারীরা মহিলাদের দেহকে বিজিত করার অঞ্চল হিসাবে ধরেছিল। সম্প্রদায়ের অসদাচরণকারী মহিলাকে সম্প্রদায়ের অসম্মানজনক এবং প্রতিশোধ নেওয়ার মতো মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়েছিল।

চিত্র 14.13
হতাশার মুখোমুখি
1947 সালে পুরান কিলায় একটি বিশাল শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হয়েছিল, যখন বিভিন্ন স্থান থেকে অধিবাসীরা এসেছিল।

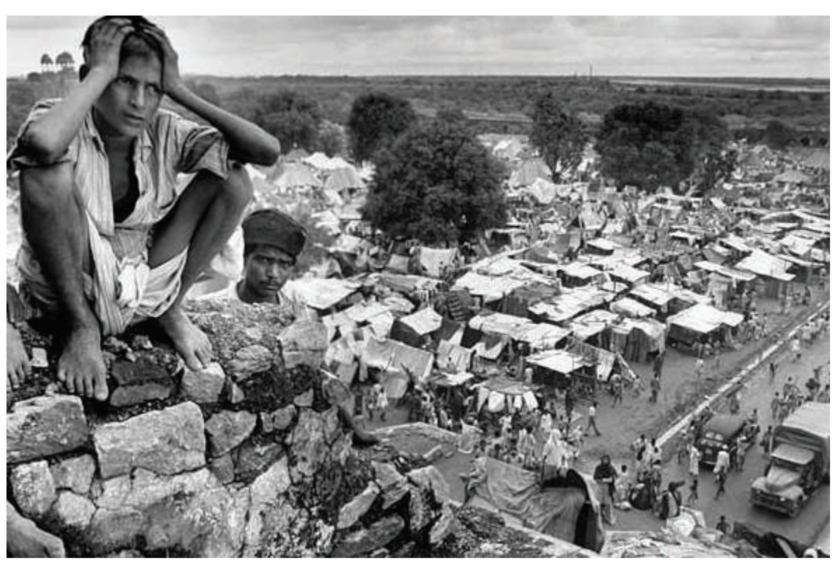

কথাসাহিত্য, কবিতা, চলচ্চিত্র

তুমি কি দেশবিভাগ সম্পর্কিত কোনো ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা অথবা চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত? প্রায়শই দেশবিভাগ সম্পর্কিত সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রগুলো ঐতিহাসিকদের রচনাগুলোর চেয়ে এই বিপর্যয়কর ঘটনাটিকে আরো অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উপায়ে উপস্থাপন করেছিল। তারা পৃথক কোনো প্রধান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে জনগণের যন্ত্রণা ও বেদনাকে বোঝার চেষ্টা করত অথবা সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর ভাগ্যগুলো একটি বড়ো ঘটনার রূপ নিয়েছিল, যাতে মনে হয় তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা সেই সময়ের যন্ত্রণা এবং অস্পষ্টতা রেকর্ড করে অনেকের অবিচ্ছিন্ন পছন্দগুলোর মুখোমুখি হয়েছিল। তারা মানুষের অবনমনে সহিংসতার মাত্রা, ভ্রষ্টাচার এবং অপকৃষ্টতাগুলো নথিভুক্ত করেছিল। তারা আশার কথা এবং কীভাবে লোকেরা প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠেছে সেগুলোও নথিভুক্ত করেছিল।

সাদাত হাসান মান্টো, বিশেষত প্রতিভাশালী উর্দু ছোটো গল্পের লেখক, তাঁর রচনা সম্পর্কে এই কথাটি বলেছেন :

> দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট হওয়া বিপ্লবের পরিণতিকে দীর্ঘদিন ধরে আমি মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলাম। আমি এখনও একইভাবে অনুভব করি, কিন্তু আমি মনে করি, শেষ পর্যন্ত আমি এই দুঃস্বপ্ন বাস্তবতা স্ব-অনুবেদনা বা হতাশা ছাড়াই মেনে নিতে এসেছি। এই প্রক্রিয়াতে আমি মানুষের সৃষ্ট রক্তের সমুদ্র, বিরল বর্ণের মুক্তো, একক মননের উৎসর্গ সম্পর্কে লিখে, যাঁরা মানুষকে (পুরুষদের) হত্যা করেছিলেন, তাদের কারোও দ্বারা অনুশোচনা সম্পর্কে, হত্যাকারীদের দ্বারা অশ্রু বর্ষণকারী, যারা এখনো বুঝতে পারে না যে, তারা কেন এখনও কিছু মানুষের অনুভূতিগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই সবই এবং আরো অনেক কিছু, আমি আমার বই 'সিয়াহ হাসিয়ে' (কালো মার্জিন) লিখে রেখেছি।

দেশবিভাগ বিষয়ক সাহিত্য এবং ছায়াছবিগুলো অনেক ভাষায় রচিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলো ছিল - হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বাংলা, অসমিয়া এবং ইংরেজী। তুমি মন্টো, রাজেন্দ্র সিং বেদী (উর্দু) ইনতিজার হোসেন (উর্দু), বিশান শানি (হিন্দি), কমলেশ্বর (হিন্দি), রাহি মাসোম রাজা (হিন্দি), নারায়ণ ভারতী (সিন্ধি), শান্ত সিং শিখোন (পাঞ্জাবী), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (বাংলা), সৈয়দ ওয়াহিউল্লাহ (বাংলা), ললিঠাম্বিকা অন্তর্জুনম (মালয়ালম), অমিতাভ ঘোষ (ইংরেজী) এবং বাসী সিদ্ধভা (ইংরেজী) প্রমুখদের মতো লেখকদের বই পড়তে চাইতে পারো। অমৃতা প্রিতম, ফৈজ আহমদ ফৈজ এবং দীনেশ দাশ প্রমুখরা পাঞ্জাবি, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় দেশ বিভাগকে নিয়ে স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন। তুমি ঋত্বিক ঘটক (মেঘে ঢাকা তারা এবং সুবর্ণরেখা) এম.এস.সাথ্যু (গরম হাওয়া), গোবিন্দ নীহালানী (টমাস)দের ছায়াছবিগুলো দেখতে পারো। আবার হাবিব তানভীড়-এর প্রযোজিত নাটক 'জিস লাহোর নাহিন ভেখ্যাও জাম্যা-এ-নাই' (সে, যে লাহোর দেখেনি, সে এখনও জন্মগ্রহণ করেনি) নাটকটি দেখতে পার।

➲ আলোচনা করো...

দেশ বিভাগের ফলে তোমার দেশ অথবা প্রতিবেশী দেশ প্রভাবিত হয়েছে কিনা? এটি কীভাবে এ অঞ্চলে পুরুষ এবং মহিলাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল এবং কীভাবে তারা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল।

7. সহায়তা, মানবতা, সম্প্রীতি (Help, Humanity, Harmony)

দেশভাগের সহিংসতা ও বেদনার কবলে পড়ে সহায়তা, মানবতা ও সম্প্রীতির এক বিরাট ইতিহাস ধ্বংস হয়ে গেল। আবদুল লতিফের মজাদার বর্ণনার মতো অনেক আখ্যান আছে, যেগুলো আমরা প্রকাশ করতে শুরু করেছি। দেশ বিভাগের সময়কালে মানুষ কীভাবে একে অপরকে সাহায্য করেছিল, নতুন সুযোগগুলোর উদ্বোধনের যত্ন এবং ভাগ করে নেওয়ার গল্প এবং কীভাবে মানসিক আঘাতকে জয়লাভ করেছিল - এরকম অসংখ্য গল্প ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, ধরমপুরে, বর্তমানে হিমাচল প্রদেশে কর্মরত (পোস্ট করা) যক্ষ্মার চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ বিশেষত একজন শিখ চিকিৎসক খুশদেব সিংহের কাজ বিবেচনা করো। তিনি নিজেকে দিনরাত কাজে নিয়োজিত রাখতেন। ডাক্তার স্থানান্তরিত অসংখ্য মুসলিম, শিখ এবং হিন্দু অধিবাসীদের চিকিৎসা, খাদ্য, আশ্রয়, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান করেন। দিল্লির মুসলমান এবং অন্যান্যদের গান্ধিজির প্রতি যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল ধরমপুরের অধিবাসিদেরও তাঁর মানবতা ও উদারতার প্রতি সেই বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে একজন মহম্মদ ওমর, খুশদেব সিংহকে লিখেছিলেন : 'অত্যন্ত নম্রতার সাথে আমি অনুরোধ করছি যে, আপনার সুরক্ষার বাইরে আমি নিজেকে নিরাপদ বোধ করি না। অতএব, সমস্ত দিক দিয়ে দয়া করে, আমাকে আপনার হাসপাতালে একটি আসন দিলে আমার খুব ভালো হয়।'

'ভালোবাসা ঘৃণার চেয়েও শক্তিশালী' :1947-এর স্মরণিকার স্মৃতিচারণ থেকে আমরা এই চিকিৎসকের কঠোর ত্রান কাজ সম্পর্কে জেনেছি। এখানে সিং তার কাজের বর্ণনা করেছেন, "মানুষের প্রতি একজন মানুষ হিসাবে আমার দায়িত্ব পালনের জন্য আমি বিনীত প্রচেষ্টা করেছি।" 1949 সালে করাচিতে দুটি সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি বেশ জোরালোভাবে এই কথা বলেছিলেন, পুরানো বন্ধুবান্ধব এবং

চিত্র 14.14
শরনার্থী শিবিরগুলো সর্বত্র এমন লোকদের দ্বারা উপচে পড়েছে যাদের কেবল খাদ্য এবং আশ্রয় নয়, ভালোবাসা এবং সহানুভূতিরও প্রয়োজন ছিল।

উৎস 8

আঙ্গুরের একটি ছোটো ঝুড়ি

1949 সালে করাচি সফরের একটিতে খুশদেব সিং তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন:

> আমার বন্ধুরা আমাকে বিমানবন্দরে একটি ঘরে নিয়ে গেল যেখানে আমরা সবাই বসে বসে কথা বললাম ... (এবং) এর সাথে দুপুরের খাবার খেয়েছি, আমাকে করাচি থেকে লণ্ডন যেতে হয়েছিল ... রাত্র 2.30 টায়, ... সন্ধ্যা 5 টায় ——— আমি আমার বন্ধুদের জানিয়েছিলাম যে তারা আমাকে এত উদারভাবে তাদের সময় দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে তাদের জন্য পুরো রাত অপেক্ষা করা খুব বেশি হবে এবং তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে তাদের অবশ্যই সমস্যাটা এড়াতে হবে, রাতের খাবারের সময় পর্যন্ত কেউই ছিল না। ... তারপর তারা বলেছিল তারা চলে যাচ্ছে এবং আমাকে বলল বিমানে উঠার আগে কিছুটা বিশ্রাম নিতে হবে। আমি রাত্রি প্রায় 1.45 টায় উঠলাম এবং যখন আমি দরজাটি খুললাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে তারা সবাই এখনো সেখানে রয়েছে ... তারা সকলেই আমার সাথে বিমানের কাছে এসেছিল এবং আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাকে একটি ছোটো ঝুড়ি আঙ্গুর উপহার দিয়েছিল। তারা যে আমার সাথে অভিভূতকারী মধুর ব্যবহার করেছিল এবং এই যাত্রা বিরতি আমাকে যে সুখ দিয়েছে তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা আমার কাছে ছিল না।

➲ **আলোচনা করো...**

দেশবিভাগের সময় কীভাবে লোকেরা একে অপরকে সাহায্য করেছিল এবং জীবন বাঁচিয়েছিল সে সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান করো।

যাদের তিনি ধরমপুরে সাহায্য করেছিলেন তারা করাচি বিমানবন্দরে তাঁর সাথে কয়েকটা স্মরণীয় ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। ছয়জন পুলিশ কনস্টেবল, পূর্বের পরিচিতরা তাঁর সাথে হেঁটে বিমানটির কাছে গেল, তাকে অভিবাদন জানাল। সে বিমানে উঠে গেল। "আমি হাত জোড় করে এবং আমার চোখের জল দিয়ে (সালাম) স্বীকৃতি জানালাম।"

৪. মৌখিক সাক্ষ্য এবং ইতিহাস (Oral Testimonies and History)

এই অধ্যায়ে যে উপাদানগুলো থেকে বিভাজনের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে সেগুলো কী তুমি নোট করেছ? মৌখিক বিবরণী, স্মৃতি, ডায়েরি, পারিবারিক ইতিহাস, প্রথম হাতে লিখিত বিবরণ — এগুলো সবই আমাদের দেশ বিভাগের সময় সাধারণ মানুষের বিচার ও যন্ত্রণা বুঝতে সাহায্য করে। কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশবিভাগকে সেই সময়ের দুর্ভোগ ও চ্যালেঞ্জের দিক দিয়ে দেখেছিল। তাদের জন্য এটি নিছক সাংবিধানিক বিভাগ ছিল না বা মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলোর দলীয় রাজনীতি ছিল না। তাদের জন্য, এর অর্থ জীবনের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলোর কারণ যেগুলো 1946 এবং 1950-এর মধ্যে এবং তারও বেশি সময়ের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল, যার জন্য মনস্তাত্ত্বিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক সমন্বয়ের প্রয়োজন। জার্মানীতে সংঘটিত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মতো আমাদের দেশবিভাগটি কেবল একটি নিছক রাজনৈতিক ঘটনা হিসাবে নয়, বরং যারা এর মধ্যে বসবাস করছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও বিচার করতে হবে। স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা একটি ঘটনার বাস্তবতাকে রূপ দেয়।

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের অন্যতম শক্তি — এক ধরনের মৌখিক উৎস — যেগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির বিষয়গুলোকে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। এই ঘটনাগুলো ঐতিহাসিকদেরকে দেশবিভাগের সময় লোকদের সাথে কী ঘটেছিল তার সুনির্দিষ্ট, সমৃদ্ধ, স্বতন্ত্র প্রাণবন্ত বিবরণ লিখতে সক্ষম করে। সরকারি নথি থেকে এই জাতীয় তথ্য বের করা অসম্ভব। এটি পরবর্তী সময়ে নীতি ও দলীয় বিষয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করে। দেশবিভাগের ক্ষেত্রে, সরকারি প্রতিবেদন এবং ফাইলগুলোর পাশাপাশি এর উচ্চস্তরের কর্মীদের ব্যক্তিগত লেখাগুলো ব্রিটিশ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বা শরনার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনার প্রতি আলোকপাত করে। তবে তারা দেশ বিভাগের সরকারি সিদ্ধান্তে যারা দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদেরকে খুব কমই বলেছিল।

ঐতিহাসিকরা দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদের মৌখিক ইতিহাস থেকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হওয়া ইতিহাস উদ্ধার করে তাদের শৃঙ্খলার সীমানা আরো

প্রশস্থ করে দিয়েছে। আবদুল লতিফের বাবা, থো খালসার মহিলাদের কথা — শরনার্থী যারা পাইকারি দামে গম বিক্রি করেছেন, সাম্প্রতিক সময়ে তুচ্ছভাবে চটের থলিতে গম বিক্রি করে জীবনযাপন করেছিল। বিহারের মধ্যবিত্ত বাঙালি বিধবা যারা রাস্তায় কাজ করছিল তাদের কাছ থেকে এই গমগুলো এসেছিল। পেশোয়ার একজন ব্যবসায়ী যিনি ভারতে আসার পরে কটকে একটি ক্ষুদ্র চাকরীর অবতারনা দুর্দান্ত মনে করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলেন — "কটক কোথায় অবস্থিত? এটা কী হিন্দুস্থানের উপরের ভাগে নাকি নীচের ভাগে? পেশোয়ারে আমরা এর আগে কটকের নাম শুনিনি?"

এইভাবে, ভালো মন্দ এবং সুপরিচিত কর্মগুলোকে অতিক্রম করে দেশবিভাগের মৌখিক ইতিহাসগুলোকে অনুসন্ধান করা সফল হয়েছে। সেই সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের অভিজ্ঞতা, যাদের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে, অথবা কেবল মূলধারার ইতিহাসে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ আমার যে ইতিহাসগুলো প্রায়ই পড়েছি সেগুলো অতীতের জনসাধারণের জীবন ও কাজকে অত্যন্ত দুর্গম বা গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করে।

তবুও, অনেক ঐতিহাসিক এখনো মৌখিক ইতিহাস সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ, তারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ মৌখিক তথ্যগুলোতে বাস্তবতার অভাব দেখা যায় এবং তারা যে, কালপঞ্জি তৈরি করে তা যথাযথ নয়। ঐতিহাসিকদের অভিমত হল যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্রতা সাধারণ কারণকে কঠিন করে তোলে; এই ধরনের ক্ষুদ্র প্রমাণ থেকে কোনো বড়ো ছবি তৈরি করা যায় না এবং একজন সাক্ষী কখনো একটি সাক্ষী হয় না। তারাও মনে করে যে, মৌখিক বিবেচনা করা স্পর্শকাতর সমস্যার সঙ্গো সম্পর্কিত এবং স্মৃতিতে থাকা ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র অভিজ্ঞতাগুলো ইতিহাসের বৃহত্তর প্রক্রিয়া প্রবর্তনের সাথে অপ্রাসঙ্গিক।

যাহোক ভারতে দেশভাগ এবং জার্মানির ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল সে সম্পর্কে সাক্ষীর অভাব নেই। সুতরাং প্রবণতাগুলো খুঁজে বের করা এবং ব্যতিক্রমগুলো উল্লেখ করার জন্য যথেস্ট প্রমাণ রয়েছে। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে তা সংশ্লেষ করে এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যের তুলনা করে এবং ঐতিহাসিকরা প্রমাণের একটি নির্দিষ্ট অংশের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। এছাড়া, যদি ইতিহাসকে সাধারণ এবং শক্তিহীন উপস্থিতির উপস্থিতি দেখাতে হয়, তবে বিভাজনের মৌখিক ইতিহাসটি স্পর্শকাতর বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়, এর সাথে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলো গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। অতএব মৌখিক উৎসগুলো অন্যান্য এবং বিপরীত উৎসগুলোর পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা উচিত। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎসকে ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি প্রতিবেদনগুলো ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা বিনিময়কৃত। উদ্ধার নরনারীদের সংখ্যার কথা আমাদের বলবে, তবে ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের মহিলারা বিনিময় হওয়ার সময় তারা কী ধরনের দুর্ভোগ পেয়েছিলেন সেকথা আমাদের বলবেন।

আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, দেশবিভাগের মৌখিক তথ্য আপনা থেকে বা খুব সহজেই পাওয়া যায় না। এগুলোকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সহানুভূতির সাথে অর্জন করতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথম অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি হল সমর্থক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলতে চান না। উদাহরণস্বরূপ ধর্ষিতা কোনো মহিলা কেন তার মর্মান্তিক ঘটনাগুলো কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে চান? সাক্ষাৎকারীরা প্রায়ই ব্যক্তিগত মানসিক আঘাতগুলোর অনুসন্ধান এড়িয়ে যান। তারা গভীরতর এবং অর্থবহ তথ্য পাওয়ার আগে তাদের উত্তরদাতাদের সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তারপর তাদের স্মৃতিশক্তির সমস্যা রয়েছে। কয়েক দশক পরে যখন সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন লোকেরা কোনো ঘটনা সম্পর্কে কী মনে রাখে বা ভুলে যায় তা নির্ভর করে মধ্যবর্তী বছরগুলোতে তাদের অভিজ্ঞতা এবং এ সময় তাদের সম্প্রদায় এবং জাতির অবস্থান কেমন ছিল। নানা ধরনের নির্মিত স্মৃতি কথার মধ্য থেকে প্রকৃত অভিজ্ঞতা যাচাই করে নেওয়া কঠিন কাজটি বাস্তবিক পক্ষে মৌখিক ইতিহাসকারদের করতে হয়।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, বিভাজনের একটি বিস্তারিত গল্প তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের উৎস, উপকরণ ব্যবহার করতে হয়েছে। এই কারণে যে আমরা কেবল এটিকে একটি ঘটনা এবং প্রক্রিয়া হিসাবে দেখি না, যারা সেই বেদনাদায়ক সময় কাটিয়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতাকেও বুঝার চেষ্টা করা হয়।

চিত্র 14.15
সকলে গরুর গাড়িতে ভ্রমণ করতে পারত না, সবাই হাঁটতেও পারত না ...।

সময়পঞ্জি

1930	উর্দু কবি মোহম্মদ ইকবাল একটি "উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র"র প্রয়োজনীয়তার এবং আলাদা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল গড়ে তোলার কথা বলেন।
1933	পাকিস্তান বা পাক-স্তান নামটি ক্যামব্রিজের এবং পাঞ্জাবী মুসলিম ছাত্র প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর নাম হল চৌধুরী রহমত আলী।
1937-39	কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটিশ ভারতে 11টি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে ক্ষমতায় আসে।
1940	মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে, মুসলিম লীগ, লাহোর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল।
1946	প্রদেশগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জয়লাভ করে। মুসলিম সংরক্ষিত আসনে লীগের সাফল্য সমানভাবে লক্ষনীয়।
মার্চ ও জুন	ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা দিল্লিতে তিন সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা মিশন প্রেরণ করে।
আগস্ট	মুসলিম লীগ পাকিস্তান জয়ের জন্য "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
16 আগস্ট	কলকাতায় হিন্দু-শিখ এবং মুসলমানদের মধ্যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয় এবং কয়েক হাজার মানুষ মারা যায়।
মার্চ 1947	কংগ্রেস হাইকমাণ্ড পাঞ্জাবকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অঞ্চলে এবং হিন্দু/শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অঞ্চলে, ভাগ করার পক্ষে ভোট দেয় এবং বাংলায় অনুরূপ নীতির জন্য আবেদন করে, ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করতে শুরু করে।
14-15 আগস্ট	পাকিস্তান গঠিত হল; ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে, মহাত্মা গান্ধি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য পূর্ব বাংলার নোয়াখালি সফল করেন।

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. 1940 সালের প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ কী দাবি করেছিল?
2. কেন কিছুলোক বিভাজনকে খুব আকস্মিক বিকাশ হিসাবে চিন্তা করেন?
3. দেশ ভাগকে সাধারণ মানুষ কীভাবে দেখেছিল?
4. দেশ ভাগের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির যুক্তি কী ছিল?
5. দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে দেশ বিভাজনকে কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করা হয়?

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta (eds.). 2003.
The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India.
Stree, Kolkata.

Alok Bhalla (ed.). 1994.
Stories About the Partition of India, Vols. I, II, III.
Indus (Harper Collins), New Delhi.

Urvashi Butalia. 1998.
The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India.
Viking (Penguin Books), New Delhi.

Mushirul Hasan, ed. 1996
India's Partition.
Oxford University Press, New Delhi.

Gyanendra Pandey. 2001.
Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India.
Cambridge University Press, Cambridge.

Anita Inder Singh. 2006.
The Partition of India.
National Book Trust, New Delhi.

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়েছিল কেন?
7. মহিলারা কীভাবে দেশভাগের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল?
8. কংগ্রেস কীভাবে দেশভাগ সম্পর্কে তাদের মতামত পরিবর্তন করতে চেয়েছিল?
9. মৌখিক ইতিহাসের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা পরীক্ষা কর। মৌখিক ইতিহাসের কৌশলগুলো কীভাবে বিভাজন সম্পর্কে তোমাদের উপলব্ধি বাড়িয়ে তুলেছে?

মানচিত্রের কাজ

10. দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত বিভাগ A, B এবং C বিভাগ চিহ্নিত জায়গাগুলো উল্লেখ কর। এই মানচিত্রটি কীভাবে বর্তমানের দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রের চেয়ে আলাদা?

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

11. যুগস্লাভিয়ার বিভাজনে যে জাতিগত সহিংসতা সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে সন্ধান কর। এই অধ্যায় বিভাজন সম্পর্কে তোমরা যা পড়েছ তার সাথে নিজের অনুসন্ধানের তুলনা কর।
12. তোমার শহর, নগর, গ্রাম অথবা নিকটবর্তী কোনো স্থান খুঁজে বের কর এমন কোনো সম্প্রদায় রয়েছে কিনা যার দেশবিভাগের ফলে দেশান্তরিত হয়েছে। (এমনকি তোমার অঞ্চলে এমন লোকও থাকতে পারে যারা দেশ ভাগের সময় স্থানান্তরিত হয়েছিলঃ এই জাতীয় সম্প্রদয়ের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নাও এবং একটি প্রতিবেদনে তোমার অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করো। লোকগুলো যে জায়গা থেকে এসেছিল, তাদের স্থানান্তরের কারণ এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। এছাড়াও এই স্থানান্তরের ফলস্বরূপ অঞ্চলটির কী কী পরিবর্তন দেখেছিলে তাও খুঁজে বের কর।

বিষয়বস্তু
পঞ্চদশ

সংবিধান প্রণয়ন

এক নতুন যুগের সূচনা

1950 খ্রি. 26 জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকরি হয়। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। দেশের আয়তন এবং বৈচিত্র্যের বিবেচনায় এই সংবিধানের বিস্তৃতি এবং জটিলতা অনুধাবন করা সম্ভব। স্বাধীনতার সময় ভারত কেবল বিশাল এবং বৈচিত্রময়ই ছিল না, অনেক ভাগেও বিভক্তি ছিল। দেশের একতা বজায় রেখে একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিস্তারিত সযত্নে রচিত, কঠোর শ্রমলব্ধ সংবিধান অপরিহার্য ছিল। অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত ক্ষত মুছে ফেলে, বিভিন্ন শ্রেণি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতীয়দের একই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সমান স্থান দেওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। অপরদিকে এই সংবিধান দীর্ঘ সময় ধরে অসাম্যের শিকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার প্রতি সচেতন রয়েছে।

1946 খ্রি. ডিসেম্বর থেকে 1949 খ্রি. নভেম্বরের মধ্যে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই সময় এর খসড়াটি বিভিন্ন ধারা ভারতের গণ পরিষদে আলোচনা করা হয়েছিল। গণপরিষদ 165 দিনে 11 টি অধিবেশনের মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করে। অধিবেশনগুলোর মধ্যে খসড়াগুলো সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজটি বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

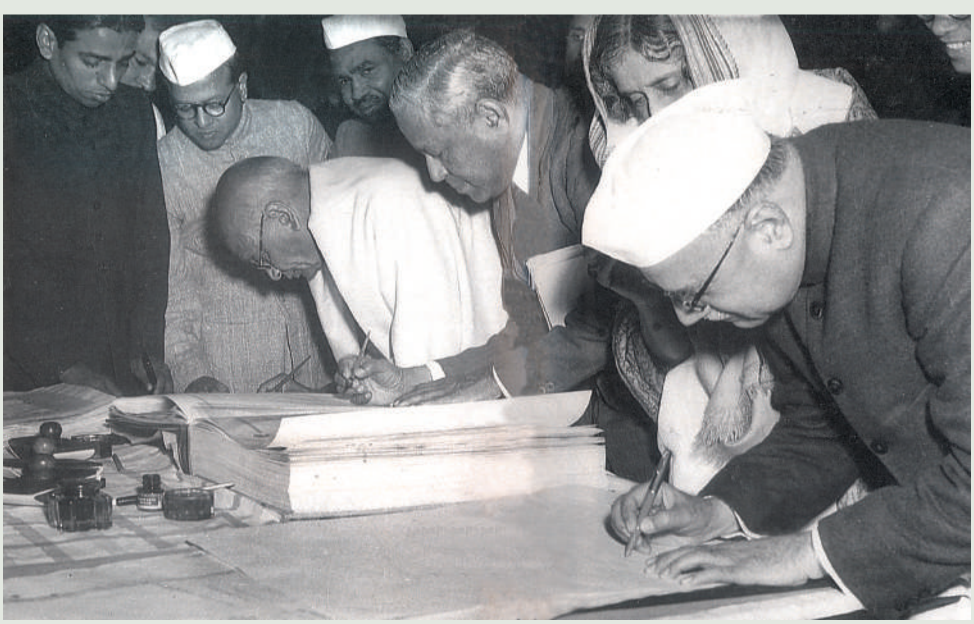

চিত্র 15.1
1949 খ্রি. ডিসেম্বরে তিন বছর ধরে চলা বিতর্কের পর সংবিধান হস্তান্তর করা হয়।

তোমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে জানতে পেরেছ যে, ভারতের সংবিধান এবং তোমরা দেখেছ যে এটি স্বাধীনতার পর থেকে কয়েক দশক ধরে কীভাবে কাজ করছে। এই অধ্যায়টি তোমাদেরকে সংবিধান গঠনের ইতিহাস এবং এর প্রণয়নের সময় বিভিন্ন বিতর্কগুলোর সঙ্গে পরিচিত করবে। যদি আমরা গণপরিষদের অভ্যন্তরের আলাপ আলোচনা জানতে পারি, তবে সংবিধান গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এক নতুন জাতি গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

1. এক অস্থির সময়

চিত্র 15.2
নির্জনতা ও ধ্বংসের চিত্রগুলো গণপরিষদের সদস্যদের হতাশ করতে থাকে।

সংবিধান প্রণয়নের ঠিক আগের বছরটি ছিল অশান্তিপূর্ণ : একদিকে যেমন ছিল পরম প্রত্যাশা অন্যদিকে চরম হতাশাও ছিল। 1947 খ্রি. 15 আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল তবে পাশাপাশি এর বিভাজনও ঘটে। 1942 খ্রি. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের লড়াই - সম্ভবত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয় আন্দোলন - এর পাশাপাশি বিদেশী সহায়তায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রয়াস মানুষের স্মৃতিতে তখনও তাজা ছিল। 1946 খ্রি. বসন্তকালে বোম্বাই এবং অন্য শহরগুলোতে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির (ভারতীয় নৌসেনা) সৈন্যদের বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে জনগণের সহানুভূতি আদায় করেছিল। 1940 খ্রি. শেষদিকে দেশের বিভিন্ন অংশে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণি বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এ সমস্ত গণ আন্দোলনগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা। অন্যদিকে দুটি অগ্রণী ভারতীয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ধর্মীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো কোনো বোঝাপড়ায় উপনীত হতে পারে নি। 1946 খ্রি. আগস্ট মাসে খ্যাত কলকাতা হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে উত্তর ও পূর্ব ভারত জুড়ে প্রায় একটানা দাঙ্গা হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলতে থাকে। (অধ্যায় 13 এবং 14 দেখো)। ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরে হিংস্রতা চরম পরিণতি পায় এবং জনগণের দেশত্যাগকালীন পরিস্থিতিতে এই দাঙ্গা গণহত্যার রূপ ধারণ করে।

1947 খ্রি. 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে, যে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয় তা সেই সময়কালীন লোকদের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে। তবে ভারতে অসংখ্য মুসলমান এবং পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখরা এক নির্মম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়

চিত্র 15.3
1947 সালে 14 আগস্ট মধ্যরাত্রে সংবিধান সভায় জওহরলাল নেহেরুর ভাষণ
এই দিনেই জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন যার শুরুতে তিনি বলেন, "অনেক বছর আগে আমরা নিয়তির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সম্পূর্ণভাবে হয়তো নয়, কিন্তু বহুলরূপে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সময় আসন্ন মধ্যরাত্রির ঘণ্টা যখন বাজবে, সমগ্র পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন, ভারতবর্ষ তখন জেগে উঠবে জীবন ও স্বাধীনতার চেতনায়।"

— একদিকে আকস্মিক মৃত্যুর হুমকি বা সুযোগ সীমিত হয়ে আসা এবং অন্যদিকে পুরোনো শিকড় ছিন্ন করে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা স্থানান্তরিত হয়েছিল, মুসলিমরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে, হিন্দু ও শিখরা পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাঞ্জাবে প্রবেশ করছিল। তাদের অনেকে গন্তব্যে পৌছানোর আগেই মারা গিয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্রকে এমনই আরেকটি গম্ভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে। ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল নবাব ও মহারাজাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল যারা ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত। তবে তারা তাদের ইচ্ছামত শাসন বা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ছিল। যখন ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করে তখন রাজাদের সাংবিধানিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। একজন সমসাময়িক লেখক মন্তব্য করেছিলেন যে অনেক মহারাজা "বহু বিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।"

এই পটভূমিতে গণপরিষদ তার কাজ শুরু করেছিল। বাইরের অস্থির পরিস্থিতি থেকে, গণপরিষদের বিতর্ক প্রভাবিত না হয়ে কী করে থাকতে পারে?

1.1 গণপরিষদ গঠন

গণপরিষদের সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হননি। 1945-46-এর শীতকালে ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাদেশিক আইনসভাগুলো সংবিধান সভায় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

নবগঠিত সাংবিধানিক পরিষদে রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল। কংগ্রেস প্রাদেশিক নির্বাচনের সাধারণ আসনগুলোতে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মুসলিম সংরক্ষিত অধিকাংশ আসনে

মুসলিম লিগ জয়ী হয়। তবে লিগ সংবিধান সভায় যোগদান থেকে বিরত থাকে, তারা সংবিধানসহ পাকিস্তান গঠনের দাবির উপর জোর দেয়।

সমাজতন্ত্রবাদীরাও প্রথমদিকে সংবিধান সভায় যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিল না, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, গণপরিষদ ব্রিটিশদের সৃষ্ট এবং এটি প্রকৃতপক্ষে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারবে না। ফলস্বরূপ, গণপরিষদের 82 শতাংশ সদস্যই ছিল কংগ্রেসের সদস্য। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও অনৈক্যের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কিছু সংখ্যক সদস্য ছিলেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। অন্যরা জমিদারি প্রথার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। অনেক সদস্য সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখেন, আবার অনেকেই ছিলেন নিশ্চিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্যরা প্রকাশ্যে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করার এবং মতবিরোধ দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সংবিধান সভার অভ্যন্তরেও কংগ্রেস সদস্যরা সরব ছিলেন। জনগণের প্রকাশিত মতামত সংবিধান সভার অভ্যন্তরীণ আলাপ-আলোচনাকেও প্রভাবিত করেছে। আলোচনা চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং প্রস্তাবগুলোও প্রকাশ্যে আলোচিত হয়। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে যে ধরনের ঐক্যমত গড়ে উঠত তা বহুল মাত্রায় প্রভাবিত করত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমালোচনা ও পাল্টা সমালোচনা।

চিত্র 15.4
গণপরিষদের অধিবেশন
ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে বসা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের অনুভূতি তৈরির জন্য জনসাধারণকে আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি কী হবে সেই সম্পর্কে তাদের মতামত জানাতে বলা হয়। ভাষাগত সংখ্যালঘুরা তাদের মাতৃভাষার সুরক্ষা চেয়েছিল। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিশেষ সুরক্ষা চেয়েছিল। অন্যদিকে দলিতরা সকল বর্ণ বিদ্বেষের অবসান এবং সরকারি সংস্থায় আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। সাংস্কৃতিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ওঠে আসে এবং সংবিধান সভায় আলোচিত হয়।

1.2 প্রভাবশালী মতামত

গণপরিষদে মোট তিনশ জন সদস্য ছিল। তাদে মধ্যে ছয়জন সদস্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনজন কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন, যথা - জওহরলাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ। নেহেরু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা কেন্দ্রে গাঢ় নীল চক্র অনুভূমিকভাবে সমানুপাতে - তিনটি রঙ্ - "গেরুয়া, সাদা এবং গাঢ় সবুজ-এ রঞ্জিত হবে বলে প্রস্তাব করেন।" অন্যদিকে প্যাটেল পর্দার আড়ালে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন মতামতের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। গণপরিষদের সভাপতি হিসাবে রাজেন্দ্র প্রসাদ সমস্ত সদস্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে গঠনমূলক পথে আলোচনা পরিচালিত করেন।

কংগ্রেসের এই ত্রয়ী ছাড়াও গণপরিষদের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী ও অর্থনীতি ড: বি.আর.আম্বেদকর। ব্রিটিশ শাসনকালে আম্বেদকর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার সময় মহাত্মা গান্ধির পরামর্শে তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই পদাধিকার বলে তিনি সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাথে আরও দুজন আইনজীবী কাজ করেন, একজন গুজরাটের কে.এম.মুন্সি এবং অপরজন মাদ্রাজের আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার। তাঁরা উভয়ই সংবিধানের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন।

এই ছয়জন সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেন দুজন অসামরিক কর্মী। একজন হলেন বি.এন.রাও, ভারত সরকারের সাংবিধানিক উপদেস্টা, যিনি অন্যান্য দেশে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। অপরজন ছিলেন মুখ্য খসড়া রচনাকারী, এস.এন. মুখার্জি, যিনি জটিল প্রস্তাবগুলোকে স্পষ্ট আইনি ভাষায় প্রকাশ করার অধিকারী ছিলেন। গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধানের খসড়াটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আম্বেদকর। এটি তৈরি করতে তিন বছর সময় লেগেছিল, এই আলোচনার নথি ১১টি বড়ো খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হলেও এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল।

গণপরিষদের সদস্যরা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। তাদের উপস্থাপনাগুলোর মাধ্যমে আমরা ভারতবর্ষের বহু পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সাথে পরিচিত হতে পারি — কোন্ ভাষাতে ভারতীয়দের কথা বলা উচিত, কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত, নাগরিকরা কোন্ নৈতিক মূলবোধকে সমর্থন করবে বা অস্বীকার করবে।

➲ আলোচনা করো...

অধ্যায় 13 এবং 14 পুনরায় আলোচনা কর। কীভাবে সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গণপরিষদে অভ্যন্তরীণ বিষয়কে প্রভাবিত করে — আলোচনা কর।

চিত্র 15.5
বি.আর.আম্বেদকরের সভাপতিত্বে হিন্দু আইন সংক্রান্ত আলোচনা।

2. সংবিধানের দৃষ্টি

1946 খ্রি. 13 ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরু গণপরিষদে আইনের উদ্দেশ্য প্রস্তাব (Objectives Resolution) উত্থাপন করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব ছিল যা স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল আদর্শের রূপরেখা তৈরি করেছিল এবং সংবিধান প্রণয়নের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন পরিকাঠামো সরবরাহ করেছিল। এটি ভারতকে একটি “স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র” হিসাবে ঘোষণা করেছে, তার নাগরিকদের ন্যায়বিচার, সাম্য এবং স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এবং আশ্বাস দিয়েছে যে, সংখ্যালঘু, পশ্চাৎপদ ও উপজাতি অঞ্চল এবং হতাশাগ্রস্থ ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে...” এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য করে নেহেরু ভারতীয় গবেষণাকে ব্যাপক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

নেহেরুর ভাষণ সাবধানতার সাথে খতিয়ে দেখা উচিত। এতে ঠিক কী বলা

উৎস 1

“আমরা শুধুমাত্র অনুকরণ করিতে যাচ্ছি না”

1946 খ্রি. 13 ডিসেম্বরের প্রসিদ্ধ ভাষণে জওহরলাল নেহেরু বলেন :

আমার মনের মধ্যে বার বার ঐ সমস্ত সংবিধান সভার কথা মনে আসছে, যারা ইতোমধ্যেই সংবিধান তৈরির কাজটি সেরে নিয়েছে। ওই মহান আমেরিকা রাষ্ট্র নির্মাণের কথা আমার মনের মধ্যে আসছে। যেখানে ওই রাষ্ট্রের জনগণ মিলিত হয়ে এমন এক সংবিধান রচনা করেন, যা এতগুলো বছর, প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাঁরা এমন এক মহান রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে, যা কিনা ওই সংবিধানের ওপরই ভিত্তি করে গড়া। এরই সাথে আমার মনে পড়ছে 150 বছর পূর্বে অন্য এক স্থানে সংগঠিত হওয়া ওই মহান বিপ্লবের কথা এবং ওই সংবিধান সভার কথা, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মনমুগ্ধকর প্যারিস শহরে এবং যাতে স্বাধীনতা লাভের জন্য অনেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারীরা সমবেত হয়েছিল। ওই সংবিধান সভাটি কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং কীভাবে রাজা তথা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বাধা সৃষ্টি করেছিল, যা এখনো অব্যহত আছে। ইতিহাসের ওই সমস্ত ঘটনাগুলো আমার মনে পড়ছে। এই কথাটি সংসদ মনে রাখবে, যখন এই ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ওই সংবিধান সভার জন্য একটি কক্ষও বরাদ্দ করা হয়নি, ফলে তারা টেনিস খেলার মাঠে সম্মিলিত হন এবং শপথ গ্রহণ করেন, যা ‘টেনিস কোর্টের শপথ’ নামে পরিচিত। তারা রাজা তথা অন্যান্যদের বাধা প্রদান সত্ত্বেও, নিজেদের সভাগুলো চালিয়ে যান এবং নিজেদের কার্যসিদ্ধি করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেই স্থান ত্যাগ করেন নি। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরাও ওই ধরনের বিশুদ্ধ ভাবনা নিয়ে একত্রিত হয়েছি এবং আমাদের বৈঠক এই কক্ষে অথবা অন্য কোথাও হোক, অথবা মাঠে কিংবা বাজারে হোক, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বৈঠক জারি থাকবে।

contd

উৎস 1 (contd)

এরই সাথে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক বিপ্লবের কথা আমার মনে পড়ছে, যার ফলে এক নতুন ধরনের রাজ্যের উত্থান ঘটে। রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া এই বিপ্লবের ফলে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছে। বর্তমানে এই শক্তিশালী রাষ্ট্রটি বিশ্বে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এটি কেবলমাত্র বিশ্বের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রই নয়; এটি আমাদের প্রতিবেশী দেশও বটে।

এই সকল মহান উদাহরণগুলো আমাদের সামনেই রয়েছে এবং সেগুলোর সফলতা থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হবে এবং ব্যর্থতাগুলোকে পরিহার করতে হবে। হয়ত বা আমরা সেই সমস্ত বিফলতাগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। কারণ প্রচেষ্টায় অসফল হওয়াটাই সহজাত ব্যাপার। তবুও আমি নিশ্চিত যে, এই সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও, আমরা এগিয়ে যাব এবং আমরা আমাদের ওই সকল স্বপ্নকে স্বার্থক করা না পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না, যেই স্বপ্নগুলো আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি।

আমরা এক স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভারতকে সার্বভৌম স্বাধীন এবং প্রজাতান্ত্রিক হতেই হবে ... কিছু কিছু বন্ধু প্রশ্ন তুলেছেন : "আপনি এখানে 'গণতান্ত্রিক' শব্দটিকে স্থান দেননি কেন?" আমি তাদের বলেছি, এ নিয়ে নিঃসন্দেহে চিন্তা করা যায় যে, কোনো প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক নাও হতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ অতীত ইতিহাস, এর সাক্ষ্য বহন করে যে, আমরা বরাবরই গণতন্ত্রের পক্ষপাতি। স্পষ্টতই, আমাদের লক্ষ্য গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। কিন্তু এই গণতন্ত্রের চেহারা কেমন হবে এবং এর আকার কেমন হবে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। বর্তমানে ইউরোপ তথা অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিশ্বের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। তবুও এই গণতন্ত্রগুলোকে যদি সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক আদর্শ বজায় রাখতে হয়, তবে সময়ের সাথে সাথে তাদের স্বরূপ পরিবর্তন করতে হতে পারে বলে সন্দেহ হয়। আমরা শুধুমাত্র তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে অনুসরণ করতে যাবো না। আমরা ওই প্রবর্তিত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারি। আমাদের প্রবর্তিত গণতন্ত্র এমন হবে, যা আমাদের দেশের জনগণের মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথা গ্রহণীয় হবে। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে। আমি আশা করছি এই সদনই গণতন্ত্রের সঠিক রূপরেখা তৈরি করবে - যা হবে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র। সদন লক্ষ্য করবে যে আমরা এই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করিনি, কারণ আমাদের মনে হয়েছে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই 'গণতন্ত্র' নিহিত রয়েছে, এইজন্য আমরা অনাবশ্যক তথা অপ্রয়োজনীয় শব্দাবলি ব্যবহার করতে চাইনি। আমরা শব্দের ব্যবহারের চেয়েও অন্যদিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা এই প্রস্তাবে শুধু গণতন্ত্রই নয়, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা অন্তর্ভুক্ত করেছি। অনেকেই আপত্তি জানাতে পারেন যে, আমরা এই প্রস্তাবে ভারতকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কেন উল্লেখ করিনি। বলতে পারি যে, আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং আমি আশা করি, ভারতবর্ষ একটি সমাজতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করতে অগ্রণী হবে এবং আমার বিশ্বাস যে সমগ্র বিশ্বই এই পথে এগিয়ে যাবে।

সংবিধান সভার বিতর্ক (CAD) - প্রথম খণ্ড

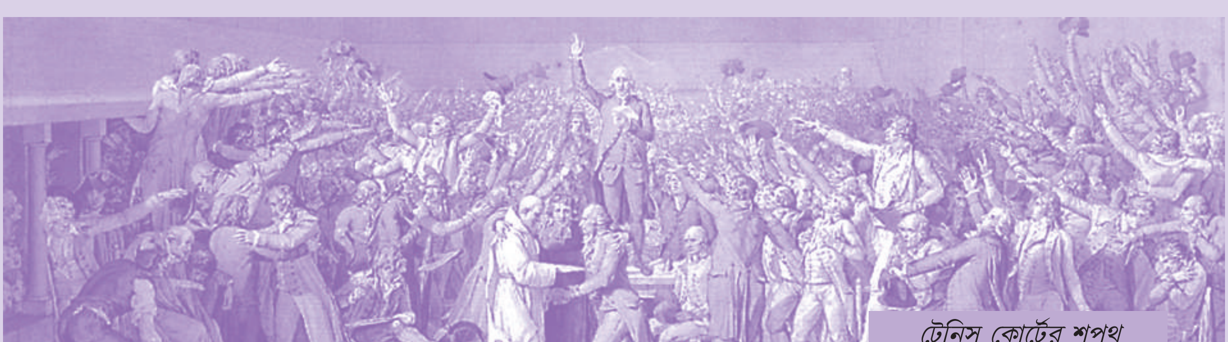

টেনিস কোর্টের শপথ

হয়েছিল? আপাতদৃষ্টিতে নেহেরুর অতীতে প্রত্যাবর্তন থেকে কী জানা যায়? সংবিধানের দৃষ্টিতে মূর্ত ধারণার উৎস সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন? অতীতের দিকে গিয়ে আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে নেহেরু ভারতে সংবিধান রচনার ইতিহাসকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের একটি দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। অতীতের বৈপ্লবিক মুহূর্তগুলোর সঙ্গে ভারতীয় প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিকে যুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নেহেরুর বক্তব্যের অর্থ এই ছিল না, এইসব ঘটনাগুলো আজকের জন্য কোনো নীল নক্‌শা সরবরাহ করবে, অথবা এইসব বিপ্লবের ধারণাগুলো বিনা বিচারে ধার নিয়ে ভারতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপটি সংজ্ঞায়িত করেন নি এবং আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের গণতন্ত্রের রূপরেখা তৈরি করার পরামর্শ দেন এবং তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ এবং বিধানগুলো অন্যত্র থেকে পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছিলেন, "আমরা শুধু অনুকরণ করতে চাইছি না।" তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতে যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তা "আমাদের মানুষদের মনোভাবের সাথে মানানসই এবং তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যও হতে হবে।" পাশ্চাত্যের লোকদের উপলব্ধি ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমী দেশগুলোকেও এবং তাদেরকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল গণতন্ত্রের নিজস্ব ধারণার পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হবে গণতন্ত্রের উদার ধারণা এবং আর্থিক ন্যায়বিচারকে সমাজতান্ত্রিক ধারণার সাথে মিশ্রিত করা এবং ভারতীয় প্রসঙ্গে এইসব ধারণাগুলোর পূনর্গ্রহন এবং পুনরায় কাজ করা। নেহেরুর দাবি ছিল সৃজনশীল চিন্তাভাবনা যা ছিল ভারতের জন্য উপযুক্ত।

➲ উৎস নং 1-এ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে "গণতান্ত্রিক" শব্দটি ব্যবহার না করার জন্য জহরলাল নেহেরু কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

2.1 মানুষের ইচ্ছা

সংসদের কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী গণপরিষদের আলোচনার উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। তিনি সংসদ সদস্য এবং সাধারণ ভারতীয়দের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হবার আহ্বান জানান। 1946-47 সালের শীতকালে, যখন সংবিধান সভার আলোচনা চলছিল, তখনও ব্রিটিশরা ভারতে ছিল। জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে তখন একটি অন্তবর্তীকালীন প্রশাসন ছিল, কিন্তু তখন সব কাজ ভাইসরয় এবং লন্ডনের ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে পরিচালিত হত। লাহিড়ী তাঁর সহকর্মীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, গণপরিষদটি ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এবং সেখানে "ব্রিটিশদের পরিকল্পনাগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিল।"

নেহেরু স্বীকার করেছেন যে, বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদী নেতারা একটি ভিন্ন ধরনের গণপরিষদ চান। এটিও এক অর্থে সত্য ছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের "এর

চিত্র 15.6
অন্তবর্তীকালীন সরকারের সদস্যবৃন্দ
সামনের সারি (বামদিক থেকে ডানদিক) বলদেব সিং, জন মাথাই, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, জওহরলাল নেহেরু, লিয়াকত আলি খান, বল্লভভাই প্যাটেল, আই. আই. চুন্দ্রিগর, আসফ আলি, সি. এইচ. ভাবা।
পেছনের সারিতে (বামদিক থেকে ডানদিক) জগজীবন রাম, গজনফার আলি খান, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আব্দুর নিস্টার।

উৎস 2

খুব ভালো, মহাশয় - সপ্রতিভ শব্দ, অভিজান/উদাত্ত শব্দ

সোমনাথ লাহিড়ী বলেছিলেন :

মহাশয়, আমি পণ্ডিত নেহেরুকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে পারি কারণ তিনি ভারতীয় জনগণের ভাবনাকে সঠিক শব্দে ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন ইংরেজদের আরোপিত কোনো কিছুই ভারতীয়রা গ্রহণ করবে না। তিনি বলেছিলেন, এই ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হলে আপত্তি জানানো হবে, এবং আরোও বলেছেন প্রয়োজন হলে, আমরা সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তুলব। এটি খুব ভাল স্যার, সপ্রতিভ শব্দ, মহৎশব্দ।

তবে দেখতে হবে যে, তুমি কখন কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। ঠিক আছে, মহাশয় মোদ্দাকথা হল এখন এখানে সব আরোপ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ পরিকল্পনা কেবল ভবিষ্যৎ সংবিধান তৈরি করে নি ... এটি ব্রিটিশদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল হবে। বরং সামান্য মত পার্থক্যের জন্য তোমাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে যেতে হবে বা ইংল্যান্ডে গিয়ে নাচে উপস্থিত থাকতে হবে, বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বা অন্য কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কেবল এটিই সত্য নয় যে, আমরা যা কিছুই পরিকল্পনা গ্রহণ করি না কেন, এই গণপরিষদ ব্রিটিশ বন্দুক, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, তাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক কঠোরতার রয়েছে - এর অর্থ আসলে চূড়ান্ত ক্ষমতা এখনো ব্রিটিশদের হাতে রয়েছে এবং ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি, যার অর্থ আমাদের ভবিষ্যৎ এখনোও পুরোপুরি আমাদের হাতে নেই। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি এটলি এবং অন্যদের দেওয়া বক্তব্যগুলো থেকে স্পস্টতই বোঝা যায় যে, প্রয়োজন হলে তা বিভাজনও ঘটাতে পিছু হটবে না। মহাশয় এর মানে হচ্ছে এই দেশের কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই। যেমন কিছুদিন আগে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল লিখেছেন আমাদের শুধু নিজেদের মধ্যে লড়াই করার স্বাধীনতা আছে। আমরা শুধু এতটুকু স্বাধীনতাই পেয়েছি ...। তাই আমাদের বিনীত পরামর্শ হল এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ণের মাধ্যমে কিছু অর্জন করার প্রশ্ন নয় বরং এখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আহ্বান করা, ভারতবাসীকে আহ্বান জানাতে হবে নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে নজর দিতে, যাদের হাতে এখনোও চাবুক রয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ — এর বিরুদ্ধে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করুন এবং যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করব, তখন আমরা আমাদের দাবিগুলোর সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে পারব।

সংবিধান সভা বিতর্ক, খণ্ড 1 (CAD, VOL.I)

গঠনে বড়ো হাত ছিল" এবং এটি সংসদের কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছিল। 'তবে' নেহেরু জোর দিয়ে বলেছিলেন "আপনাদের এই উৎসকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না যেখান থেকে এই পরিষদ শক্তি অর্জন করেছে।"
নেহেরু আরো বলেছেন :

> সরকারি কাগজপত্র দ্বারা সরকার গঠিত হয় না। সরকার হচ্ছে, আসলে মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ। আজ আমরা এখানে মিলিত হতে পেরেছি কারণ আমাদের সাথে মানুষের শক্তি আছে এবং আমরা ততদূর যাব যতদূর মানুষ আমাদের নিয়ে যেতে চায় তা যে-কোনো দল বা গোষ্ঠীর সম্বন্ধে হোক না কেন। সুতরাং আমাদের সর্বদাই ভারতীয় জনগণের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগগুলো মনে রাখা উচিত এবং সেগুলো পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করা উচিত।

গণপরিষদ সেই লোকেদের আশা আকঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে বলে আশা করা হয়েছিল যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গণতন্ত্র, সাম্যতা এবং ন্যায়বিচারের মতো আদর্শ ঊনিশ শতক থেকে ভারতে সামাজিক সংগ্রামের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। ঊনিশ শতকে সমাজ সংস্কারকরা যখন বাল্য বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ দেওয়ার সমর্থন করেছিলেন তখন তারা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আবেদন জানায়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রচার করছিলেন তখন তিনি চেয়েছিলেন ধর্মকে আরো ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্রে যখন জ্যোতিবা ফুলে ... নীচু জাতির দুঃখকষ্টের কথা বা কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টরা শ্রমিক এবং কৃষকদের সমস্যার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিল তখন তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি করছিল। নিপীড়িনকারী এবং অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন ছিল গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য, নাগরিকদের অধিকার ও সাম্যের জন্য লড়াই।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিনিধিদের দাবি দাওয়া বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রিটিশরা একাধিক সাংবিধানিক সংস্কার চালু করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে (1909, 1919 এবং 1935) বেশ কয়েকটি আইন পাশ করা হয়েছিল। 1919 সালে প্রাদেশিক আইনসভার জন্য আংশিকভাবে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং 1935 সালে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে তা পুরোপুরি কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্বে চলে আসে। ১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট অনুসারে যখন 1937 সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন এগারটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তা সত্ত্বেও আমাদের সাংবিধানিক উন্নয়ন তথা 1946 সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর যা ঘটেছিল সেগুলোকে সাংবিধানিক রূপে একটি প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা

➲ উৎস নং 2 -এ বক্তার এটা কেন মনে হচ্ছে যে গণপরিষদটি ব্রিটিশ বন্দুকের ছায়ায় কাজ করছে?

চিত্র 15.7
এডউইন মন্টেগু (বাঁদিকে) 1919 খ্রিস্টাব্দে মন্টেগো চেমর্সফোর্ড সংস্কারের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন যার দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভায় সীমিত প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

➲ আলোচনা করো...

জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতায় উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য কোন্ ধারণাগুলো বর্ণিত হয়েছিল?

মনে করলে ভুল হবে। যদিও বিগত দিনের সাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপগুলো একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের জন্য ক্রমবর্ধমান দাবি পূরণ করা সম্পন্ন হয়েছিল, তথাপি (1909, 1919 এবং 1935)-এর আইনগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না। ঔপনিবেশিক সরকার এই আইনগুলো প্রণয়ন করেছিল। প্রদেশিক সংস্থাগুলো নির্বাচন করার জন্য নির্বাচকমণ্ডলী সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু 1935 সালে ও ভোটদানের অধিকার সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের 10 থেকে 15 শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 1935-এর আইন অনুযায়ী নির্বাচিত আইনসভাগুলো ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল এবং ব্রিটিশদের দ্বারা নিযুক্ত গভর্নরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। 1946 সালের 13 ডিসেম্বর নেহেরু যে কল্পনার কথা বলেছিলেন, তা ছিল একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা।

3. অধিকার নির্ধারণ

নাগরিকদের অধিকার কীভাবে নির্ধারণ করা হত? নিপীড়িত সম্প্রদায়ের কি কোনো বিশেষ অধিকার ছিল? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কী অধিকার ছিল? বাস্তবে কাদের সংখ্যালঘু বলা যায়? ধীরে ধীরে গণপরিষদ যখন বিস্তৃতভাবে বিতর্ক শুরু হয় তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই প্রশ্নের এমন কোনো উত্তর নেই যাতে পুরো সভা সহমত পোষণ করে। এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন মতামতের সংঘাত এবং পৃথক মতভেদ থেকে অভিব্যক্ত হয়েছিল। উদ্বোধনী ভাষণে নেহেরু "জনগণের ইচ্ছার আহ্বান করেন এবং বলেন যে সংবিধানের নির্মাতাদের "জনগণের অন্তরের আবেগগুলো" পূরণ করতে হবে। এই কাজটি খুব সহজ ছিল না। স্বাধীনতার প্রত্যাশা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং বিভিন্ন দাবি করেছিল। এইসব অভিব্যক্তিগুলোর উপর বিতর্ক করা প্রয়োজন ছিল এবং কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে সবাই একমত হওয়া প্রয়োজন।

3.1 পৃথক নির্বাচক নিয়ে সমস্যা

1947 সালের 27 আগস্ট মাদ্রাজের বি.পোকর বাহাদুর পৃথক নির্বাচকের পক্ষে এক শক্তিশালী আবেদন জানান। বাহাদুর যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সব জায়গাতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে, তাদের দূরে রাখা যায় না, তাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা যায় না। আমাদের প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করা যাতে সংখ্যালঘুরা অন্যদের সাথে মিলেমিশে থাকতে পারে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য হ্রাস করা যেতে পারে। এটি তখনই সম্ভব হবে যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের ভালো প্রতিনিধিত্ব থাকে, তাদের বক্তব্য শোনা হয় এবং তাদের মতামতকে বিবেচনা করা হয়। দেশের শাসনব্যবস্থায় মুসলমানদের সার্থক মতপ্রকাশের জন্য পৃথক নির্বাচন অপেক্ষা অন্য কোনো রাস্তা নেই। বাহাদুর মনে করতেন, মুসলমানদের প্রয়োজনীয়তা

অমুসলিমরা সঠিকভাবে বুঝতেও পারে না, আবার অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না।

পৃথক নির্বাচনের দাবি বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দেয়। এই বিষয়ে বিতর্ক হবার পর, এই দাবির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত যুক্তি দেওয়া হয়। বেশিরভাগ জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন যে, পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা জনগণকে বিভক্ত করার জন্য ব্রিটিশদের একটি চাল। আর.ভি.ধুলকর বাহাদুরকে বলেছিলেন "ইংরেজরা সংরক্ষণের নামে তাদের খেলাটি খেলেছিল"। এর আড়ালে তাঁরা তোমাদের (সংখ্যালঘুদের) লোভ দেখাচ্ছে। এখনই এই অভ্যাস ছেড়ে দাও ... এখন তোমাদের বিপথগামী করার মতো কেউ নেই।

বিভাজনের ফলে জাতীয়তাবাদীরা পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবে আরো বিরোধী করে তুলেছিল। তাঁরা সবসময় গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা এবং হিংসার আশঙ্কা করত। সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন পৃথক নির্বাচন হল "একধরনের বিষ যা আমাদের দেশের পুরো রাজনীতিতে প্রবিষ্ট হয়েছে।" এটি এমন একটি দাবি ছিল যা একটি সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের শত্রুতায় পরিণত করে, রাষ্ট্রকে বিভক্ত করেছিল, রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং দেশের করুণ বিভাজনের দিকে পরিচালিত করেছিল। প্যাটেল বলেছিলেন, "তোমরা কি এই দেশে শান্তিতে বসবাস করতে চাও? যদি চাও তাহলে এর থেকে দূরে থাক। (পৃথক নির্বাচন)

পৃথক নির্বাচনের দাবির উত্তরে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলেছিলেন যে, এটি কেবল রাষ্ট্রের জন্য নয়, সংখ্যালঘুদের জন্যও ক্ষতিকর। তিনি বাহাদুরের সাথে এই বিষয়ে

চিত্র 15.8
1946 সালের শীতকালে ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির সাথে দেখা করতে লন্ডনে গিয়েছিলেন। এইসব আলোচনার কোনো ফলশ্রুতি বের হয়নি। (বাঁ দিক থেকে ডানদিকে লিকায়েত আলী, মহম্মদ আলী জিন্না, বলদেভ সিং এবং প্যাথিক-লরেন্স)

উৎস 3

"ব্রিটিশরা চলে গেছে, কিন্তু যাওয়ার সময় তাদের কুকর্মের বীজ রেখে গেছে।"“

সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল বলেছিলেন :

এটা আলাদা করে বলা হচ্ছে না যে, আমরা পৃথক নির্বাচনের দাবি করছি কারণ এটি আমাদের পক্ষে ভালো। আমরা বহু বছর ধরে এটি শুনে আসছি, এবং এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আমরা এখন একটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত ... আপনারা কি আমাকে একটিও স্বাধীন রাষ্ট্র দেখাতে পারবেন যেখানে পৃথক নির্বাচন হয়? যদি আমাকে দেখাতে পারেন, তাহলে আমি আপনাদের কথা মেনে নেব। তবে এই দুর্ভাগা দেশে বিভাজনের পরেও যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকে তাহলে আফসোসের সাথে বলতে হয়, এদেশে বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই। তাই, আমি বলছি, এটি শুধু আমার একার জন্য নয়, বরং আপনাদেরও কল্যাণের জন্য আমি বলছি। অতীতকে ভুলে যান, একদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি ... ব্রিটিশরা চলে গেছে কিন্তু যাওয়ার সময় তাদের কুকর্মের বীজ রেখে গেছে। আমরা সেই কুকর্মকে টিকিয়ে রাখতে চাই না। (শুনুন, শুনুন)। ব্রিটিশরা যখন এই প্রস্তাব পেশ করেছিল তখন তারা ভাবতে পারেনি যে তাদের এত তাড়াতাড় এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা তাদের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এটি করেছিল। ঠিক আছে, তবে তারা তাদের উত্তরাধিকারী পিছনে ফেলে গেছে, এখন আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসব কি?

CAD, VOL.V

একমত ছিলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কতটুকু উদ্ভূত হয়েছে তার ওপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি এব্যাপারেও একমত ছিলেন যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যাতে ‘‘কেবল তার পার্থিব চাহিদা পূরণ নয় বরং তাদের আত্ম অভিমানের আধ্যাত্মিকবোধও জাগ্রত হয়’’, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হল তারা সংখ্যালঘুদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করবে এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে। তবু পন্থ পৃথক নির্বাচনের ধারণার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলে যে, এটি একটি আত্মঘাতী দাবি, যা সংখ্যালঘুদের স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাদেরকে দুর্বল করে দেবে এবং সরকারে তাদের কোনো কার্যকরি ভূমিকা থাকবে না।

উৎস 4

‘‘আমি বিশ্বাস করি যে পৃথক নির্বাচন সংখ্যালঘুদের জন্য আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে।’’

27 আগস্ট 1947 সংবিধানের বিতর্ক সভায় গোবিন্দ বল্লভ পন্থ বলেন :

আমি বিশ্বাস করি পৃথক নির্বাচন সংখ্যালঘুদের জন্য প্রাণঘাতী / আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে এবং তাতে তাদের চরম ক্ষতি হবে। যদি তাদের চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তবে তারা কখনোই নিজেদের সংখ্যাগুরুতে পরিণত করতে পারবে না এবং হতাশার অনুভূতি শুরু থেকেই তাদের পঙ্গু করে দেবে। আপনারা কি চান এবং আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী? সংখ্যালঘুরা কি সর্বদা সংখ্যালঘু হিসেবে থাকতে চায় নাকি তারাও একদিন মহান রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ গঠনের এবং এর নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার আশা করে? আমি মনে করি যদি তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে থাকে যদি তাদের বায়ু নিরোধক বগিতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয় যেখানে তাদের শ্বাসকষ্টের জন্যও অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় তবে এটি তাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে ... সংখ্যালঘুরা যদি পৃথক নির্বাচন বিজয়ী হয়ে আসে তবে তাদের বক্তব্য কখনোই সক্রিয় মতামত রাখতে পারবে না।

সংবিধান বিতর্কসভা, দ্বিতীয় খণ্ড (*CAD*, VOL.II)

➲ 3 নং ও 4 নং উৎস পড়ো। পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে কী কী যুক্তি দেওয়া হচ্ছে?

এই সমস্ত যুক্তির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করা। রাজনৈতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রে নাগরিক ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে, প্রতিটি সম্প্রদায়কেই রাষ্ট্রের মধ্যে অঙ্গীভূত করা হতে হবে।

সংবিধান নাগরিকদের অধিকার প্রদান করবে, তবে নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলো সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে এবং তাদের সাংস্কৃতিক অধিকারকে আশ্বাস দেওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সব সম্প্রদায়ের সদস্যদের রাজ্যের সমান সদস্য হিসেবে কাজ করতে হবে অন্যথায় তাদের আনুগত্যেও বিভাজন হবে। পন্থ বলেন, আমাদের এরকম ক্ষতিকর এবং আত্মঘাতী স্বভাব তৈরি হয়েছে যে আমরা কখনোও নিজেদের নাগরিক রূপে চিন্তা করি না বরং সম্প্রদায়রূপে চিন্তা করি।" তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে নাগরিকদের অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। নাগরিকরাই হচ্ছে সামাজিক পিরামিডের শিখর এবং পাশাপাশি সামাজিক ভিত্তি পত্তন করে।" যখন জনসাধারণের অধিকারের গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছিল তখন অনেক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ভয় দেখা দিয়েছিল যে এর ফলে আনুগত্য বিভাজিত হবে এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বা রাজ্য গঠন করতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে।

সমস্ত মুসলিমরা পৃথক নির্বাচনের দাবি সমর্থন করেনি। উদাহরণস্বরূপ, বেগম আইজাস রসুল মনে করেছিলেন যে, সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পৃথক নির্বাচন আত্মঘাতী প্রমাণিত হবে। 1949 সালের মধ্যে, গণপরিষদের বেশিরভাগ মুসলিম সদস্য এই ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে, পৃথক নির্বাচন সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী ছিল। এছাড়াও মুসলমানদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল যাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরও বলিষ্ঠ মতামত থাকে।

3.2 "আমাদের এই প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন"

উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে স্বাগত জানানোর জন্য কৃষক আন্দোলনের নেতা এবং সমাজতান্ত্রিক এন.জি.রঙ্গা সংখ্যালঘু শব্দটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করার আহ্বান করেন। রঙ্গোর নজরে আসল সংখ্যালঘুরা ছিল দরিদ্র ও নিপীড়িত। সংবিধানে যে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিচ্ছে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, তবে তিনি এর সীমাবদ্ধতাকেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে গ্রামাঞ্চলের গরীব জনগণের জন্য এটা জানা অর্থহীন যে তাদের বেঁচে থাকার, পুরোপুরি রোজগার করার মৌলিক অধিকার আছে বা তাদের সভা সম্মেলন করার অধিকার আছে, তাদের সংগঠন করার এবং অন্যান্য নাগরিক স্বাধীনতা আছে। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা প্রয়োজন ছিল যেখানে এই সংবিধানিক অধিকারিগুলো জনগণ কার্যকরিভাবে উপভোগ করতে পারে। এর জন্য তাদের সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। রঙ্গা বলেছিলেন, তাদের একটি অবলম্বন প্রয়োজন। তাদের একটি সিঁড়ি / মই প্রয়োজন।"

রঙ্গা ভারতীয় জনগণ এবং সংবিধান সভায় তাদের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে যারা

উৎস 5

"আনুগত্যের জন্য সেখানে বিভক্ত হতে পারে না।"

গোবিন্দ বল্লভ পন্থ যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনুগত নাগরিক হওয়ার জন্য মানুষকে শুধুমাত্র সম্প্রদায় ও নিজের কথা চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে :

> গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ব্যক্তিকে আত্মানুশাসনের পদ্ধতির প্রশিক্ষণ নিতে হবে। গণতন্ত্রে ব্যক্তিকে নিজের জন্য কম তথা অন্যের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। এখানে খণ্ডিত আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। কেবলমাত্র রাজ্যের প্রতি সমস্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত। যদি কোনো গণতন্ত্রে তুমি বিরোধী আনুগত্য রেখে দাও বা এমন অবস্থা হয় যাতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার অপব্যয় দমিত করার পরিবর্তে বৃহত্তর বা অন্যান্য স্বার্থের প্রতি কোনো গুরুত্ব না দেয় তাহলে গণতন্ত্র বিনষ্ট হয়।

সংবিধান সভা বিতর্ক
দ্বিতীয় খণ্ড (*CAD,* VOL.II)

➲ জে.বি.পন্থ কীভাবে একজন অনুগত নাগরিকের গুণাবলি নির্ধারণ করেন?

উৎস 6

“প্রকৃত সংখ্যালঘুরা হচ্ছে এই দেশের জনসাধারণ”

জহরলাল নেহেরু দ্বারা উপস্থাপিত উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে এন.জী.রঙ্গা বলেছেন :

> মহাশয়, সংখ্যালঘুদের নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আসল সংখ্যালঘু কারা? তথাকথিত পাকিস্থান প্রান্তে বসবাসকারী হিন্দু, শিখ বা মুসলিমরাও সংখ্যালঘু নয়। না, প্রকৃত সংখ্যালঘুরা হচ্ছে এই দেশের জনসাধারণ। এই লোকেরা এতটাই অবনমিত, নিপীড়িত এবং দমিত যে তারা এখনোও সাধারণ নাগরিকের অধিকারের লাভও ওঠাতে পারছে না। পরিস্থিতিটা কী? আপনি আদিবাসী এলাকায় যান, তাদের নিজস্ব আইন। তাদের ঐতিহ্যবাহী আইন ও তাদের উপজাতি আইন অনুযায়ী তাদেরকে তাদের নিজস্ব জমি থেকে উৎখাত করা যেত না। কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীরা সেখানে যায় এবং তথাকথিত মুক্ত বাজারের নামে তাদের জমি ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। যদি এইভাবে জমি ছিনিয়ে নেওয়া আইন বিরুদ্ধ কাজ তথাপিও ব্যবসায়ীরা আদিবাসী জনগণকে বিভিন্ন ধরনের বন্ধনে যুক্ত করে দাসে পরিণত করতে এবং বংশপরম্পরায় তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। আসুন, এবার আমরা সাধারণ গ্রামবাসীদের দিকে দেখি। সেখানে মহাজনরা টাকাপয়সা নিয়ে যায় এবং গ্রামবাসীদের নিজের পকেটে ভরে নিতে সক্ষম হয়। সেখানে জমির মালিক স্বয়ং, জমিদার এবং মালগুজার এবং অন্য আরোও লোক আছে যারা এই গরিবদের শোষণ করে। এমনকি এই লোকদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নেই। তারাই হচ্ছে আসলে সংখ্যালঘু এবং তাদেরই সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন। তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের শুধু এই প্রস্তাবে কাজ হবে না।

CAD, VOL.II

➲ রঙ্গা দ্বারা “সংখ্যালঘু” ধারণা কীবাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়?

দাবি জানিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। তিনি বলেন :

> আমরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছি? আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের এবং এখনোও আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোক সেই সাধারণ জনগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা তাদেরই, আমরা তাদের পক্ষে দাঁড়াতে চাই, কিন্তু জনগণ নিজে সংবিধান সভায় আসতে পারছে না। এতে কিছু সময় লাগতে পারে। আমরা তাদের বিশ্বস্তদের মতো তাদের রক্ষকের মতো এবং তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

রঙ্গা আদিবাসীদের একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে জয়পাল সিং-এর মতো বক্তা ছিলেন। উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে জয়পাল সিং বলেছিলেন :

> ... একজন আদিবাসী হওয়ার দরুন এটা আশা করা হয় না যে আমি উদ্দেশ্য প্রস্তাবের আইনি জটিলতা বুঝতে পারব। কিন্তু আমার সাধারণ বিবেক আমাকে বলেছে যে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার দিকে যাত্রা করা উচিত এবং একসাথে লড়াই করা উচিত। মহাশয়, যদি ভারতীয় জনগণের মধ্যে এমন কোনো সম্প্রদায় আছে যাদের সাথে সঠিক আচরণ করা হয় না তারা আমার লোক। আমার লোকদের সাথে গত 6000 বছর ধরে অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে ... আমার জনগণের পুরো ইতিহাস হল ভারতের অ-আদিবাসীদের দ্বার ক্রমাগত শোষণ ও স্থানচ্যুত করার ধারাবাহিক ইতিহাস যার মধ্যে বিদ্রোহ ও অব্যবস্থাও যুক্ত। তা সত্ত্বেও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর বক্তব্যের উপর বিশ্বাস রাখছি। আমি আপনাদের সবার এই কথাটি বিশ্বাস করছি যে আমরা এখন একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি, স্বাধীন ভারতের একটি নতুন অধ্যায় যেখানে সুযোগের সমতা রয়েছে, যেখানে কেউ অবহেলিত হবে না।

সিং আদিবাসীদের সুরক্ষা তথা তাদেরকে সাধারণ জনগণের স্তরে নিয়ে আসার জন্য সহায়তা করার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছিলেন আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে উপজাতিরা সংখ্যালঘু নয়, কিন্তু তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। তারা যেখানে বসবাস করত সেখান থেকে তাদের উৎখাত করা হয়, তাদের বন ও চারণভূমি থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদেরকে নতুন বাড়ির সন্ধান করতে বাধ্য করা হয়। তাদেরকে আদিম এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে তকমা দিয়ে সমাজের অন্যেরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ত্যাগ করেছিল। তিনি আদিবাসীদের এবং সমাজের বাকিদের মধ্যে আবেগময় ও প্রাকৃতিক/পার্থক্যকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন করেছিলেন: "আমাদের বক্তব্য হল আপনাদের আমাদের সাথে মেলামেশা করা প্রয়োজন। আমরা আপনাদের সাথে মিশতে চাই..."। জয়পাল সিং পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন না, তবে তিনি অনুভব করেছিলেন যে আইনসভায় উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আসন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, এভাবে অন্যান্য উপজাতিদের কণ্ঠস্বর শুনতে এবং তাদের নিকটে আসতে বাধ্য করা যাবে।

3.3 "হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পদানত করে রাখা হয়েছিল"

সংবিধানে অবদমিত জাতিদের অধিকারকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল? জাতীয় আন্দোলনের সময় আম্বেদকর অবদমিত জাতিদের জন্য পৃথক নির্বাচনের

দাবি জানিয়েছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধি এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে এর ফলে এই সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে সমাজের বাকি অংশ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সংবিধান সভা এই বিরোধিতার সমাধান কীভাবে করবে? অবদমিত জাতিকে কী ধরনের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল?

অবদমিত জাতির কিছু সদস্য জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "অস্পৃশ্য" সমস্যা কেবল সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না। তাদের এই প্রতিবন্ধকতা জাতি বিভাজিত সমাজের সামাজিক রীতিনীতি এবং নৈতিক মূল্যবোধের কারণে ঘটেছিল। সমাজ তাদের সেবা এবং শ্রম ব্যবহার করেছিল কিন্তু তাদের সাথে মিশতে চাইত না, তাদের সাথে একসাথে ভোজন করতে বা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, সামাজিকক্ষেত্রে তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখা হত। মাদ্রাজের জে.নাগাপ্পা বলেন, "আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু এখন আর কষ্ট সহ্য করতে রাজী নই।" আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝতে পেরেছি। আমরা জানি কীভাবে আমাদের নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হবে।"

নাগাপ্পা বলেছেন যে, সংখ্যার দৃষ্টিতে হরিজনরা সংখ্যালঘু নয় : সমগ্র জনসংখ্যার 20 থেকে 25 শতাংশ। তাদের ভোগান্তির কারণ ছিল সামাজিক নীতি দ্বারা প্রান্তিকীকরণ, সংখ্যাগত কারণের কোনো গুরুত্ব ছিল না। তাদের কাছে শিক্ষাও পৌঁছায় নি এবং তারা প্রশাসনের কোনো কাজেও তাদের অংশীদারী ছিল না। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রদেশসমূহের কে.জে.খাণ্ডেকার বলেছিলেন :

> আমাদের হাজার বছর ধরে দমিয়ে রাখা হয়েছে ... এতটাই দমন করা হয়েছে যে আমাদের মন, আমাদের শরীর এমনকি আমাদের হৃদয়ও কাজ করে না, আমরা এগিয়ে যেতেও সক্ষম নই। এটাই আমাদের পরিস্থিতি।

দেশভাগের হিংসার পরে আম্বেদকরও পৃথক নির্বাচনের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে সংবিধান সভা সুপারিশ করেছিল যে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত করা উচিত। হিন্দু মন্দিরগুলো সকল বর্ণের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হোক। নিম্নবর্ণের মানুষদের আইনসভায় আসন এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেছিলেন এটি সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে না : সামাজিক

➲ আলোচনা করো...

উপজাতিদের সুরক্ষা দেওয়ার দাবি করতে গিয়ে জয়পাল সিং কী কী যুক্তি রেখেছিলেন?

উৎস 7

"আমরা আমাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতার অপসারণ করতে চাই"

মাদ্রাজের দক্ষিণায়ন ভেলাউধন-এর যুক্তি ছিল :

> আমরা সবধরনের সুবিধা চাই না। এই দেশের দুর্বল জাতিদের নৈতিক সুরক্ষার জন্য সংরক্ষণ দরকার ... আমি এটা বিশ্বাস করি না যে সাত কোটি হরিজনকে সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করা হবে ... যেটা আমরা চাই তা হল ... অবিলম্বে আমাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
>
> *CAD*, VOL.I

উৎস 8

আমরা কখনো বিশেষ অধিকারের দাবি করিনি

বোম্বের হানসা মেহতা নারীদের ন্যায়বিচারের দাবি করেছেন, বা পৃথক নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

> আমরা কখনোই বিশেষ অধিকারের দাবি করিনি। আমরা সামাজিক ন্যায়, আর্থিক ন্যায় এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়েছি। আমরা সেই সমতার দাবি করেছি যা পারস্পরিক শ্রদ্ধাও বোঝার ভিত্তি হতে পারে। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা সম্ভব নয়।

বৈষম্যকে কেবল সাংবিধানিক আইন দ্বারা মুছে ফেলা যায় না, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তবে গণতান্ত্রিক জনগণ এই পদক্ষেপগুলোকে স্বাগত জানিয়েছে।

4. রাজ্যের ক্ষমতাবলি

সংবিধান সভায় সবচেয়ে তীব্র বিতর্ক হওয়া বিষয়টি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অধিকার। জওহরলাল নেহরু এবং রাজ্য সরকারের অধিকার। জওহরলাল নেহেরু ছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে মতামত প্রকাশকারীদের মধ্যে একজন। সংবিধান সভার সভাপতিকে লেখা পত্রে তিনি উল্লেখ করেন "এখন যখন বিভাজন একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হল ... যে শাসন শান্তি সুনিশ্চিত করতে, জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের জন্য কার্যকরিভাবে কথা বলতে পারবে না, এরকম একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।"

খসড়া সংবিধান তিনটি বিষয়ের তালিকা তৈরি করেছিল : কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। প্রথম তালিকার বিষয়গুলো কেন্দ্র সরকারের সংরক্ষণে থাকবে, যেখানে দ্বিতীয় তালিকার বিষয়গুলো রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তৃতীয় তালিকার বিষয়গুলো যৌথভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দায়িত্বে থাকবে। তবে অন্যান্য যুক্তরাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি বিষয়কে একচেটিয়া কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং রাজ্যগুলোর ইচ্ছা অনুসারে যৌথ তালিকায় অনেক বেশি বিষয় রাখা হয়। খনিজ পদার্থ এবং প্রধান প্রধান শিল্পগুলোর উপরও কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাছাড়া 356 ধারায় রাজ্যপালের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে অধিগ্রহণ করতে পারবে।

সংবিধানে যৌথ অর্থব্যবস্থার একটি জটিল পন্থাও তৈরি করা হয়। কিছু করের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ আমদানি রপ্তানি শুল্ক এবং কোম্পানির বিভিন্ন শুল্ক) সব আয় কেন্দ্র সরকারের অধীনে রাখা হয়; অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন আয়কর এবং আবগারি শুল্ক) রাজ্যগুলোর সঙ্গে ভাগ করা হয়; অবশিষ্ট অন্যগুলোর ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ রাজ্যস্তরের শুল্ক) পুরোপুরি রাজ্যকে দেওয়া হয়। রাজ্যগুলো নিজেরা খাজনা আদায় এবং নির্দিষ্ট কিছু কর সংগ্রহ করতে পারত : এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল জমি এবং সম্পত্তির উপর কর, বিক্রয় কর এবং বোতল বন্দি তরল বস্তুর উপর প্রভূত মুনাফাযোগ্য কর।

4.1 "কেন্দ্র ভাঙ্গার সম্ভাবনা"

রাজ্যের অধিকারগুলো মাদ্রাজের সদস্য কে.সান্থানাম দ্বারা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে রক্ষিত হয়েছিল। তিনি মনে করেন, কেবলমাত্র রাজ্যগুলোকেই নয় উপরন্তু

উৎস 9

উত্তম দেশপ্রেমিক কে?

মহিশূরের সদস্য স্যার এ.রামস্বামী মুদালিয়ার 21শে আগস্ট 1947-এ বিতর্ক চলাকালীন বলেন :

> আমরা আমাদের মনকে চাটুকারিতার মলম লাগাব না এই বলে যে যদি আমরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলি তবে আমরা উত্তম দেশপ্রেমিক এবং যারা এই সম্পদগুলোর জোরালো পরীক্ষার সমর্থক তাদের মধ্যে যথেষ্ট জাতীয় ভাবনা অথবা দেশভক্তি ছিল না।

কেন্দ্রকেও শক্তিশালী করার জন্য ক্ষমতার পুনর্বণ্টন প্রয়োজন ছিল। "প্রায় একটি বদ্ধমূল ধারণা হল যে, সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে আমরা কেন্দ্রকে শক্তিশালী করতে পারি" সান্থানাম বললেন, এটা ছিল একটি ভ্রান্তধারণা। যদি কেন্দ্রের দায় দায়িত্বের বোঝা অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে এটা কার্যকরিভাবে কাজ করতে পারবে না। কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এবং এগুলোকে রাজ্যগুলোর উপর সঁপে দিলে বাস্তবিকই কেন্দ্র আরও বেশি শক্তিশালী হতে পারে।

রাজ্যের প্রশ্নে সান্থানাম মনে করেন যে, প্রস্তাবিত ক্ষমতার বণ্টন তাদের পঙ্গু করে ফেলে। আর্থিক বন্দোবস্ত প্রদেশগুলোকে নিঃস্ব করে দেয় কারণ ভূমি রাজস্ব ছাড়া অধিকাংশ কর কেন্দ্রের সংরক্ষণে রাখা হয়েছিল। অর্থ ছাড়া রাজ্যগুলো উন্নয়ণের কোনো প্রকল্প কীভাবে গ্রহণ করবে? আমি এমন কোনো সংবিধান চাই না যেখানে কেন্দ্র একক ক্ষমতা ভোগ করবে এবং বলবে, "আমি আমার লোকদের শিক্ষা দিতে পারি না। আমি তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দিতে পারি না, রাস্তা এবং শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের অনুদান দিন। বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থাকে মুছে ফেলি এবং এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে (Unitary system রাজ্যের) রাখি।" সান্থানাম পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যদি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া প্রস্তাবিত ক্ষমতার বণ্টন গৃহীত হয় তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে পড়বে। তিনি বলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত প্রদেশগুলো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

প্রদেশগুলো থেকে অন্য অনেক লোকের মধ্যেও একই ধরনের ভয় প্রতিধ্বনিত হয়। যুগ্ম তালিকা এবং কেন্দ্রীয় তালিকায় নূন্যতম বিষয় রাখার জন্য তারা কঠোর সংগ্রাম করেছিল। ওড়িষার একজন সদস্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সংবিধানে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের ফলে "কেন্দ্র ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

4.2 "আজ আমাদের একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন"

প্রদেশগুলোকে অধিক ক্ষমতা দেবার দাবিতে সভায় প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গণপরিষদের অধিবেশন শুরুর পর শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনের উপর অসংখ্যবার জোর দেওয়া হয়। আম্বেদকর ঘোষণা করলেন যে, "1935 সালের ভারত (সরকারের) শাসন আইনে আমরা যে কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলাম তার চাইতেও একটি শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্র (শুনুন শুনুন) তিনি চান। সদস্যদের দাঙ্গা এবং হিংস্রতা যা দেশকে টুকরো টুকরো করেছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনেক সদস্য বার বার বলেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে সে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে রোধ করতে পারে। প্রদেশগুলোকে / রাজ্যগুলোকে ক্ষমতা দেবার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গোপালস্বামী আয়েঙ্গার জোর দিয়ে বলেন যে, কেন্দ্রকে যতটা সম্ভব শক্তিশালী করা উচিত"। সংযুক্ত প্রদেশের একজন সদস্য বালাকৃষ্ণ শর্মা দীর্ঘ যুক্তি দেখান যে, শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী কেন্দ্র দেশে কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে, একটি

উপযুক্ত / দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে।

বিভাজনের / দেশভাগের পূর্বে কংগ্রেস প্রদেশগুলোকে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে রাজি ছিল / সহমত পোষণ করে। এটা মুসলিম লিগকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা ছিল যে প্রদেশগুলোতে মুসলিম লিগ ক্ষমতায় ছিল সেখানে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করবে না। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী দেশভাগের পরে তাদের অবস্থান পরিবর্তন ঘটায় কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামোর জন্য পূর্বের রাজনৈতিক চাপ আর রইল না।

ইতোমধ্যেই সেখানে ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া একক ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের হিংস্রতা কেন্দ্রীকরণের দিকে আরও ঠেলে দেয়, এখন বিশৃঙ্খলা রোধ করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পবিকল্পনা রচনা করার প্রয়োজন বলে মনে হয়। এভাবে সংবিধান তার সমবায়ী রাজ্যগুলোর তুলনায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারের দিকে স্পষ্ট ঝোঁক দেখায়।

➲ আলোচনা করো...
একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের সমর্থনে কী কী পৃথক যুক্তি দেওয়া হত?

৮. রাষ্ট্রের ভাষা

যখন বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। তখন কীভাবে দেশ গঠন হবে? যদি লোক একে অপরের ভাষা না বুঝতে পারে তাহলে কীভাবে পরস্পর পরস্পরের কথা শুনবে অথবা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে? সংবিধান সভায় ভাষার ব্যাপারে অনেক মাস ধরে বিতর্ক হয় এবং প্রায়ই তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।

1930-এর দশকের মধ্যে কংগ্রেস স্বীকার করে নিয়েছিল যে, হিন্দুস্থানী ভাষা জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধি মনে করেন যে, যে ভাষা সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে প্রত্যেকেরই সেই ভাষায় কথা বলা উচিত। হিন্দি এবং উর্দু ভাষার মেলবন্ধনে / মিশ্রণে গঠিত হিন্দুস্থানী ভারতের অধিকাংশ শ্রেণির লোকেদের জনপ্রিয় ভাষা এবং এটি বিভিন্ন সংস্কৃতির আদান প্রদানের দ্বারা সমৃদ্ধ একটি সংযুক্ত ভাষা ছিল। অনেক বছর ধরে বিভিন্ন সূত্র থেকে অনেক শব্দ এবং অর্থ এতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বুঝতে পারে। মহাত্মা গান্ধি মনে করেন বহু সাংস্কৃতিক ভাষা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদানের আদর্শ ভাষা হতে পারে : এটা হিন্দু এবং মুসলমানদের, উত্তর এবং দক্ষিণের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে।

যাহোক উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে হিন্দুস্তানী একটি ভাষারূপে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি এবং উর্দু দূরে সরে যেতে থাকে। একদিকে ফার্সী এংব আরবীর সমস্ত শব্দ সরিয়ে শুদ্ধিকরণ করে হিন্দিকে সংস্কৃতায়ণ করা শুরু হয়। অপরদিকে উর্দু ক্রমবর্ধমানভাবে ফার্সীকরণ

উৎস 10

একটি রাষ্ট্রীয় ভাষার কী কী গুণাবলি থাকা উচিত?

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে মহাত্মাগান্ধি ভাষার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করে বলেন :

> এটি হিন্দুস্থানী না সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দি না ফার্সীনিষ্ঠ উর্দু হওয়া উচিত বরং উভয়েরই সুন্দর মিশ্রণ হওয়া উচিত। যখনই প্রয়োজন হবে তখনই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থেকে মুক্তভাবে শব্দাবলি গ্রহণ করা উচিত এবং এমন বিদেশী ভাষা থেকে শব্দাবলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা সহজেই আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা সমগ্র মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতির কথা প্রকাশে সক্ষম একটি সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী ভাষায় অবশ্যই রূপান্তরিত হবে। নিজেকে হিন্দি অথবা উর্দুতে আবদ্ধ রাখা বুদ্ধিমত্তা এবং দেশভক্তির ভাবনার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

হরিজনসেবক, 12 *অক্টোবর* 1947

হতে থাকে। ফলস্বরূপ ভাষা ধর্মীয় পরিচয়ের রাজনীতির সঙ্গো যুক্ত হয়ে পড়ে। যদিও হিন্দুস্তানীর মিশ্র চরিত্রে গান্ধিজীর আস্থা ছিল।

5.1 হিন্দির জন্য একটি অজুহাত / আবেদন

সংবিধান সভার প্রথমদিকের একটি অধিবেশনে সংযুক্ত প্রদেশের একজন কংগ্রেস সদস্য আর. ভি. ধুলেকার একটি আক্রমণাত্মক আবেদন করেছিলেন যে, হিন্দিকে সংবিধান রচনার ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হোক। যখন বলা হল যে, সভার সবাই হিন্দি ভাষা বুঝেন না তখন ধুলেকার প্রত্যুত্তরে বলেন : "ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করতে যারাই এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং হিন্দুস্তানী জানেন না তাঁরা এই সভার সদস্য হবার যোগ্য নন। তাঁদের চলে যাওয়া ভালো।" এই মন্তব্যের পর হৈচৈয়ের কারণে সভা ভেস্তে গেলে ধুলেকার হিন্দিতে তাঁর ভাষণ অব্যাহত রাখেন। জওহরলাল নেহেরুর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সভায় পুনরায় শান্তি ফিরে আসে কিন্তু পরবর্তী তিন বছর ধরে সভার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং সদস্যগণ ক্ষুব্ধ হতে থাকেন।

প্রায় তিন বছর পর, 1947 সালের 12 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রের ভাষার উপর ধুলেকারের ভাষণে আরেকবার ঝড় উঠে। এর মধ্যেই সংবিধান সভার ভাষা কমিটি তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেছিল এবং যারা রাষ্ট্রের ভাষা হিসাবে হিন্দির পক্ষে এবং বিপক্ষে ছিল তাদের মধ্যে অচলাবস্থা দূর করার জন্য একটি আপস সূত্র বের করে। সিদ্ধান্ত হয় যে দেবনাগরি হরফে হিন্দি সরকারি ভাষা হবে কিন্তু তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি। কিন্তু রূপান্তরটি হবে ধীরে ধীরে। প্রথম পনের বৎসর পর্যন্ত সমস্ত সরকারি কাজে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার হতে থাকবে। প্রত্যেক প্রদেশকে তাদের নিজেদের অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক ভাষা সরকারি কাজের জন্য বেছে নিতে পারবে। সংবিধান সভার ভাষা কমিটি হিন্দিকে জাতীয় ভাষার পরিবর্তে সরকারি ভাষা হিসাবে উল্লেখ করে আবেগকে শান্ত করার এবং সবার গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছার আশা করেছিল।

ধুলেকার এইরকম সমন্বয়সাধনের মনোভাবকে পছন্দ করার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দি সরকারি ভাষা নয়, জাতীয় ভাষা ঘোষিত হোক। তিনি তাঁদের সমালোচনা করেন যাঁরা মনে করেন যে হিন্দি জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের উপহাস করেন যারা গান্ধির নামে বলেন যে, হিন্দির পরিবর্তে হিন্দুস্তানী জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

> মহাশয়, এ ব্যাপারে আমার থেকে কেউই বেশি সুখী হবে না, হিন্দি দেশের সরকারি ভাষায় পরিণত হয়েছে ... কিছু লোক বলেন যে, এটা হল হিন্দি ভাষার প্রতি বিশেষ ছাড়। আমি বলি "না"। এটা হল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি পরিসমাপ্তি।

ধুলেকারের যুক্তির ভাষা অনেক সদস্যকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। সভার সভাপতির ভাষণ প্রদানকালে ধুলেকার অনেকবার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন, "এরকম কথা বলে আমার মনে হয় না আপনি আপনার কথাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।" কিন্তু ধুলেকার কথা বলতে থাকেন।

5.2 কর্তৃত্বের ভয়

ধুলেকারের বলার একদিন পর মাদ্রাজের সদস্যা শ্রীমতি জি. দুর্গাবাঈ যেভাবে আলোচনা এগোচ্ছিল সে সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ব্যক্ত করেন :

> সভাপতি মহাশয়, ভারতের জাতীয় ভাষার প্রশ্ন ইদানিং যে প্রস্তাব প্রায় সহমতের পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেটা হঠাৎ অতি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়। সঠিক অথবা ভুলভাবে হোক, অ-হিন্দিভাষী এলাকার লোকদের এটা অনুভব করানো হয় যে, এই বিবাদ অথবা হিন্দিভাষী অঞ্চলের পক্ষে এই আচরণ আসলে এই জাতির সমন্বয় সংস্কৃতির উপর ভারতের অপরাপর শক্তিশালী ভাষার স্বাভাবিক প্রভাবকে ফলপ্রসুভাবে কার্যকরিভাবে রক্ষা করার একটি দ্বন্দ্ব।

দুর্গাবাঈ সভায় জানায় যে, হিন্দির বিরুদ্ধে দক্ষিণের বিরোধ খুবই শক্তিশালী ছিল : "বিরোধী এই অনুভূতি সঠিক ছিল যে, হিন্দির জন্য এই প্রচার আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মূল কেটে দেয় ... এরপরেও অন্য অনেক সদস্যদের সঙ্গো তিনিও মহাত্মা গান্ধি আহ্বানে সাড়া দেন এবং হিন্দির প্রচারকে দক্ষিণে নিয়ে যান, সাহসিকতার সঙ্গো প্রতিরোধ করেন, বিদ্যালয় খোলেন এবং হিন্দি ভাষার পঠন পাঠন পরিচালনা করেন। "এখন এইসবের ফল কী হল?" দুর্গাবাঈ প্রশ্ন করেন। "শতাব্দীর শুরুর বছরগুলোতে আমরা যে উৎসাহের সঙ্গো হিন্দিকে গ্রহণ করলাম, আমি এর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহকে দেখে মর্মাহত হলাম।" তিনি হিন্দুস্তানীকে মানুষের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এখন ওই ভাষাকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। উর্দু এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা থেকে বিভিন্ন শব্দ বের করে নেওয়া হয়েছিল। তিনি মনে করেন হিন্দুস্তানীদের ব্যাপক এবং সমন্বিত চরিত্রকে দুর্বল করার যে-কোনো পদক্ষেপ বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ভয় সৃষ্টি করতে বাধ্য।

আলোচনা তিক্ততায় পরিণত হলে অনেক সদস্য মানিয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। বোম্বে থেকে একজন সদস্য শ্রী শঙ্কররাও দেও বর্ণনা করেন যে, একজন কংগ্রেসি এবং মহাত্মা গান্ধির অনুগামী হিসাবে তিনি হিন্দুস্তানীকে জাতির ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সতর্ক করে বলেন : "যদি তুমি আমার আন্তরিক সমর্থন (হিন্দি ভাষার জন্য) চাও তবে তোমার এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যার দ্বারা আমার সন্দেহ জাগে এবং আমার আশঙ্কা দৃঢ় হয়।"

মাদ্রাজের টি.এ. রামালিঙ্গম চেট্টিয়ার জোর দিয়ে বলেন যে, যা কিছু করার সতর্কের সঙ্গে করতে হবে; যদি অতি আক্রমণাত্মকভাবে চেষ্টা করা হয় তবে তা হিন্দির জন্য ভালো হবে না। মানুষের ভয় এমনকি সেটা অহেতুক হলেও তাকে প্রশমিত করতে হবে, নতুবা "তিক্ত অনুভূতি থেকে যাবে"। "যখন আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই এবং একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়তে চাই," তিনি বলেন, "সেখানে পারস্পরিক সমন্বয় থাকা উচিত এবং মানুষের উপর কিছু ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না ..."।

এভাবে ভারতের সংবিধান তীব্র বিতর্ক এবং আলোচনার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রচিত হয়। এগুলোর মধ্যে অনেক রীতিনীতি আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, দুই বিরোধী অবস্থানের মধ্যে মধ্যবর্তী স্থল গঠন দ্বারা উদ্ভুত।

যাইহোক, সংবিধানের একটি কেন্দ্রীয়/মুখ্য বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট যুক্তি / সহমত ছিল। এটা ছিল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের / ভারতবাসীর ভোটদানের অধিকার দেওয়ার উপর। এটা ছিল একটি অভূতপূর্ব বিশ্বাস, অন্য গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার দেওয়া হত খুব ধীরে ধীরে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ডের মতো দেশে প্রথমদিকে কেবলমাত্র সম্পদশালী পুরুষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল; তারপর শিক্ষিত পুরুষদেরও এই মনোমুগ্ধ বৃত্তের মধ্যে সামিল করা হয়। দীর্ঘ এবং তীব্র সংঘর্ষের পর শ্রমিক শ্রেণি অথবা কৃষকদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হয়। এরকম অধিকার পাওয়ার জন্য মহিলাদের আরো দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন পড়েছিল।

সংবিধানে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার উপর গুরুত্বারোপ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো গুণ গাওয়া হয়নি, কিন্তু সমাজকে চালানোর জন্য ভারতবাসী সম্পর্কে/প্রসঙ্গে তার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলো অনুকরণীয় পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। এটা "ধর্মীয় স্বাধীনতা" (ধারা 25-28), "সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক অধিকার" (29, 30 ধারা), এবং "সাম্যের অধিকার" (14, 16, 17 ধারা)-এর মতো মৌলিক অধিকারগুলোর সযত্নে রচনার মধ্য দিয়ে হয়েছিল। রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমান দৃষ্টিতে দেখার নিশ্চয়তা দিয়েছিল এবং তাদের বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা পরিচালিত করার অধিকার দেওয়া হয়। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখারও চেষ্টা করে এবং রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় নির্দেশনাগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং চাকরিতে ধর্মীয় বৈষম্যকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। যাহোক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংস্কারের জন্য একটি নির্দিষ্ট আইনি ফাঁক তৈরি করা হয়েছিল। একটি ফাঁক যা অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আইনে পরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতীয় রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতায় ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের চরম বিচ্ছেদ হয় নি কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের বিচার্য দূরত্ব ছিল।

সংবিধান সভার বিতর্ক আমাদের অনেক বিরোধী কণ্ঠকে বুঝতে সাহায্য করে যা সংবিধান তৈরিতে আলোচিত হয় এবং স্পষ্টভাবে অনেক দাবি তোলা হয়। এই আলোচনা আমাদের ওইসব আদর্শ এবং নীতিগুলো সম্পর্কে বলে যার উল্লেখ সংবিধান প্রণেতাগণ করেন। কিন্তু এই বিতর্কগুলোকে পড়ার সময় আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, আদর্শের আহ্বান যা একটি প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় সেই মতো প্রায়ই বদলে যায়। মাঝে মাঝে সভার সদস্যগণও তিন বছর ধরে চলা বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের আদর্শের পরিবর্তন করে ফেলে। কিছু সদস্য অপরের যুক্তি শোনে তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করে এবং খোলামনে বিপরীত দৃশ্যের প্রতি তাকায়। কিছু লোক আশেপাশের ঘটনাগুলোকে দেখে তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে।

চিত্র 15. 9
সংবিধান হস্তান্তর করার সময় বি আর আম্বেদকর এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানান।

সময়পঞ্জি

1945	
26 জুলাই	ব্রিটিনে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসে
ডিসেম্বর-জানুয়ারি	ভারতে সাধারণ নির্বাচন
1946	
16 মে	ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীমিশন তার সাংবিধানিক প্রকল্প ঘোষণা করে
16 জুন	মুসলিম লিগ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীমিশনের সাংবিধানিক প্রকল্প গ্রহণ করে
16 জুন	কেন্দ্রে একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের জন্য ক্যাবিনেট মিশন প্রকল্প উপস্থাপন করে
16 আগস্ট	মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে
2 সেপ্টেম্বর	কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে যেখানে নেহেরুকে উপসভাপতি করা হয়
13 অক্টোবর	মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে
3-6 ডিসেম্বর	ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী কয়েকজন ভারতীয় নেতার সঙ্গে দেখা করেন; আলোচনা ব্যর্থ
9 ডিসেম্বর	সংবিধানসভার অধিবেশন শুরু
1947	
29 জানুয়ারি	মুসলিম লিগ সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়ার দাবি জানায়
16 জুলাই	অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ বৈঠক
11 আগস্ট	জিন্নাহ পাকিস্তানের সংবিধান সভার সভাপতি নির্বাচিত হন
14 আগস্ট	পাকিস্তানের স্বাধীনতা; করাচিতে উদ্‌যাপন
14-15 আগস্ট	মধ্যরাত্রে ভারতের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন
1949	
ডিসেম্বর	সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়

100-150 শব্দের মধ্যে উত্তর দাও

1. উদ্দেশ্য প্রস্তাবে কী কী আদর্শ ব্যক্ত করা হয়েছিল?
2. বিভিন্ন জনগোষ্ঠী দ্বারা সংখ্যালঘু শব্দটিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিল?
3. রাজ্যগুলোকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে যুক্তিগুলো কী কী ছিল?
4. গান্ধিজি কেন হিন্দুস্তানী ভাষা জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন?

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (250-300 শব্দের মধ্যে)

5. কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক শক্তি সংবিধানের দর্শনকে রূপায়িত করেছিল?
6. নিপীড়িত গোষ্ঠীর সুরক্ষার স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তিগুলো আলোচনা করো।
7. সংবিধান সভার সদস্যগণ ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে কী সংযোগ/সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন?
8. সংবিধান সভা কীভাবে ভাষা বিতর্কের সমাধান করতে চেয়েছিল?

মানচিত্রের কাজ

9. বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে প্রত্যেক রাজ্যের প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলো নির্দেশ করো এবং সরকারি যোগাযোগের জন্য স্বীকৃত ভাষাকে চিহ্নিত করো। বর্তমান এই মানচিত্রের সঙ্গে 1950-এর দশকের প্রথমদিকের মানচিত্রের তুলনা করো। তুমি এগুলোর মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখতে পাও? ভাষা এবং রাজ্যের সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে এই পার্থক্যগুলো থেকে কি কিছু জানা যায়?

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর)

10. সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া যে-কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তনকে বেছে নাও। কেন এই পরিবর্তন হয়েছিল, এই পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন যুক্তিগুলো কী কী ছিল এবং এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি খুঁজে বের করো। যদি সম্ভব হয় সংবিধানসভার বিতর্কগুলোর দিকে দেখার চেষ্টা কর (http://parliamentofindia.nic.in/ls/debates/debates.htm) কীভাবে ওইসময় সমস্যা সম্পর্কে আলোচিত হয়। তোমার খোঁজগুলো / রায়গুলো সম্পর্কে লেখো।
11. নিম্নলিখিত যে-কোনো দুটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে ভারতের সংবিধানের সঙ্গে আমেরিকা, ফ্রান্স অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের তুলনা করো : ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু অধিকার, কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কগুলো। বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে এইসব বিভিন্নতা এবং সাদৃশ্যতাগুলো কীভাবে যুক্ত সেটা খুঁজে বের কর।

তুমি যদি আরো জানতে চাও তাহলে পড় :

Granville Austin. 1972.
The Indian Constitution: The Cornerstone of a Nation.
Oxford University Press, New Delhi.

Rajeev Bhargava. 2000.
"Democratic Vision of a New Republic"in F. R. Frankel et al. eds, *Transforming India: Social and Political Dynamics of Democracy.*
Oxford University Press, New Delhi.

Sumit Sarkar. 1983.
"Indian Democracy: The Historical Inheritance" in Atul Kohli ed., *The Success of India's Democracy.*
Cambridge University Press, Cambridge.

Sumit Sarkar. 1983.
Modern India: 1885-1947.
Macmillan, New Delhi.

You could visit:
parliamentofindia.nic.in/ls/debates/debates.htm
(for a digitalised version of the Constituent Assembly Debates)

Credits for Illustrations

Institutions

Alkazi Foundation for the Arts, New Delhi (Figs. 11.6; 11.8; 12.12; 12.13)

Collection Jyotindra and Juta Jain, CIVIC Archives, New Delhi (Fig. 13.15)

Photo Division, Government of India, New Delhi (Figs. 14.3; 14.10; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9)

Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi (Fig. 15.6)

The Osian's Archive and Library Collection, Mumbai (Figs. 11.9; 11.18; 13.17)

Victoria Memorial Museum and Library, Kolkata (Figs. 10.6, 10.7)

Journals

Builder (Fig. 12.26)

Punch (Figs. 11.13; 11.14; 11.17)

The Illustrated London News (Figs. 10.1; 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.16; 10.17; 10.18; 10.19; 11.15; 11.16)

Books

Bayly, C.A., *The Raj: India and the British 1600-1947* (Figs. 10.4; 11.10; 11.11; 12.27)

Dalrymple, William, *The Last Mughal* (Fig. 11.1)

Daniell, Thomas and William, *Views of Calcutta* (Figs. 12.7; 12.8; 12.9; 12.19)

Evenson, Norma, *The Indian Metropolis: A View Toward the West* (Figs. 12.14; 12.16; 12.20; 12.22; 12.22; 12 23; 12.25; 12.29; 12.30)

Metcalf, T.R., *An Imperial Vision: Indian Architecture and British Raj* (Fig. 12.28)

Publications Division, *Mahatma Gandhi* (many of the Figs. in Ch.14)

Ruhe, Peter, *Gandhi* (Figs. 13.7; 13.11; 13.12)

Singh, Khushwant, *Train to Pakistan* (Figs. 15.1; 15.4; 15.12; 15.13; 15.15)